নির্বাচিত প্রেমের গল্প

ইমদাদুল হক মিলন

নির্বাচিত প্রেমের গল্প

ইমদাদুল হক মিলন

অনিন্দ্য প্রকাশন

NIRBACHITA PREMER GALPO
Selected love stories
by
EMDADUL HAQUE MILON
PRICE TK. 100.00

প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ
মার্চ ১৯৮৬
তৃতীয় মুদ্রণ
এপ্রিল ১৯৮৭
চতুর্থ মুদ্রণ
মার্চ ১৯৮৮

প্রকাশক
নাজমুল হক
অনিন্দ্য প্রকাশন
২৪৪, নবাবপুর রোড, ঢাকা
ফোন ২৩৩৮১১
বিক্রয় কেন্দ্র
৬, প্যারীদাশ রোড
ঢাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
কাজী হাসান হাবিব

মুদ্রাকর
এম হক
মডার্ণ টাইপ ফাউণ্ডার্স প্রিন্টার্স
এণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
২৪৪, নবাবপুর, ঢাকা

দাম একশো টাকা

উৎসর্গ

হুমায়ূন আহমেদ

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.bengaliboi.com
Click here

প্রেম আসছে ৯
কোন কাননের ফুল ১৬
চাই বাবলিকে ৩৫
মন বলে ৪০
রানীর কাছে যাবো ৫৫
হে প্রেম ৬০
কিছু দুঃখ ৮৯
বলা যায় না ৯৭
না সজনী ১০২
ও ১২৩
মনের অসুখ ১২৯
মৌ ১৫২
হৃদয়পুর ১৬৩
বলো তারে ১৭১
টুলটুলি ১৭৭

প্রেমিক প্রেমিকা ১৮২
তোমাকে ভালোবাসি ২০৬
দিন আমাদের ২১১
ব্যর্থ প্রেমিক ২২৫
ভালোবাসার দুঃখ ২৩০
যে তুমি ২৩৫
দূরে কোথায় ২৪৩
যদি ২৫৭
আমি ও সেই যুবতী ২৬৩
আজকালকার ছেলেমেয়েরা ২৭৩

প্রেম আসছে

আমার জীবনে কোনো ঘটনা নেই। আসছে ২২শে আগস্ট আমি আমার তেইশের জন্মদিন পেরিয়ে যাবো। এই যে এতোগুলো দিন পেরিয়ে গেলো, এরমধ্যে আমি কখনো আমার চোখের সামনে কাউকে মরতে দেখিনি, কারো কোনো অ্যাকসিডেন্ট দেখিনি, দেখিনি কারো বউ অন্যের সাথে পালিয়ে যায়। এইসবই তো ঘটনা। তেইশ বছর পেরিয়ে গেলো, আমার জীবনে কোনো ঘটনা ঘটলো না।

আমার মা-বাবা জীবিত। ভাই-বোনরা দিব্যি বড়ো হচ্ছে। বন্ধু-বান্ধবরা সব রাজা-বাদশার হালে দিন যাপন করছে। আমিও। এগুলো কোনো ঘটনা নয়।

মাসের সাত তারিখে আমি বাড়ি থেকে টাকা পাই। চারশো টাকা। গত তিন বছর ধরে বাবা নিয়মিত টাকা পাঠান। সাত তারিখের মধ্যে। চারশো টাকা। কখনো দুটো টাকা কম হয় না, দুটো দিন পিছোয় না। মা চিঠি লেখেন মাসে দুটো। আমি টাইমলি জবাব দিয়ে দিই। ভাই-বোনরা কেউ আমায় চিঠি লেখে না, বাবাও না। কেবল মা প্রত্যেক মাসে দুটো করে। বন্ধুদের মধ্যে আশিস আর বাদল দুমাস তিনমাসে এক আধটা। আমিও। ওরা আমার ছেলেবেলার বন্ধু। পরে কলেজেও আমরা একত্রে পড়েছি। আশিস বাদল এখন গ্রীসে। জাহাজে চাকরি নিয়ে চলে গেছে। কথা ছিলো আমিও ওদের সঙ্গে যাবো। যাওয়া হয়নি। যেতে পারলে আমার জীবনেও একটা কোনো ঘটনা ঘটে যেতো। জাহাজের চাকরি বড়ো মজার। সমুদ্রে ভেসে বেড়ানো। মাসের পর মাস জলের ওপর। একদিন হঠাৎ করে কোনো অচেনা বন্দরে নেমে পড়া। আহা! আশিসদের

সঙ্গে চলে গেলে জীবনটা অন্যরকম হয়ে যেতো। হায়, আমার জীবনে কোনো ঘটনা ঘটে না। নইলে এই আমি আসছে ২২শে আগষ্ট আমার তেইশের জন্মদিন গ্রীসের কোনো শহরে বসে, কিংবা কোনো নির্জন দ্বীপের কাছে, কিংবা অগাধ নীল সমুদ্রে বসে পালন করতাম।

আমি এখন থার্ড ইয়ার অনার্স পড়ি। ইকনমিক্স। ডিসেম্বরে অনার্স ফাইনাল। পাস করবো। তারপর আরো এক বছর। তারপর কোনো মফস্বল কলেজে চারশো টাকা মাইনের টিচার। তারপর একটা কটকটে মেয়েকে বিয়ে। তারপর পাঁচ বছর আগে পিছে দুটো সন্তান। একটা ছেলে একটা মেয়ে। অথবা দুটো ছেলে। অথবা দুটো মেয়ে। ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের শ্লোগান, ছেলে হোক কিংবা মেয়ে হোক, দুটো সন্তানই যথেষ্ট। তারপর চল্লিশ পঞ্চাশ বছর বয়সে মৃত্যু। জীবন তো এরকমই।

২২শে আগষ্ট আমার ঘুম ভাঙে সকাল সাড়ে আটটায়। ঘুম ভাঙতেই মনে হয় আজ আমার জন্মদিন। বিছানা ছেড়ে, বাথরুম সেরে, গোসল সেরে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে আমার একটা প্ল্যান আসে। আজ আমার জন্মদিন, একটা সেলিব্রেট করলে হয় না!

কথাটা ভেবে আমি খানিকটা উত্তেজনা বোধ করি। রাইট। আজ আমার বার্থডে সেলিব্রেট করবো। আজ ক্লাস করবো না। এক্ষুণি হল থেকে বেরিয়ে যাবো। ফিরবো রাত নটায়। সকাল নটা থেকে রাত নটা। বারো ঘন্টা সার্ভিস। এই বারোটা ঘন্টা আমি পরীক্ষার কথা ভাববো না, ক্লাস করার কথা ভাববো না। এবং হার্ট এণ্ড সোল চেষ্টা করবো, যাতে কোনো মেয়েকে নিয়ে খারাপ কিছু না ভাবি। দুপুর বেলা কোথাও কোনো একটা ফাষ্ট ক্লাস রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ সারবো। টো টো করে ঘুরে বেড়াবো সারা ঢাকার শহর। পার্কে যাবো, সিনেমায় যাবো। শিস দিয়ে গান করবো দুএক লাইন। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলে ভারি মিষ্টি একটা হাসি প্রেজেন্ট করবো। এটলাষ্ট, রাত নটার পরে হলে, নিজের রুমে ফিরে নিজের অনারে ছোট্ট একটা পার্টি দেবো। একটা ইয়ালো লেবেল হুইস্কির নিপ হলেই চলবে। সঙ্গে দুটো ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট, কিছু বটি কাবাব। আরে বা। হল থেকে বেরুতেই মনে পড়ে মাসের শেষ, পকেটে মালকড়ি সর্ট। ষাট সত্তর টাকা হবে। এই দিয়ে সাত তারিখ অব্দি চলা। তবুও ডিসিশান নিই পুরো টাকাটা আজ খরচ করে ফেলবো। কাল থেকে যেমন করে হোক চালিয়ে নেবো। আমি কখনো এরকম কিছু করিনি। এই প্রথম। তাই একটা রোমাঞ্চ লাগে ভাবতে। আমার জীবনে কোনো ঘটনা নেই। এই প্রথম একটা অন্যরকম লাইফ লিড করতে যাচ্ছি। বাকাপ।

ততোক্ষণে অবাক কাণ্ড। আমার পা আমাকে ফেলে অনেকটা দূর এগিয়ে গেছে। আজ সিউর একটা কিছু ঘটবে।

সিগারেটের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে কি সিগারেট কিনবো খানিক-ক্ষণ ভাবি। আমি চেইন স্মোকার নই। সারাদিনে এক প্যাকেট হলে চলে যায়। তাও ক্যাপস্টান। কিন্তু আজ আমার বার্থডে। আজ আমি অন্যরকম লাইফ লিড করবো।

আমি হাফ প্যাকেট ফাইভ ফিফটি ফাইভ কিনি। একটা প্রজাপতি মার্কা ম্যাচ। পুরো বারো টাকা। শুধু সিগারেটের জন্যে ক্যাশ এতো-গুলো টাকা এট এ টাইম জীবনেও খরচ করিনি আমি। স্লাইট দুঃখ হয়। ঝেড়ে ফেলি। একটা ফাইভ ফাইভ ধরিয়ে আস্তে ধীরে ইউনিভার্সিটি গ্রাউণ্ডে গিয়ে ঢুকি। সূর্যসেন হল থেকে ইউনিভার্সিটি গ্রাউণ্ড পাঁচ মিনিটের পথ। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে ফার্স্টক্লাস মেরে দিই রাস্তাটা। শরীফ অঞ্চলে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করবো এখন। তারপর পুরো ঢাকার শহরকে ঘুরে ঘুরে জানিয়ে দেবো 'হে আমার প্রিয় ঢাকার শহর, অদ্য আমার জন্মবার্ষিকী'।

ব্রেকফাস্ট সেরে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছি, দেখি শরীফ মিয়ার দোকানের উত্তর পাশের রাস্তা দিয়ে ব্ল্যাকি যাচ্ছে। পেছন থেকে দেখেও ওকে আমার চিনতে ভুল হয় না। ওর হাঁটার স্টাইলটা সুন্দর। কিন্তু ব্ল্যাকি দেখতে বড়ো বিচ্ছিরি। গায়ের রং একেবারে বিটুমিন ইমাল্‌-সানের মতো। ওর কি একটা ভালো নাম আছে। সাম বেগম টেগম হবে। ক্লাসের ছেলেরা প্রথমে নাম দিয়েছিলো কমেট কালি। পরে চেঞ্জ করে ব্ল্যাকি। একটু স্টেণ্ডারড। আফটার অল ইকনমিক্সের ছাত্রী। তার ওপর ব্রিলিয়ান্ট। স্যাররা খুব খাতির করেন ব্ল্যাকিকে। ও সিওর ফার্স্টক্লাস পাবে। ব্ল্যাকির বড়ো দুঃখ হলো ওকে কেউ কখনো প্রেম-ট্রেমের কথা বলেনি।

এমনিতে ক্লাসের ছেলেরা ব্ল্যাকির সঙ্গে ফ্রিলি কথা বলে, কেউ কেউ নোট টোট নেয়। ব্ল্যাকির সঙ্গে অনেকেরই তুই তুকারি সম্পর্ক। কিন্তু ক্লাসের কোনো ছেলেকে কখনো দেখা যায়নি ব্ল্যাকির সঙ্গে সেমিনার রুমে একা বসে গল্প করছে, কিংবা পাবলিক লাইব্রেরীর চত্বরে, কিংবা টি এস সিতে। সম্ভবতঃ এই কারণে ব্ল্যাকিকে সব সময় বড়ো দুঃখী দেখায়। ব্ল্যাকির সঙ্গে কেউ কথা না বললে ব্ল্যাকি যেচে কখনো বলে না।

এই মুহূর্তে ব্ল্যাকিকে আমার কেমন একটা মায়া হয়। আজ ব্ল্যা-কিকে সারাদিন আমার সঙ্গে ঘুরালে কেমন হয়! ব্ল্যাকি খুব খুশি হবে নিশ্চয়। এটা সিওর ওর জীবনে ফার্স্টটাইম। অবশ্য আমার দিক থেকে একটা রিস্ক আছে। ক্লাসের কোনো ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে, পরে টিটকেরি মারবে আমাকে। যা শালা! কি যায়

আসে তাতে। আমি শরীফ মিয়ার বিল দিয়ে দ্রুত ব্ল্যাকির পিছু নিই। মিনিট তিনেক লাগে ওকে ধরতে। ব্ল্যাকি তো এভাবে আমাকে ছুটে আসতে দেখে অবাক, কিরে?

তোর সঙ্গে কথা আছে।

আমার সঙ্গে? ব্ল্যাকির চোখ বড়ো হয়ে যায়।

হ্যাঁ।

কি কথা ?

চল কোথাও বসি।

ব্ল্যাকি আরো অবাক। ড্যাব ড্যাব করে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। আমিও এক পলক। ব্ল্যাকি কালো হলে কি হবে, ওর চেহারায় মিষ্টি একটা ব্যাপার আছে। এতোদিনে আজ প্রথম তা আমার চোখে পড়ে। আমি মনে মনে হাসি। ওটা আসলে চোখের দোষ। যৌবনে কুকুরীও নাকি

যাকগে। ব্ল্যাকি অবাক হয়ে আছে দেখে আমি বলি, তোর কোনো অসুবিধা আছে?

না অসুবিধা কি?

আমি জানি অবাক হয়েও ব্ল্যাকি রাজি হয়ে যাবে। ওতো মনেপ্রাণে চায় ওকে কেউ ডেকে নিক।

আমি বলি, ক্লাস মিস হবে না?

সে তো তোরও হবে!

তাহলে চল। হোলডে কিন্তু।

মানে?

সারাদিন আমার সঙ্গে থাকতে হবে।

কোথায় যাবি?

যেদিকে ইচ্ছে। আজ সারাদিন ঘুরবো। একজন পার্টনার খুঁজছিলাম। তোকে পেয়ে ভালোই হলো। অপজিট পার্টনারই ভালো।

এতোক্ষণে ব্ল্যাকি হাসে। সত্যি বলতে কি ওর হাসিটি কিন্তু ভারি মিষ্টি। হাসিতে মুক্তো ঝরে জাতীয়। দাঁতগুলো খুব সুন্দর। আজ আমি সব কিছু বড়ো খেয়াল করে দেখছি।

ব্ল্যাকি বললো, আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে তোর ভালো লাগবে?

আমি এক কথায় বলি, লাগবে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি?

আজ আমার জন্মদিন। টুয়েন্টিথার্ড। তোকে নিয়ে আমার বার্থডে সেলিব্রেট করবো।

ব্ল্যাকি হেসে মরে, ঘুরে ঘুরে বার্থডে সেলিব্রেট! তুই একটা পাগল!

মেয়েদের পাগল বলার ভেতর কিরকম একটা ইঙ্গিত থাকে! শুনতে

আমার মন্দ লাগে না। ফার্স্ট টাইম ইন লাইফ। আমাকে কখনো কোনো মেয়ে পাগল বলেনি। আজ সত্যি সত্যি একটা কিছু ঘটবে।

পাবলিক লাইব্রেরীর সামনের রাস্তাটা পেরিয়ে আমরা সরোওয়ার্দি উদ্যানে ঢুকি। এখন চারদিকে আগস্ট মাসের রোদ ঝিমঝিম করছে। বেশ গরম। আমরা এইসব কেয়ার করি না। সরোওয়ার্দি উদ্যান এখন সুন্দর পার্ক। সবুজ ঢালাও ঘাস চারদিকে, ফুলের গাছ, ইউক্যালিপ-টাস আর মাঝে একটি সুন্দর পুকুর। পুকুরের চারদিক ফুলগাছে ঘেরাও। ভারি সুন্দর পরিবেশ। দুপুর বেলা লোকজন কম বলে, হাওয়া বাতাস নেই বলে একখানা স্টিল ছবির মতো দেখায় পার্কটা। বিকেল-বেলা ইউনিভার্সিটির পেয়াররা এখানে প্রেম করতে আসে। ভাবতে অবাক লাগে একসময় এই মাঠে পলিটিক্যাল মিটিং হতো, তারও আগে হতো ঘোড়দৌড়। আর এখন হয় প্রেম। আহা সারা পৃথিবীতে যদি এরকম হতো! পলিটিক্স তুলে দিয়ে শুধু অবাধে প্রেম করতে দেয়া হতো ছেলেমেয়েদের। ভারি ভালো হতো তাহলে!

পার্কের মাঝামাঝি এসে ব্ল্যাকি বললো, আর হাঁটতে পারি না বাবা। চল এখানে বসি।

সামনে সুন্দর একটা পুকুর। চারদিকে গোলাপ টোলাপ ফুটে আছে। পুকুরে রক্ত শাপলা। কিন্তু আমার ঘাসের ওপর বসতে ইচ্ছে করে না অন্য কারণে। আমি আজ পরেছি শাদা প্যান্ট, পায়ে আড়াই ইঞ্চি হিলের জুতো, গায়ে হংকংয়ের কালারড গেঞ্জি। শাদা প্যান্ট নিয়ে ঘাসে বসলে পাছায় দাগ পড়ে যাবে। তার ওপর পায়ে ভারি জুতো। এটাও একটা প্রোবলেম। ধুৎশালা কি হবে! বসে পড়ি। আমার বাঁপাশে বসে ব্ল্যাকি। কাঁধ থেকে চটের থলিটা নামিয়ে রাখে সামনে। তারপর আঁচলে মুখ মোছে। রোদে হেঁটে ও একদম ঘেমে গেছে। ব্ল্যাকি আসলে খুব নরম মেয়ে। কে যেনো আমাকে বলেছিলো, কালো মেয়েরা খুব নরম হয়। ব্ল্যাকিকে একটু ছুঁয়ে দেখবো! কিন্তু ও যা কালো, ছুঁলে যদি হাতে কালি লেগে যায়!

ব্ল্যাকি হঠাৎ করে উঠে গেলো। সামনের গোলাপ ঝাড়টার কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ ঘুরে ঘুরে একটা গোলাপ ছিঁড়ে ফিরে এলো। এসে ফুলটা আমার হাতে দিয়ে বললে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ।

আমি তো অবাক। ব্ল্যাকি আসলে খুব স্মার্ট।

ব্ল্যাকি বললো, আগে জানলে আমি তোকে অন্যকিছু প্রেজেন্ট করতাম।

আমি ফুলটা নাকের কাছে তুলে বলি, ইটস অল রাইট ডিয়ার।

জানি আজ আমার পুরো ব্যাপারটাই ব্ল্যাকি খুব ফিল করছে। ওর জীবনে এটা প্রথম। আমারও। আমি কখনো কোনো মেয়েকে একা

এভাবে কোথাও নিয়ে যাইনি, এভাবে ফ্রিলি কথাও বলিনি খুব। আজ আমি এতো কিছু পারছি কেমন করে! ভেবে নিজেকে নিজে একটা থ্যাংকস দিই। একটা ঘটনা আজ না ঘটে পারে না। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলি, শ্ল্যাকি তুই আমাকে কি ভাবছিস রে?

শ্ল্যাকি অবাক হয়ে বললো, কি ভাববো?

এই যে এমনভাবে তোকে ডেকে নিয়ে এলাম, এ জন্যে তুই কিছু ভাবছিস না?

না। আমার খুব ভালো লাগছে।

তারপর একটু থেমে ঘাস ছিঁড়ে দাঁতে কাটতে কাটতে বললো, আমি কখনো কোনো ছেলের সঙ্গে এভাবে কোথাও এসে বসিনি। আমার কোনো ছেলে বন্ধু নেই।

শ্ল্যাকি থেমে আমার মুখের দিকে তাকায়। ওকে খুব দুঃখী দেখায়। আমার মায়া হয় বড়ো।

শ্ল্যাকি আবার বললো, আমি দেখতে খুব বাজে। এজন্য কোনো ছেলে আমার সঙ্গে মেশে না।

আমার মনে হয় শ্ল্যাকি এখন কেঁদে ফেলবে। মেয়েদের কান্না সহ্য করা! উরে বাপ! আমি তাড়াতাড়ি বলি, শ্ল্যাকি আমি তোর বন্ধু হবো। তোকে নিয়ে এবার থেকে পাবলিক লাইব্রেরী চত্বরে বসবো, টি এস সিতে যাবো, সারা ঢাকার শহর ঘুরে বেড়াবো।

শুনে শ্ল্যাকি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তোর খারাপ লাগবে না? ছেলেরা যে তোকে টিটকেরি মারবে!

তাতে কি যায় আসে!

শ্ল্যাকি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। ওর চোখে কৃতজ্ঞতা। দেখে আমার বুকের ভেতরটা মোচড়ায়। কোনো মেয়ের জন্যে এই প্রথম আমি একটু কষ্ট পাই।

দুপুরবেলা আমরা রমনা রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ করি। শ্ল্যাকিকে ওসব কথা বলার পর থেকে আমার খুব ভালো লাগছে। শ্ল্যাকিও খুব খুশি। বাচ্চা মেয়ের মত অনর্গল কথা বলছে, একটু কিছুতেই হাসছে খিলখিল করে। দুবার আমার হাত চেপে ধরেছে। এর সবকিছুই আমার ভালো লাগছে। শ্ল্যাকির আসলে কি যেনো একটা আছে। আজ ওকে এতো কাছাকাছি পেয়ে ব্যাপারটা টের পাচ্ছি। শ্ল্যাকি আমাকে টানছে। খেতে খেতে শ্ল্যাকি নিজের প্লেট থেকে এক টুকরো মাংস তুলে আমাকে দেয়। আমি বাধা দিতে পারি না। মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিই। শালা, তুমি এতোকাল শ্ল্যাকিকে চান্স দাওনি কেন? তাহলে এতোদিনে বহু কিছু ঘটে যেতো।

খাওয়া শেষ করে সিগারেট ধরাতেই বল্যাকি রেগে গেলো। তুই অতো সিগারেট খাস কেন? বেশি সিগারেট খেলে আয়ু কমে যায়।
আমি কথা বলি না। বড়ো ভালো লাগে। কেউ তো কখনো এভাবে আমাকে সিগারেট খেতে মানা করেনি! আমি শুয়োরের বাচ্চা এতোকাল কি করেছি!
ম্যাটিনি শোতে বলাকায় আমরা একটা সিনেমা দেখি। যাওয়ার পথে রিকশায় বল্যাকির সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসি। বল্যাকি সত্যি খুব নরম। আর বল্যাকির গায়ে মিষ্টি এক ধরনের গন্ধ। বল্যাকি কি সেন্ট ইউজ করে? না কি গন্ধটা বল্যাকির অরিজিনাল! অনেক মেয়ের গায়ে মিষ্টি গন্ধ থাকে। আমি কি শালা বল্যাকির! ধ্যেৎ!
সিনেমা হলে, যখন ঝাৎ করে সবকিছু অন্ধকার, তখন বল্যাকি একটু ডার্কড্রামা করে ফেলে। আমার হাত চেপে ধরে বলে, তোকে আমি খুব ভালোবাসবো।
এ কথায় আমার মাথায় এক পাগলামি খেলে যায়। আমি বল্যাকির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলি, তাহলে তুই আমাকে একটা চুমু খা।
যা! আমার লজ্জা করবে।
লজ্জা কি! আমরা তো কেউ কারো মুখ দেখছি না!
তুই ভীষণ ফাজিল তো!
ফাজিল কি! ভালোবাসতে পারবি, চুমু খেতে পারবি না?
একবার কিন্তু!
আচ্ছা।
বল্যাকি অন্ধকারে আস্তে নিজের ঠোঁট আমার ঠোঁটে রাখে। আ কি সুখ! আমার ইচ্ছে করে বল্যাকিকে জোর করে চেপে ধরে চুমু খেতে থাকি। শুধু চুমু খেতে থাকি। পুরো তিনঘন্টা কাটিয়ে দিই চুমু খেতে খেতে। কিন্তু সব ইচ্ছে কি সফল হয়!
সন্ধ্যের মুখে বল্যাকির সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়। আমি হাত ধরে বল্যাকিকে রিকশায় চড়িয়ে দিয়ে বলি, কাল আবার দেখা হবে।
বল্যাকি কথা বলে না। মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। বল্যাকির চোখে কি আছে! আমার বুকের ভেতর কিরকম একটা অনুভূতি তুলতুল করে ওঠে। বল্যাকিকে কি আমি সত্যি সত্যি! কিন্তু লোকে বলবে কি! আমার কি মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে!
রাত নটার দিকেই আমি হলে ফিরি। একটা ইয়ালো লেবেলের নিপ কিনে নিয়েছি গ্রীন থেকে। আজ আমার তেইশের জন্মদিন পেরিয়ে গেলো। আজ আমার জীবনে প্রথম একটা ঘটনা ঘটলো। আজ আমাকে একটা মেয়ে চুমু খেলো। আজ আমি অনেক পাগলামি করেছি। ড্রিংকটা হচ্ছে এসবের পুরস্কার।

তিন সিপের মাথায় আমি একটা ফাইভ ফাইভ ধরাই। মাথার ভেতরটা টাল মাটাল হয়ে যায়। বল্যাকি আজ সারারাত আমার কথা ভাববে। হয়তো স্বপ্নও দেখবে। কাল সিওর দেখা যাবে বল্যাকি খুব সেজেগুজে ক্লাসে এসেছে। আমার সঙ্গে দেখা হলে অবলীলায় ক্লাসের সব ছাত্র-ছাত্রীর সামনে বেরিয়ে আসবে। হেসে কথা বলবে। আমার জীবনে একটা ঘটনা বুঝি ঘটেই গেলো।

কিন্তু আমি এখন মদ খাচ্ছি। দুপুরে সিগারেট বেশি খেয়েছি বলে বল্যাকি আমাকে ধমকে ছিলো। এখন যদি বল্যাকি সামনে থাকতো তাহলে কি আমি মদ খেতে পারতাম!

যা শালা। আমি বোতলটা তুলে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিই। বল্যাকি যা পছন্দ করে না, তা আমি কখনো করবো না। কাল থেকে সিগারেট খাওয়া কমিয়ে দেবো। ১৯৭৭

কোন কাননের ফুল

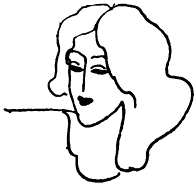

তুমি তাহলে যাচ্ছো?

হ্যাঁ। সোয়ের।

কবে?

উনিশ তারিখ।

আজ ক তারিখ?

শুনে টেলিফোনের ওপাশে খিকখিক করে হেসে ওঠে বুলবুলি। একটা কথা আমাকে সত্যি করে বলো তো অলি, তুমি সারাদিন কি করো?

অলি একটু থতমত খেয়ে যায়। মেজাজটা খুব বিগড়েছে তার। বুলবুলি এমনিতে বেশ ভালো মেয়ে। দেখতে শুনতে চমৎকার। কালো মতো। কিন্তু মুখটা বড়ো মিষ্টি বুলবুলির। দেখলেই চুমু খেতে ইচ্ছে করে। আর ফিগারের কোনো তুলনা নেই বুলবুলির। লম্বা স্লিম। জায়গামতো জিনিশপত্র নিখুঁতভাবে সাজানো। ফিগার দেখেই তো বুলবুলির পেছনে লেগেছিলো অলি। কিন্তু বুলবুলির ঐ একটা জিনিশ, হাসি। কোনো তুলনা নেই। ব্যাঙের মতো খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসবে। একবার সেই হাসি শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। অতো সুন্দর মুখে এতো বাজে শব্দের হাসি, কথাটা ভেবে অনেক স্কোপ পেয়েও বুলবুলিকে

কখনো চুমু খাওয়া হয়নি অলির। মুখের কাছে মুখ নিয়েও ফিরে এসেছে অনেকদিন। মনে পড়েছে বুলবলি ব্যাঙের মতো হাসে। পৃথিবীর এই একখানা জীব, ব্যাঙ নামটা যেমন বাজে বস্তুটাও তাই। একদম সহ্য করতে পারে না অলি। ফলে বুলবুলির সঙ্গে বড়ো হিসেব করে কথা বলে অলি। কায়দা করে। যাতে হেসে ফেলার চান্স না পায় বুলবুলি।

কিন্তু বুলবুলিটা এমন মেয়ে, চারমাস ধরে রেগুলার মিশছে অলি, ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলছে তবুও বুঝতে পারলো না, কখন কি কথায় খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে ফেলবে বুলবুলি! এখন এই মুহূর্তে টেলিফোন কানের কাছে ধরে অলির মনে হয়, আগামী চারশো বছরেও বোঝা যাবে না কখন কি কথায় হেসে ফেলবে বুলবুলি। কিছু কিছু মেয়ে আছে না, শালা নিঃশব্দে হাসতে পর্যন্ত শেখেনি! বুলবুলি সেই দলের লিডার। শালী যতো তাড়াতাড়ি বিদেয় হয় ততোই মঙ্গল। নয়তো ব্যাঙের মতো হেসে আমাদের পুরো জেনারেশানটার মেজাজ খাট্টা করে দেবে।

বুলবুলি বললো, আজ তেরো তারিখ।

তার মানে আর ছ দিন

হ্যাঁ।

বা বেশ মজা তো!

মজা কেন?

এই যে তুমি চলে যাচ্ছো।

আমি চলে যাচ্ছি শুনে তুমি খুব মজা পাচ্ছো?

বুলবুলির গলায় অযথা দুঃখী দুঃখী ভাব। বেশ স্ফুর্তি হয় অলির। মনে মনে বলে, এ্যাঁ শালীর আবার রাধা ভাব। ঐ হাসি নিয়ে রাধা সাজতে চাও! আমার রাধা তো তুমি নও মেয়ে। তুমি আমার গোপিনী। ষোলশো জনের একজন।

বুলবুলি তারপর হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এই শোনো অলি, আমার এক কাজিন এসেছে আমার সঙ্গে মিট করতে। প্লিজ ডোন্ট মাইণ্ড।

অলি অবাক হয়ে বললো, মানেটা কি! টেলিফোন রেখে দিতে হবে। না। আমার হাতে এখনো অনেকগুলো সিকি। ফুরুতে আরো বিশ মিনিট লাগবে। এগুলো শেষ না করে আমি ছাড়বো না।

বুলবুলি আবার খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে ওঠে। শুনে ধমকে ওঠে অলি। বেশ্যাদের মতো হেসো না তো।

তুমি মাইণ্ড করো না।

আমার এখন কথা বলতেই হবে। জানো না কথা বলা আর আড্ডা মারা ছাড়া আমার কোনো কাজ নেই।

আমি চলে গেলে যখন তখন কার সঙ্গে অতো কথা বলবে?

কতো আছে! না হয় খুঁজে নেবো।
তাহলে একটা কাজ করো। আমার এক ফ্রেণ্ড আছে এখানে। আমার সামনেই বসে আছে। ওর সঙ্গে কথা বলো। আমি কাজিন ম্যানেজ করি।
তোমার ফ্রেণ্ড মানে কি! মেয়ে না ছেলে? ছেলে হলে আমি নেই। পাবলিক কল থেকে নগদ পয়সা খরচ করে ছেলেদের সঙ্গে আমি কথা বলি না।
না না ছেলে নয়।
তাহলে দাও।
টেলিফোন কানের কাছে ধরেই বুলবুলি কাকে ডাকে। ধরো না, মিনিট পাঁচেক কথা বলো। আমার ফ্রেণ্ড। অলি। দারুণ হ্যাণ্ডসাম ছেলে। অলি সব শুনতে পায়। মেয়েটি প্যান প্যান করে কি সব বলছে। শালীর অতো দেমাক ক্যান! মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে থাকে অলির।
তখুনি ওপাশ থেকে ভেসে আসে, হ্যালো। শুনে চমকে ওঠে অলি। মানুষের স্বর কি এতোটা সুন্দর হয়! মনে হয় স্বপ্নের ওপার থেকে আসছে। এই নোংরা পৃথিবীতে এতো সুন্দর স্বরের অস্তিত্ব থাকে কেমন করে!
কি যেনো কি কারণে বুকের অনেক ভেতরে একটুখানি কাঁপন লাগে অলির। বাঁ হাতে বেশ অনেকগুলো চকচকে সিকি ছিলো। উত্তেজনায় একটা করে সবগুলো ফেলে দেয় টেলিফোন বক্সে।
হ্যালো
বলুন।
কি বলবো! জীবনে এই প্রথম অলি কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলতে কেঁপে যাচ্ছে। তাও চোখের সামনে নেই! গলা শুনেই।
একটু গলা খাকারি দেয় অলি। রিসিভারটা অকারণে কানের একেবারে সঙ্গে ঠেসে ধরে। মনে হয় কানের খুব কাছে না ধরলে ঐ স্বর পৌঁছুবে না।
আমার নাম অলি।
জানি।
আমি বুলবুলির বন্ধু।
শুনেছি।
আপনি
আমার নাম, বলবো না।
আপনি
আমি বুলবুলির বন্ধু।
কোথায় থাকেন?

ঢাকায়।
কোথায়?
বলবো না। তারপর অকারণে খিল খিল করে হেসে ওঠে সেই মেয়ে। কোনো মানুষ যে এতো সুন্দর করে হাসতে পারে, অলি জানে না। মনে হয় ওর হাসিতে এই পৃথিবীর সব উদ্যানে এক সঙ্গে ফুটে উঠলো হাজার লক্ষ ফুল। ভ্রমররা গুনগুন করে গান জুড়ে দিলো। পাখিরা সব কল-কাকলিতে মুখর হলো। বইতে শুরু করলো মনোরম হাওয়া। অলি বললো, আপনি কোথায় পড়েন?
এখানেই।
এখানেই কোথায়?
ঢাকায়। আগে পড়তাম মির্জাপুরে।
কি পড়তেন?
চার বছর আগের কথা। ভারতেশ্বরী হোমসের ছাত্রী ছিলাম।
এখন?
এখন ঢাকায় পড়ি।
অলি একটু চুপ করে থাকে। বুঝতে পারে মেয়েটি জানে সে গলার স্বর আর হাসির শব্দ শুনিয়ে অলির পৌণে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। এখন অলির প্রতিটি প্রশ্নের ওপর রহস্যময়তা ঝুলিয়ে বারোটা কমপ্লিট করছে।
কিন্তু অলির নাম অলি। সে কি এতো সহজে ছেড়ে দেবে! একটু অন্য ভাবে শুরু করে অলি। ম্যালা পয়সা ফেলা আছে বক্সে। অনেকক্ষণ চলবে।
অলি বললো, বুলবুলির সঙ্গে আপনার ফ্রেণ্ডশিপ কতোদিনের?
ফার্স্ট ইয়ার থেকে।
আর আমার কতোদিনের জানেন?
চারমাসের।
কিন্তু আমার মনে হয় কি জানেন?
না, জানি না।
চারশো বছরের।
শুনে সেই মেয়ে আবার পৃথিবী সুন্দর করে হেসে ওঠে। হাসির শব্দে অলি প্রথমে শুনতে পায় বহুদূরে জলের সঙ্গে কথা বলছে জল। মৃদু শব্দে বয়ে যাচ্ছে এক তন্বী নদী। অথবা উঁচু পাহাড় থেকে কোমল শব্দে ঝড়ছে এক সুন্দর ঝর্ণা। ঝর্ণার ধারে তার একটি বার দাঁড়াতে ইচ্ছে করে।
সেই মেয়ে বললো, চারমাসে এতোদূর। এতোটা কিন্তু বুলবুলি বলেনি।
কি বলেছে?

আপনাকে চেনে। সিম্পলি ফ্রেণ্ডশিপ।
বুলবুলি আমার গোপিনী। ষোলশোর একজন।
মানে ?
রাধা কৃষ্ণের গল্প জানেন।
শুনেছি।
কৃষ্ণের অনেক গোপিনী ছিলো না!
তাহলে আপনি
হ্যাঁ, কৃষ্ণ এইটি ওয়ান।
শুনে সেই মেয়ে আবার হাসে। অলি শুনতে পায় বাইরে কোথাও ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে।
আপনার রাধাটি কে?
আপনার কি কোনো কৃষ্ণ
সরি, নেই।
আমিও সরি। নেই। আমার সবই গোপিনী, রাধা খুঁজছি।
আপনি চমৎকার কথা বলেন।
এটুকুই সম্পদ।
মানে?
আমার আর কোনো যোগ্যতা নেই। থার্ড ইয়ার অনার্স পর্যন্ত পড়ে ছেড়ে দিয়েছি। সেভেনটি ওয়ানে
ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন! জানি আজকাল অনেক ছেলেই একথা বলে। আমারটা সত্যি।
প্রমাণ।
আমি নিজেই। ফ্রিডম ফাইটার ছিলাম, কথাটা কিন্তু আজকাল আর বলি না।
আমাকে যে বললেন।
কেন যে এসে গেলো। আপনার গলা শুনে মনে হলো ইচ্ছে করলেও আপনাকে মিথ্যে বলা যাবে না।
তাই। বলেই আবার সেই হাসি। তখুনি খ্যারখ্যার করে উঠলো টেলিফোন। তারপর লাইন কেটে যায়।
পয়সা শেষ।
টেলিফোন ধরে রেখেই প্রথমে প্যান্টের চার পকেট, তারপর শার্টের পকেট খোঁজে অলি। একটিও পয়সা নেই। একটিও টাকা। মাথা খারাপ হয়ে যায় অলির। টেলিফোনটা ধাম করে রেখে ঘুরে দাঁড়ায় সে। যেনো কাছে যাকে পাবে তার কাছ থেকেই ধার নেবে পয়সা। না দিলে জোর করে। কিন্তু টেলিফোন ফ্রি পাওয়ার আশায় যে দাঁড়িয়েছিলো, অলির সঙ্গে তার গ্যাপ মাত্র দুটি জেনারেশানের। চুল-

দাড়ি সব শাদা ধবধবে। চোখে চশমা। হাতে লাঠি। আচকান পাজামা পরা। পায়ে কালো পাম্প সু, শাদা মোজা। এই লোকের কাছে কি পয়সা চাওয়া যায়! চাইলে তো দেবেই না, বরং একখানা হৃদয়-বিদারক ভাষণ দেবেন। শালা ভাষণ জেনারেশান।

অলি এখন কি করে! এই মেয়ের সঙ্গে কথা না বলে তার উপায় নেই। ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতে হবে আজ। রহস্যময়ী। চালাক। কায়দা করে কথা বের করতে হবে। কি নাম, কি বেত্তান্ত। সবশেষে টেলিফোন নাম্বার। তারপর কাল থেকে পকেটে প্রচুর সিকি নিয়ে বেরুবে অলি। বুলবুলি তো আর মাত্র ছ দিন।

কিন্তু অলি এখন কি করে!

আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় পকেটের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়নি। কেমন করে হবে! সকালবেলা ঘুম ভেঙেছে মা বাবার পুরোনো ঝগড়া শুনে। এই জিনিশটা যেদিন শুরু হয়, সেদিন আর কোনোদিকে তাকাবার স্কোপ নেই। কোনোমতে প্যান্টটা পরে, শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে রাস্তায় বেরোয় অলি। তারপর বুক ভরে শ্বাস টানে। আর মনে মনে তিনবার বলে, জয় বাংলা। স্বাধীনতা। আজও ঠিক তাই করেছে। তারপর নারিন্দা থেকে সোজা হেঁটে এসেছে ইত্তেফাক বিল্ডিং পর্যন্ত। রামকৃষ্ণ মিশন রোডে দোয়েলদের বাড়ি। সকাল বেলা একবার দোয়েলের সঙ্গে দেখা করে অলি। চা খায়। তারপর ফাঁক বুঝে চুমুটা। মুখটা শুদ্ধ করে নেয়। নইলে সারাটা দিন খারাপ যায় অলির। লোকের সঙ্গে রাফ বিহেভ করে। অরিজিন্যাল ভাষাটা যায় পাল্টে। যাচ্ছেতাই শব্দ ব্যবহার করে কথা বলে।

আজ দোয়েলের কাছে যাওয়া হয়নি। কেন যে মনে হলো, কি যাবো শালা। দোয়েলটার খালি অসুখ থাকে। একদিন ভালো,
তিনদিন খারাপ। বছর খানেক চলছে। ডাক্তার নাকি বুঝতেই পারে না কি অসুখ দোয়েলের।

ইত্তেফাক বিল্ডিংয়ের কাছে এসে আনমনে ভেতরে ঢুকে গেছে অলি। তার আগে পকেট হাতিয়ে দেখেছে মাত্র একটা পাঁচ টাকার নোট। ভাঙিয়ে পাঁচটা স্টার সিগারেট কিনেছে। ফাঁকে সিগারেট অলাকে পটিয়ে বাকি পৌণে চার টাকার পনেরটা সিকি। তারপর ইত্তেফাকের পাবলিক কল থেকে টেলিফোন।

কিন্তু অলি এখন কি করে! সোজা চলে যাব কলা বাগান! বুল-বুলিদের বাড়ি লেক সার্কাসে। মা বাবা সব ভাই-বোন নিয়ে থাকে লণ্ডনে। বাপ ডাক্তার। লণ্ডনে বাড়ি-ফাড়ি করে ফেলেছে। বাংলা-দেশের যে কি অবস্থা। পাবলিক সব বিদেশে চলে যাচ্ছে। কি করবে! প্রতিদিন সকালে রাজনীতির চেহারা পাল্টায়। অর্থনীতি বলে যে একটা

ব্যাপার, সেটার কোনো ফাদার মাদার নেই। জিনিসপত্রের দাম পাগলা করে সিঁড়ি টপকাচ্ছে একদিনে। পেঁয়াজের সেরই চল্লিশ টাকা। ছাই দেশে মানুষ থাকে! চলে যাক। সবাই চলে যাক। বিদেশে গিয়ে দারোয়ানের প্যাদানী খেলেও লাভ। কিছুদিন আগে লণ্ডনে তো খুব পেটালো খেদালো এশিয়ানরা। তবুও, ঐ তো স্বর্গরাজ্য।

কিন্তু এতোসব কঠিন ব্যাপার ভেবে অলির কি লাভ। এখন তার মাথার ভেতর ঢুকে আছে সেই মেয়ের হাসি। তুমি যেই হও, তোমাকে আমি ঠিক খুঁজে বের করবো। আমি ডিটেকটিভ হয়ে যাবো। সব রহস্য ভেঙে ফেলবো। তুমি আমার রাধা হবে।

পকেটে একটা পয়সা নেই। কে কেয়ার করে। অলি একটা রিকশা নেয়। কলা বাগান যাও। লেক সার্কাস।

এখনো কি সেই মেয়ে বুলবুলিদের বাসায়! অলি আবার টেলিফোন করবে, অপেক্ষায় আছে! অলি মনে মনে বললো, রাধা আমি আসছি।

বিশাল কালো গেট খুলে দারোয়ান বললো, আচ্ছেলামালাইকুম সার।

হুঁ। তারপর রিকশাঅলার দিকে তাকিয়ে অলি বললো, দাঁড়াও ভাই।

রিকশাঅলা কথা বলে না। শাদা ছেঁড়া স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা আর সবুজ লুঙ্গি। কোমরে প্রতীক চিহ্ন লাল গামছা। অলির কথা শুনে গামছাটা খুলে মুখ মোছে, ঘাড় মোছে। তারপর আয়েশ করে সিটের ওপর শরীর খুলে বসে থাকে। লোকটার কি সিগারেট খাওয়ার অভ্যেস নেই! কথাটা ভেবে অলির সিগারেট খাওয়ার কথা মনে পড়ে। পকেট থেকে স্টারের প্যাকেটটা বের করে সে। দেখে দারোয়ান হা করে তাকায় অলির মুখে। অলি দেখে লোকটার পরনে খাকি পোশাক, মুখে বিশ বাইশখানা দাড়ি গোঁফ। কিন্তু লোকটার মুখ দেখে চমকে ওঠে অলি। অতো শুটকা মুখ কেন? গাঁজা খায় নাকি। ভালো, ভালো। অলি খুশি হয়ে একটা সিগারেট দেয় দারোয়ানকে। প্রথমে একটু দ্বিধা করে লোকটা। এদিক ওদিক চায়। তারপর টুক করে সিগারেটটা নেয়। মুখে বিগলিত একখানা হাসি ফুটে ওঠে তার।

আপনে এই সিগারেট খান সার?

হ্যাঁ। স্টার খুব ভালো সিগারেট।

হ সার, খুব ভালো। তয় এই বাইত কইলাম কেঐ এই সিগারেট খায় না। দামী দামী সিগারেট খায়।

জানি। আমি এদের দলের নই।

ম্যাচ জ্বেলে প্রথমে দারোয়ানের সিগারেটটা ধরিয়ে দেয় অলি। তারপর নিজে সিগারেট ধরাতে যাবে, দেখে রিকশাঅলাটা হা করে তাকিয়ে আছে। সিগারেটের নেশা।

অলি গেটের বাইরে নেমে রিকশাঅলাকে একটা সিগারেট দেয়। রিকশাঅলা কি একটু দ্বিধা করে! অলি খেয়াল করে না। আবার ম্যাচ জ্বালে। নিজে ধরায়। রিকশাঅলাকে ধরিয়ে দেয়। তারপর একটানে সিগারেটের কোয়াটার ইঞ্চি টেনে ধোঁয়া ছাড়ে হাওয়ায়। ম্লান হেসে বলে, ভাইসব আমরা সর্বহারা।

দারোয়ান রিকশাঅলা দুজনেই হেসে ওঠে।

অলি বললো, আপা নেই?

দারোয়ান সিগারেট টান দিয়ে বললো, কোন আপা?

এই বাসায় কজন আপা।

আগে তো আছিলো বুলবুলি আপা। আইজ বিয়ানে দেকলাম দশ বারোজন আপা?

শুনে একটু চমকে ওঠে অলি। তাহলে ঐ দলের একজন আমার রাধা। কিন্তু কোনজন! কেমন করে বুঝবো! বুলবুলিকেও জিজ্ঞেস করা যাবে না। করলেও বলবে না। পরিচয় করিয়ে দেবে না। জেলাসের কারখানা হচ্ছে বুলবুলি।

অলি বললো, বুলবুলি নেই?

না। দলবাইন্দা কই জানি গেলো। ফুফু আম্মায় আছে।

শুনে আবার মেজাজ খাট্টা হয়ে যায় অলির। বুলবুলি ফুফুর বাসায় থাকে। কিন্তু ফুফুকে দিয়ে অলি কি করবে! বুলবুলিকে চাই। আর চাই সেই মেয়েকে। তখুনি মনে পড়ে পকেটে পয়সা নেই। রিকশা বিদেয় করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভেতরটাও মোচড় দিয়ে ওঠে অলির। সকাল থেকে খাওয়া হয়নি কিছু। পকেটে পয়সা না থাকলে খিদেটা চাগা দেয় যখন তখন। বুলবুলিকে পেলে এদুটো কাজ এট লিস্ট হতো। খাওয়া আর কিছু পয়সা। বুলবুলি আর ছ দিন আছে ঢাকায়। এখন পয়সা চাইলে ফেরাতো না।

কটা বাজে এখন? অনেককাল পর সময়টা একটু জানতে ইচ্ছে করে অলির।

স্বাধীনতার পর থেকে ঘড়ি পরে না অলি। ঘড়ি পরে কি হবে! তার সময় দেখার দরকার হয় না। কপালে তো টাইমটা লেখাই হয়ে আছে। বারোটা। ধুৎ শালা। পুরো পৃথিবীর উদ্দেশ্যে গালটা দেয় অলি। তারপর আবার রিকশায় চড়ে। মতিঝিল যাও।

দৈনিক বাংলা বিল্ডিংয়ের সামনে এডভারটাইজিং ফার্ম করেছে ইউ-সুফ। চারজন পার্টনার। চারতলার ওপর সুন্দর ছোট্ট রুম। চমৎকার করে সাজানো। দরোজার সামনে টুল নিয়ে বসে থাকে পিয়ন। ভেতরে চারটা সুন্দর টেবিল চারজনের জন্যে। গ্লাস টপ। টেবিলের ওপাশে খয়েরী রঙের গদিঅলা চেয়ার। আর সামনে দুটো করে। একই

রঙের, একই চেয়ার। এই অফিসটায় ঢুকলে মালিক এবং আগন্তুকদের ব্যবধান বোঝা যায় না। শুধু মাত্র এই একটা কারণে যখন তখন ইউসুফের অফিসে যায় অলি। নিজের অফিস মনে করে।

আর ইউসুফ অফিসে থাকেও সব সময়। নিজের চেয়ারে বসে, সামনে কিছু বন্ধু-বান্ধব, হরদম আড্ডা দেয় ইউসুফ। চা খায়, সিগারেট খায় প্রতি পাঁচ মিনিটে একটা। ব্যবসাটা যে কখন করে, বুঝতে পারে না অলি। আর ঢাকা শহরে এই একটা মজার ব্যাপার শুরু হয়েছে বছর দুয়েক ধরে। ইয়াং পোলাপান সব ট্রাভেল এজেন্সি করছে, এডভারটাইজিং ফার্ম করছে। চমৎকার অফিস হাঁকিয়ে বসে যাচ্ছে যেখানে সেখানে। পয়সার, ধান্দা, সুন্দর বসার জায়গা আর প্রেস্টিজ তিনটেই ম্যানেজ করছে এক সঙ্গে। শালা চোখের সামনে ধানাধান উঠে যাচ্ছে একেকজন। শুধু অলিরই কিছু হলো না।

কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে, করলো মুক্তিযুদ্ধ। তারপর ফিরে এসে আবার পড়াশোনার চেষ্টা। সেভেনটি সিক্স পর্যন্ত চলেছে। তারপর থার্ড ইয়ার অনার্স পড়তে পড়তে অকারণে একদিন ইউনিভার্সিটি যাওয়া ছেড়ে দিলো। কেন যে মনে হয়েছিলো, আমার হবে না।

মুক্তিযুদ্ধের পর সঙ্গের কিছু ছেলে মাউরাদের বাড়ি দখল, দোকান দখল, হাইজ্যাক ফাইজ্যাক করে ম্যালা টাকা পয়সা বানিয়েছে। ইচ্ছে করলে অলিও পারতো। ইচ্ছেটা করেনি। করলো পড়াশোনা। তাও হলো না। থার্ড ইয়ারে উঠে ছেড়ে দিলো। তারপর থেকে টো টো কোম্পানীর ম্যানেজারি। সকাল বেলা বাড়ি থেকে বেরোয়, ফেরে রাতের বেলা। কোনো কাজ নেই। বেকার ঘুরে বেড়ানো। আড্ডা মারা আর মেয়ে মানুষের পেছনে যখন তখন লেগে যাওয়া। কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলে কিংবা পছন্দ হলে তার শেষটা দেখে নেয় অলি। একটা কাজ পেয়ে যায়। লেগে থাকে। পাঁচ বছরে এটেম্পট নিয়েছিলো দুটো। মাঝে মাঝে মনে হতো কিছু একটা করা উচিত। বাপের হোটেলে আর কতোদিন। ঢাকার শহরে একখানা দোতলা বাড়ি আর একটা মাঝারি চাকরির মালিক বাপ। চারজন মানুষের সংসার। আসমুটা আবার কলেজে পড়ে। বাপের সোরস অফ ইনকাম তো চাকরি আর নিচের তলার ভাড়াটে। এসবে কতোদিন চলে!

সেভেনটি সেভেনে কিছুদিন পুরোনো লোহার ব্যবসা ধরেছিলো অলি। ধোলাই খালের পাশে দোকান ছিলো খালেকের। অলির স্কুল জীবনের বন্ধু। বাপের কাছ থেকে হাজার দশেক টাকা নিয়ে অলি গিয়ে ভিড়েছিলো খালেকের সঙ্গে। মাস তিনেক চলেছিলো ব্যবসা। পুরোনো লোহা বেচে লাভ তো দূরের কথা, তিনমাস পর হিসেব কিতেব করে সাতশো একাশি টাকা ফেরত পেলো অলি। বাকিটা গায়েব।

সেই টাকায় এক প্যাকেট স্টার কিনে ছিলো অলি। তারপর টানতে টানতে বাড়ি ফিরেছে। আমার হবে না।

সেভেনটি নাইনে মতিঝিলে একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি নিয়েছিলো অলি। মাস চার পাঁচেক করেছে। তখুনি একটা ঘাপলা লাগলো। মালিক ভদ্রলোক আদম ব্যবসাও করছিলো ফাঁকে ফাঁকে। ষাট সত্তর জন লোকের কাছ থেকে তিরিশ হাজার করে টাকা নিলো সৌদি আরব পাঠাবে বলে। তারপর একদিন নিজেই হাওয়া হয়ে গেলো। ট্রাভেল এজেন্সিতে তালা পড়ে গেলো। সেদিনও একটা স্টার ধরিয়ে অলি ভেবেছিলো, আমার হবে না।

তারপর সম্পূর্ণ দুটো বছর, অলির আর কোনো এটেম্পট নেয়া হয়নি। দশ হাজার টাকার শোক এখনো উথলে পাথলে ওঠে বাপের। যখন তখন। যেদিন ওঠে সেদিন আর বাড়ি ফেরা হয় না অলির।

দিন চলে যাচ্ছে।

এখন এই দুপুরবেলা ইউসুফের অফিসের সিঁড়ি টপকাতে টপকাতে কথাগুলো মনে পড়ে অলির। শালা দশ হাজার টাকা, এখন আমি দশ টাকার ধান্দায় আছি বাপজান। রিকশা বিদেয় করতে হবে।

নিজের টেবিলে বসে জমিয়ে গল্প করছে ইউসুফ। সামনে তিনজন বসে। হাতে সিগারেট জ্বলছে সবার। টেবিলের ওপর চায়ের কাপ। ইউসুফের পাশের টেবিলে বসে একজন আর্টিস্ট মনোযোগ দিয়ে বিজ্ঞাপনের ডিজাইন করছে। পাশের টেবিলে তুমুল আড্ডা তার গায়ে লাগছে না। ঠিক এই সময় ঢুকলো অলি। তারপর কোনোদিকে না তাকিয়ে ইউসুফের সামনে। দশটা টাকা দে তো।

শুনে চায়ে চুমুক দিতে ভুলে গেলো ইউসুফ। এবং সিগারেটে টান দিতে। তুমুল আড্ডা মুহূর্তে নিভে গেলো।

কি ব্যাপার?

ব্যাপার কি আবার। রিকশা ভাড়া দিতে হবে। অলি একটা চেয়ার টেনে বসে। তাড়াতাড়ি কর।

ইউসুফ মানিব্যাগ খোলে। টাকাটা বাঁ হাত দিয়ে নেয় অলি। তারপর নিজেই ইউসুফের পিয়নটা ডেকে বলে, নিচে রিকশা আছে। দিয়ে এসো।

কয় টেকা স্যার?

পুরো দশ টাকা। দেখবে স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরা রিকশাঅলা। সবুজ লুঙ্গি।

পিয়ন চলে গেলে, নিশ্চিন্তে সবার দিকে তাকায় অলি। দেখে তিন-জনের দুজন তার পরিচিত। আলমগীর আর খসরু। তিন নম্বর ছেলেটি অচেনা।

অলি তারপর অচেনা ছেলেটির দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। আমার নাম অলি। ইউসুফের ন্যাংটো বয়সের বন্ধু।

ছেলোটি হেসে বললো, বুঝতে পারছি। আপনিও খেলেন?
না ইউসুফ খেলে।
তা জানি।
আমিও খেলতাম। খুব ছোটবেলায়। হেসে ফেললো অলি। আমরা একসঙ্গেই খেলতে শুরু করেছিলাম। ইউসুফ খেলাটা ধরে রাখলো। স্টেডিয়াম পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। তারপর খেলো মার। তোর পায়ের কি অবস্থা দোস্ত?
ইউসুফ বললো, সম্পূর্ণ ঠিক হবে না।
বলে কিক করতে পারিস?
যা ব্যাটা! খেলতেও পারি। তো আগের এনার্জিটা নেই। কালই তো চিটাগাং থেকে ফিরলাম। হাজার পাঁচেক টাকার খ্যাপ। জিতে এসেছি।
কোন পায়ে যেনো ব্যথা পেলি তুই?
বাঁ পায়ে।
যাক ডান পাটা যে বেঁচে গেছে।
কথাটা এমনভাবে বললো অলি, যেনো পিটিয়ে কেউ পা ভেঙে দিয়েছে ইউসুফের। সবাই হেসে ফেললো।
অলি বললো, জানিস দোস্ত আমি জীবনে দুবার স্টেডিয়ামে ঢুকেছি। তার মধ্যে লাকিলি একদিন তোর খেলা ছিলো। খেলা দেখতে আমার খুব বাজে লাগে। এশীয় যুব ফুটবলের একটা কার্ড পেয়েছিলাম। আমার বন্ধু পাভেলকে চিনিস? ফটোগ্রাফার। আরে শালা পৃথিবীর সেরা ফটোগ্রাফার। পাভেল জোগাড় করে দিয়েছিলো। কিন্তু কথা হচ্ছে কি জানিস, আমি একদিনও দেখতে যাইনি। কার্ডটা আমার এক খালাতো ভাই এসে চাইলো, দিয়ে দিলাম। পরে শুনি ওটা নাকি চার পাঁচশো টাকা বেচা যেতো। শুনে দুঃখে মন ভরে গেছে। ইস পাঁচশো টাকার বাণিজ্য!
শুনে আবার সবাই হাসে। দেখে অলি মনে মনে খুব খুশি। এইতো চাই, যেখানে যাবো চাপাবাজি করে সব পাগল করে দেবো।
ইউসুফ বললো, চা খাবি?
না ভাত খাবো।
ভাত মানে?
খিদে পেয়েছে। তুই দুপুরের খাওয়া।
খানিক আগে সেরে নিয়েছি।
কি?
নানরুটি আর খাসির চাপ।
কোথ্থেকে?·

কাফে ঝিল।
আমিও কাফে ঝিল খাবো।
শুনে আবার সবাই হাসে। সেই ফাঁকে টেবিলের ওপর, ইউসুফের বেনসানের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট নিয়ে ধরায় অলি। তারপর পায়ের ওপর পা তুলে সিগারেট টানে। বাবা বেকেন বাওয়ার, খাদ্যটা আনাও বাবা।
ইউসুফ ম্লান হাসে। কি?
ঐ যে নানরুটি আর খাসির চাপ।
পিয়ন ডাক।
কেন শালা তুমি ডাকতে পারো না!
তুই খাবি, তুই ডাকবি। পয়সা এবং গলা দুটো খরচ করতে পারবো না।
আচ্ছা। তারপরই গলা খুলে একবার হাঁক দেয় অলি, পিয়ন ভাইজান...

অলি খাচ্ছে, ইউসুফ বললো, তোর দোয়েল পাখিটার খবর কি?
দোয়েলটার বড়ো অসুখ।
সে তো জন্মের পর থেকে শুনে আসছি।
যা ব্যাটা। বছরখানেক ধরে।
একই কথা। কি অসুখ?
জানি না। একদিন ভালো থাকে তিনদিন খারাপ। ডাক্তার নাকি ধরতেই পারে না কি অসুখ দোয়েলের। দোয়েলের অসুখ, আমার বাণিজ্য লস হয়ে যাচ্ছে।
বাণিজ্য মানে!
আরে ব্যাটা দোয়েলের কাছ থেকে পয়সাকড়ি নিয়েই তো আমি চলছি চার পাঁচ বছর ধরে। এখন বছরখানেক অসুখ। বাসায় গেলেই দেখি শুয়ে আছে। রোগীর কাছে টাকা চাওয়া যায়?
শুনে সেই ছেলেগুলো আবার হাসে। আলমগীর বললো, সেভিংস একাউন্টটা তো ভালোই বাগিয়েছো বাপ। মাল কেমন?
সরেস। বাপের ম্যালা টাকা। শালা কারগো লঞ্চই আছে আঠারোটা।
টাকার কথা না ব্যাটা। দেখতে কেমন?
আঠারো বছর বয়সে দোয়েলের প্রেমে পড়েছিলাম চেহারা দেখে। রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে। এখন হলে পড়তাম না। পঁচিশ বছর বয়েসে চেহারার চেয়ে ফিগারই চোখে পড়ে আগে।
ফিগার কেমন?
আমি দোয়েলের ফিগার দেখি না। প্রতিদিন একবার দোয়েলের কাছে যাই। তখন আমার বয়েস আঠারো।
ববা গোপনে পদ্য লিখিস নাকি আজকাল?

কেন?
জবরদস্ত কথা বললি।
আসলেই। দোয়েলের কাছে গেলে মনে হয় আমার সেই আগের জীবনেই আছি।
ভালো ভালো। বিয়ে করে ফেল। বাপ মালদার। ক ভাইবোন দোয়েল-দের?
এক বোন।
মানে?
কোনো ভাইবোন নেই দোয়েলের। নিজেই নিজের একমাত্র বোন।
উত্তেজনায় অলির পিঠে থাপ্পড় মারে আলমগীর। লাগা দোস্ত।
থাপ্পড় খেয়ে অলি অযথা একটু গম্ভীর হওয়ার ভান করে। কার গায়ে হাত তুলিস রে শালা! জানিস আমি মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম।
শুনে হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। আর সেই হাসির অনেক ভেতর থেকে মৃদু রিনরিনে আর এক হাসির শব্দ পায় অলি। সেই মেয়ে হাসছে।
মাথা খারাপ হয়ে যায় অলির। পাগলের মতো জিজ্ঞেস করে, ইউসুফ দোস্ত কটা বাজে রে?
পৌনে তিনটা।
তোর টেলিফোনটা কই?
টেবিলের নিচে রেখে দিয়েছি।
ধুৎশালা। অলি উঠে দাঁড়ায়, মানিব্যাগ বের কর।
ক্যান?
কটা সিকি আছে দেখ।
একটাও নেই।
ইয়ার্কি মারিস না, দেখ। আলমগীর তুইও বের কর। খসরু মিয়া তুমিও দেখো। আর এই যে ভাইজান কি যেনো নাম আপনার, দেখুন কটা সিকি আছে পকেটে। আমার খুব জরুরী টেলিফোন।
নটা সিকি বেরুলো চারজনের পকেট থেকে। থাবা মেরে সিকিগুলো নেয় অলি। তারপর হাত তুলে বললো, জয়বাংলা। প্রেম করতে চললাম ভাইসব।

টেলিফোন তুলেই অলি বললো, হ্যালো
ওপাশে খরখরা গলায় এক মহিলা বললেন, কাকে চাই?
বুলবুলি নেই?
তুমি কে?
বুলবুলির বন্ধু।

কি নাম?

অলি।

ও আচ্ছা। আমি বুলবুলির ফুফু আম্মা।

শ্লামালেকুম ফুফু। বুলবুলি বাসায় নেই?

না বুলবুলি তো যশোর গেলো।

সকালে যে আমার সঙ্গে কথা হলো!

হ্যাঁ এই তো দুপুরবেলা গেলো। ওর এক চাচাতো ভাই এসেছিলো ওকে নিতে। শুনেছো তো বুলবুলি চলে যাচ্ছে।

হ্যাঁ উনিশ তারিখ। বুলবুলি যশোর থেকে ফিরবে কবে?

সতেরো আঠারো তারিখে।

আচ্ছা। তাহলে পরে টেলিফোন করবো।

বুলবুলি চলে যাচ্ছে, বুঝলে আমার মনটা একদম ভেঙে যাচ্ছে। জানো তো আমার কোনো ছেলেমেয়ে নেই বলে জন্মের পরই বুলবুলিকে আমার কাছে এনে রেখেছিলাম। বুলবুলির জন্যে তোমরাও আসতে আমার বাসায়। মনে হতো আমার অনেক ছেলেমেয়ে। বুলবুলি চলে গেলে কেউ আসবে না আমার বাসায়।

ফুফুর গলা ভেঙে আসে। অলি টের পায় তার আবার মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি কি বুলবুলির জন্যে টেলিফোন করেছি! করেছি তো তার জন্যে। সে নেই, পয়সা খরচা করে মা শ্রেণীর মহিলাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না।

অলি বললো, ফুফু আমার একটু কাজ ছিলো।

ফুফু কেয়ার করেন না। বুলবুলির বাপ বহু আগেই বুলবুলিকে নিয়ে যেতে চেয়েছে। আমি দেইনি। কিন্তু এবার আর নিষেধ করা গেলো না। বুলবুলি বড়ো হয়েছে। এবার ওর বিয়ে দেবে। ছেলে ঠিক হয়ে আছে। লণ্ডনে সেটেল্ড। বুলবুলি যাওয়ার পরই বিয়ে

তখুনি লাইনটা কেটে যায়। পয়সা শেষ। অলি খুব খুশি হয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখে। মনটা খারাপ হয়ে গেছে তার। শালা বুলবুলিটাও যশোর চলে গেলো। নয়তো বুলবুলিকে ম্যানেজ করে মেয়েটির নামধাম সব জানা যেতো। কায়দা করে। তারপর দেখে নিতাম, তুমি কি! প্যাকেটে একটাই সিগারেট ছিলো। সিগারেটটা ঠোঁটে লাগিয়ে ম্যাচ খোঁজে অলি। নেই। শালা ইউসুফের টেবিলে ফেলে এসেছি।

একটা পান বিড়ির দোকানের সামনে গিয়ে আগুন খোঁজে অলি। দু সেকেণ্ডের মধ্যে পেয়ে যায়। দড়ির আগুন দোকানের পাশেই ঝুলে ঝুলে জ্বলছে। সেই আগুনে সিগারেট ধরায় অলি। সিগারেটে প্রথম টান দিয়ে তার আবার মনে হয়, আমার হবে না।

অলি তারপর আনমনে মতিঝিলের দিকে হাঁটতে থাকে। দুপুর শেষ

হয়ে আসছে তবুও লোকজনের কমতি নেই। হাজার হাজার লোক ছুটছে। কতো যে কাজ মানুষের!

ঢাকা শহরের লোকজন কি একটু স্পীডি হয়ে গেছে! অর্থনীতির পাগলা ঘোড়া পাছায় লাথি মেরে ছোটাচ্ছে সবাইকে!

ভিড়ের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অলি খুব একলা হয়ে যায়। পরনে নীল কডের প্যান্ট। খানে খানে ঘেয়ো কুকুরের মতো ছাল ওঠা। একটা শাদা শার্ট পরেছে। ফুল হাতা। নিচের দিকে দুটো বোতাম নেই বলে, প্যান্টের ভেতর ইন করা। অনেককালের পুরোনো শার্ট, শাদা রঙ মুছে গিয়ে গেরুয়া একটা রঙ ধরেছে। এসব নিয়ে অলির কোনো মাথা ব্যথা নেই। আনমনে হাঁটতে হাঁটতে সে একবার হাঁটুর দিকে তাকায়। হাঁটুর কাছে প্যান্টটা একটু ফেসে গেছে বলে সেখানে একটা স্টিকার লাগিয়েছে অলি। শাদা রঙের ওপর লাল কালিতে লেখা লাভ জেনারেশান। দেখে অলি একটু হাসে। তারপর বিড়বিড় করে নিজেকে নিজেই বলে, শালা সর্বহারা জেনারেশান।

হাঁটতে হাঁটতে রামকৃষ্ণ মিশন রোডে চলে আসে অলি। দোয়েলদের বাড়ি। দোয়েলদের বাড়িটা বেশ সুন্দর। শাদা রঙের টেলিভিশন প্যাটার্ণের দোতলা বাড়ি। সিলভার কালারের বিশাল গেট। তারপর গ্যারেজ। গ্যারেজে লেটেস্ট মিটসুবিসি একটা। শাদা ধবধবে।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে, অলি দেখে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে দুজন স্যুটপরা লোক। খুব মগ্ন হয়ে কথা বলছে দুজনেই। তার একজন দোয়েলের বাপ, এক মিনিট পরে চিনতে পারে অলি।

নিচের বারান্দায় নেমে অন্য ভদ্রলোক বললেন, ইমিডিয়েট বাইরে নিয়ে যান ওকে। ট্রিটম্যান্টও হবে চেঞ্জও হবে।

দোয়েলের বাবা বললেন, দিন দশেকের মধ্যেই নিয়ে যাবো।

তারপর খুব চিন্তিত মুখে বলেন, ডাক্তার সাহেব আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছেন না তো!

ডাক্তার ভদ্রলোক ম্লান হাসেন। আরে না। নার্ভাস হওয়ার কিছু নেই। অলি বুঝতে পারে দোয়েলকে নিয়েই কথা হচ্ছে দুজনের মধ্যে। বুকের ভেতরটা একটুখানি দুলে ওঠে অলির। দোয়েলও তাহলে বাইরে চলে যাচ্ছে! কোথায়?

বাংলাদেশের বাইরে! তাহলে!

দোয়েলের বাপ কিংবা ডাক্তার ভদ্রলোক, কাউকে কেয়ার না করে সিঁড়ির দিকে এগোয় অলি!

সিঁড়ির অর্ধেকটা উঠেছে, পেছন থেকে দোয়েলের বাবা ডাকেন, অলি। জ্বী। সিঁড়ির ওপরই ঘুরে দাঁড়ায় অলি।

নিচে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দোয়েলের বাবা বললেন, দোয়েলের খুব শরীর খারাপ।
শুনেছি।
ডাক্তার বললেন, ওকে যেনো তেমন কোনো ডিস্টার্ব না করা হয়।
অলি একটু থতমত খেয়ে যায়। না আমি কোনো ডিস্টার্ব করবো না। শুনলাম দোয়েলকে নিয়ে আপনি বাইরে চলে যাচ্ছেন, এজন্যে একটু দেখা করতে এলাম।
দেখা করো। কিন্তু
পাঁচ মিনিট পরেই চলে যাবো। বলে অলি আর দাঁড়ায় না। আস্তে ধীরে উপরে ওঠে যায়।
দোয়েলের রুমটা দোতলার পুবদিকে। দরোজায় নীল নেটের পর্দা ঝুলছে। নীল রঙ দোয়েলের খুব প্রিয় বলে ঘরের সব পর্দা নীল রঙের। মেঝেতে নীল রঙের কার্পেট, ঘাসের মতো নরোম। বিছানার চাদর নীল রঙের, দেয়ালে নীল ডিসটেম্পার। দোয়েলের রুমে ঢুকেই অলির মনে পড়লো ইরাপশান গ্রুপের গাওয়া গান, ওয়ানওয়ে টিকিট টু দ্যা ব্লু অথচ দোয়েলের ঘরে তখন ছোট্ট ক্যাসেট রেকর্ডারে বাজছে আশা ভোঁসলের রবীন্দ্র সঙ্গীত , তুমি কোন কাননের ফুল
খানিক দাঁড়িয়ে গানটা শোনে অলি। অনেক কাল পরে প্যানপ্যানে বাংলা গানের একটা লাইন অলির বুকের খুব ভেতরে কেমন একটা ভাঙচোর করে। মা বাবার পুরনো ঝগড়ার মধ্যে কোথায় যেনো অলিকে নিয়ে একটা রহস্যময়তা আছে। কি? অনেককাল পর অলি তারপর একটা ডিসিশান নেয়। আমি কাল ডিটেকটিভ হয়ে যাবো। আমাকে কাল জানতে হবে আমাকে নিয়ে মা বাবার মধ্যে কি রহস্য!

দোয়েল জানালার দিকে মুখ করে বসে ছিলো। বিছানার ওপর। দোয়েলের বিছানার সঙ্গে বিশাল জানালা। পর্দা সরিয়ে সেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে দোয়েল! দেখে কেন যে অলির একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে। তারপর নিঃশব্দে দোয়েলের পেছনে গিয়ে দাঁড়ায় অলি। দোয়েল এতোটা মগ্ন হয়েছিলো, টের পায় না। দেখে অলি মুহূর্তে আঠারো বছর বয়সে ফিরে যায়। পেছন থেকে আস্তে করে দোয়েলের চোখ টিপে ধরে।
মুহূর্তে কেঁপে ওঠে দোয়েল। তারপর আস্তে করে হাত রাখে চোখ ধরা হাতে। ছাড়ো।
আগে বলো কে?
কড়ে আঙুলে ছুঁয়েও বুঝতে পারি তুমি কে?
কে?

আমাকে ছুঁতে পারে এমন পুরুষ পৃথিবীতে আর কে আছে!

অলি খুশি হয়ে দোয়েলের চোখ ছেড়ে দেয়। তারপর দোয়েলের পাশে বসে পড়ে। কটা বাজে দোয়েল?

দোয়েল অবাক হয়ে অলির মুখের দিকে তাকায়। কেন বলো তো! তুমি তো কখনো সময় জানতে চাও না!

এখন জানতে হবে।

কেন?

তোমার বাবা বলে দিয়েছেন পাঁচ মিনিটের বেশি

কি?

বসা যাবে না।

মানে?

আমি তাকে কথা দিয়েছি পাঁচ মিনিট থেকে চলে যাবো।

ও। দোয়েল খুব দুঃখী হয়ে যায়। অলি দেখে একদিনে দোয়েলের চোখের কালি দ্বিগুণ হয়ে গেছে। মুখটা অসম্ভব রকম শুকনো দেখে বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে অলির।

দোয়েল বললো, বাবা আমাকে নিয়ে হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এই মাত্র ডাক্তার এসেছিলো!

হ্যাঁ ডাক্তারের কথা শুনলাম। তুমি নাকি চেঞ্জে যাচ্ছো।

হ্যাঁ।

কোথায়?

ইউরোপে। চিকিৎসা এবং চেঞ্জ দুটোই নাকি আমার খুব দরকার। ইউরোপীয় ট্রিটম্যান্ট আর আবহাওয়ায় আমি নাকি সম্পূর্ণ সেরে উঠবো।

ও। অলি তারপর একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। কতোদিন থাকবে? ছ সাত মাস?

অনেকদিন।

তুমি এখানে না থাকলে আমি প্রতিদিন সকালবেলা কোথায় যাবো?

তুমি কি প্রতিদিন সকালবেলা আমার কাছে আসো?

আসি না!

এ কথায় দোয়েল হঠাৎ খুব অভিমানী হয়ে ওঠে। তাহলে আজ আসোনি কেন? আমি সকাল থেকে তোমার অপেক্ষায় থেকে থেকে, থেকে থেকে

দোয়েলের চোখ ছলছল করে ওঠে। অলি বুঝতে পারে এখুনি কেঁদে ফেলবে দোয়েল। দোয়েলটা এই রকম। এখনো আঠারো বছর বয়েসে আছে। এ জন্যেই তো যখন তখন দোয়েলের কাছে ছুটে আসে অলি।

দোয়েল বললো, আমি আর কোনোদিন ফিরবো না। তোমাকে আর কোনোদিন আমার কাছে আসতে হবে না।
এসব কথার পর কি বলতে হয় অলি জানে না। দুহাতে বুকের কাছে টেনে আনে দোয়েলকে। মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। মাফ করে দাও। আর কোনোদিন এমন করবো না।
দোয়েল কথা বলে না। চুপ করে অলির বুকের কাছে মিশে থাকে। অলি বললো, যাই। বেশিক্ষণ থাকলে তোমার বাবা রাগ করবেন।।
শুনে লাফিয়ে ওঠে দোয়েল। তুমি যাবে না! তাহলে আমি এখুনি বাবাকে ডাকবো। ডেকে বলবো, তুমি যাবে না। কোনোদিন যাবে না। আমার সঙ্গে থাকবে।
অলি মজা করে বললো, কেমন করে?
কেন? তারপরই লজ্জা পেয়ে যায় দোয়েল। মাথা নিচু করে দাঁতে নখ খুঁটে। তারপর দুঃখী গলায় বলে, তোমাকে কাছে রাখার কি যোগ্যতা আছে আমার! আমি একটি রোগা মেয়ে। অসুস্থ।
গলা ভেঙে আসে দোয়েলের।
অলি বললো, এসব বলবে না। তাহলে সত্যি চলে যাবো। আর কোনোদিন আসবো না।
দোয়েল চুপ করে থাকে।
অলির ভেতর তখন ভীষণ একটা ভাঙচোর চলছে। কেন যে মনে হয় আমাকে এবার এটেম্পটটা নিতে হবে। একটুখানি দাঁড়াতে হবে। প্রথমবার দশ হাজার টাকা, পরেরবার ট্রাভেল এজেন্সির চাকরি নিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছি। হয়নি। পঁচিশ বছর বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। আমি এবার থার্ড এণ্ড লাষ্ট এটেম্পট নেবো। দোয়েল আমার সম্পদ। আমি এবার দাঁড়াবোই।
অলি বললো, দোয়েল তুমি আমার বউ হবে?
কি? দোয়েল ভীষণ চমকে ওঠে। কি বলছো?
কেন আমি কি খুব অযোগ্য! আমার পড়াশোনা নেই, চাকরি বাকরি নেই। আর তুমি ভীষণ বড়োলোক বাবার একমাত্র মেয়ে, এজন্যে?
শুনে দোয়েল কেমন চোখে তাকায়। অলি দেখে দোয়েলের চোখ ছলছল করছে। বুক ভেঙে যায় অলির। দোয়েল আমি কি তোমাকে কোনো কষ্টের মধ্যে ফেলে দিলাম?
দোয়েল বললো, অলি আসলে আমারই কোনো যোগ্যতা নেই তোমার বউ হওয়ার। আমি রোগা অসুস্থ মেয়ে। আমার বোঝা তুমি সারা-জীবন বইবে কেন? আমার কি আছে!
তোমার শুধু তুমি আছো। আমার আর কিছু চাই না। আমি বেকার মানুষ। আমার একটা কাজ চাই। তুমি আমার বউ হলে আমি

সারাক্ষণ তোমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবো। আমি একটা কাজ পেয়ে যাবো।

না, তা হয় না। বলেই দুহাতে অলির গলা জড়িয়ে ধরে দোয়েল। হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। দোয়েলকে কেমন করে থামাবে অলি! মাথায় হাত বুলায়, পিঠে হাত বুলায়। আর বলে, কাঁদে না বউ, লক্ষ্মী সোনা

অলিরও কি তখন চোখ ভরে এসেছিলো জলে।

অনেকক্ষণ কেঁদে তারপর থামে দোয়েল। অলি বলে, আমি তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলবো।

দোয়েল কথা বলে না। মাথা নিচু করে কান্নার রেশ থামায়। তারপর আস্তে করে বলে, আমিও বাবাকে বলবো।

শুনে কি যে খুশি হয় অলি। হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে। তারপর দোয়েলকে পাঁজা কোলে নিয়ে ঘরের ভেতর চক্কর খায়। কতোবার যে ডাকে, বউ আমার বউ।

অলির কোলে ছটফট করে দোয়েল। ছাড়ো, ছেড়ে দাও। কেউ দেখে ফেলবে।

অলি কেয়ার করে না।

খানিক পর দোয়েলকে বিছানায় নামিয়ে অলি বললো, তাহলে?

কি?

তুমি বিদেশ যাবে?

যাবো না! যাবো। তারপর তোমার জন্যে সুস্থ হয়ে সুন্দর হয়ে ফিরে আসবো। মাত্র তো ছটা মাস। আমরা দুজনেই পৃথিবীর দুপ্রান্তে বসে প্রতিদিন দিন গুনবো আর অপেক্ষা করবো। ভারি মজা হবে।

অলি বললো, তাহলে তুমি আমাকে ঐ ক্যাসেটটা দিয়ে যেও।

কোনটা?

তুমি কোন কাননের ফুল। আমি প্রতিদিন ক্যাসেটটা শুনবো আর ভাববো, আমার জন্যে বহু দূরের কোনো উদ্যানে সম্পূর্ণ ফুটে ওঠার অপেক্ষায় আছে একটি ফুল।

অথচ আজ সকালে টেলিফোনে সেই মেয়ের হাসি শুনে পাগল হয়ে গিয়েছিলো অলি। কাল থেকে তাকে খুঁজবে ভেবেছিলো। সে কথা তার একদম মনে নেই। ১৯৮১

চাই বাবলিকে

বাবলিকে সবাই চেনে। ঢাকা শহরে বাবলির অনেক ছেলে বন্ধু। বাবলি সবার সঙ্গে সময় করে করে দেখা করে, আড্ডা মারে, সিনেমা থিয়েটার দেখে বেড়ায়। কিন্তু বাবলির একটু ভুলোমন বলে কখনো কখনো তার এপয়েনমেন্টের টাইম গুলিয়ে যায়। হয়তো শনিবার সকাল এগারোটায় রমনা রেস্টুরেন্টে বাবলির সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা। আমি টাইমলি উপস্থিত। এগারোটা সোয়া এগারোটা তারপর বারোটা, পুরো এক ঘন্টা কেটে যায়। বাবলির দেখা নেই। আমি বিরক্ত হয়ে চলে আসি।

পরে বাবলিকে কথাটা বললে বাবলি চোখ বড়ো করে খানিক তাকিয়ে থাকবে। তারপর হেসে বলবে, গুল মারছো কেন, আমার তো সেদিন শোয়েবের সঙ্গে এপয়েনমেন্ট ছিলো। আমরা বলাকায় সুজন সখী দেখলাম।

আমার কিছু করার থাকে না। ধরা যাক, বাবলিকে আমি সত্যি-মিথ্যে মিলিয়ে বোঝালাম, তোমার সঙ্গে আসলে আমারই এপয়েনমেন্ট ছিলো, তুমি ভুলে গেছো। বাবলি হয়তো ব্যাপারটা মেনেও নিলো। কিন্তু মেনে নিয়ে বাবলি হাসবে, কিংবা দুঃখিত হয়ে বলবে, আমি সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি মাইণ্ড করো না।

আমি তো ছাই পুরুষ মানুষ, বাবলি সুন্দরী মেয়ে। আদুরে গলায় কথা বললে হৃৎপিণ্ডে দোলা লাগে। ভুলে যাই। বাবলির কোনো অপরাধ থাকে না।

ফলে আবার বাবলির সঙ্গে প্রোগ্রাম। মঙ্গলবার দুপুর বেলা, ঠিক একটায় ফ্লামিঙ্গোতে।

বাবলি এবারও মিস করে। দেখা গেলো বাবলি তখন কাজলের সঙ্গে রমনা রেস্টুরেন্টের ঝুল বারান্দায় বসে কুল ড্রিংক্স আর গল্প গুজবে মেতে আছে। আমার কথা তার মনে নেই। কিংবা এরকম মনে আছে, দুপুর একটায় কোথাও তার এপয়েনমেন্ট ছিলো। ফ্লামিঙ্গো পাল্টে সেটা রমনা রেস্টুরেন্ট হয়ে গেছে। আর সেই ভুল জায়গায়ই বাবলির কোনো বন্ধু বাবলির অপেক্ষায়

কখনো ভাবি, দূর শালা ছেড়ে দিই বাবলিকে। হয়তো বা ছেড়েই দিলাম। বাবলির সঙ্গে পনেরো দিন দেখা নেই।
কামাল বললো, বাবলি তোমাকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।
ব্যাপারটার আমি গুরুত্ব দিই না। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাই। স্মার্ট ভঙিতে টানতে টানতে যেনো বা বাবলিকে চিনি না এরকম পোজ মারি।
কামাল কথা বাড়াতে সাহস পায় না। কেটে পড়ে। তখন ফিল করি, হৃৎপিণ্ডে মৃদু কাঁপন। বাবলি আমাকে খুঁজছে! পোজপাজ কেটে যায়।
রাতের বেলা, নটা দশটার দিকে বাবলিকে টেলিফোন করি। হ্যালো বাবলি
ইয়েস।
আমি মিলন।
সত্যি? বাবলির ভয়েস টিন এজার মেয়েদের মতো মিষ্টি শোনায়। আমি মুগ্ধ হয়ে বলি, বিশ্বেস হয় না?
হয়। কিন্তু তুমি থাকো কোথায়? তোমার সঙ্গে যে আমার ভীষণ দরকার!
আমি চুপ করে থাকি। এটা বাবলির এক ধরনের চালাকি। বহু-দিন কারো সঙ্গে দেখা না হলে বাবলি নিজেকে এভাবে প্রেজেন্ট করে। ব্যাপারটা আমার জানা। ফলে আমি চুপ করে থাকি।
বাবলি বলে, কি হলো কথা বলছো না কেন?
কি বলবো?
তোমার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।
হবে।
কোথায়?
আমি আবার চুপ। নিজেকে ঢাকাইয়া ফিল্মের হিরোর কায়দায় এস্টাব-লিস্ট করতে হবে। নইলে বাবলি এবারও কথা দিয়ে কথা রাখবে না। ভেবে বলি, কদিন আমি খুব বিজি। পরে জানাবো।
বাবলি একটু চুপ করে থাকে। টেলিফোনে মৃদু একটা শ্বাসের শব্দ। দীর্ঘশ্বাস কি! তাহলে বাবলি আমাকে ফিল করে! আমি বাবলিকে চাই, বাবলিও কি আমাকে
আমি কিছু একটা বলতে যাবো, তখনি বাবলি বললো, কাল তোমার কি কাজ?
কখন?
দশটা এগারোটার দিকে।
আমি একটু গ্রীন সুপার মার্কেটে যাবো।

ওখানে কি?
লর্ডস টেইলার্সে একটা স্যুট বানাতে দিয়েছি। কাল ট্রায়াল।'
তাহলে তো বেশিক্ষণের কাজ নয়।
কাজ আর এমন কি। কিন্তু লর্ডসে গেলে অনু মামা সহজে ছাড়বে না।
তাহলে আমি ওখানে আসি?
এ কথায় আমার হৃৎপিণ্ডে আবার মৃদু কাঁপন। সামলে নিয়ে বলি, ঠিক আছে।
কিন্তু আমার গলাটা বুঝি একটু কেঁপে যায়। বাবলি বুঝতে পারে না। টেলিফোন রেখে দেয়।
তখন আমি সিগারেট ধরিয়ে ভাবি, ইয়েস আই য়্যাম দ্যা হিরো। বাকাপ। বাবলিকে এবার ঠিক ম্যানেজ করবো। বার বার ঘুঘু তুমি হা হা!
রাতটা বাবলির কথা ভেবে কাটে। বাবলি খুব সুন্দর, ববিতার মতো। আর খুব ফ্রি, স্মার্ট। বাবলিকে আমার চাই।
পরদিন ঠিক সাড়ে দশটায় আমি গ্রীন সুপার মার্কেটে হাজির।
লর্ডসে ঢুকতে গিয়ে তো হা। ভেতরে সোফার ওপর বাবলি বসে আছে। অনু মামা আসেনি এখনো। শো রুমের কাউন্টারে ম্যানেজার খাতাপত্র চেক করছে। পার্টিশানের ওপাশে একসঙ্গে তিন চারটে সেলাইকল ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক দিচ্ছে। আমি এসবের কিছুই খেয়াল করি না। বাবলিকে দেখামাত্র আমার হৃৎপিণ্ডটা বুকের ভেতর দু তিন-বার জাম্প করে এখন স্থির। বাবলি তাহলে সত্যি সত্যি!
আমাকে দেখেই বাবলি লাফিয়ে ওঠে, তুমি এতো দেরি করলে কেন? কারো জন্যে ওয়েট করা বোরিং।
কখন এসেছো?
ঠিক দশটায়।
আমি অবাক হই। মৃদু হাসি। আই য়্যাম সো সরি ডিয়ার।
তারপর তাকিয়ে তাকিয়ে বাবলিকে দেখি। বাবলি আজ হালকা সবুজ শাড়ি পরেছে। ম্যাচ করে ব্লাউজ, ভ্যানিটি ব্যাগ। কপালে বিরাট টিপ, তাও সবুজ। ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক। পায়ে স্যাণ্ডেল, সবুজ। বাবলিকে দারুণ লাগে। আর বাবলির চেহারায় কি যেনো একটা আছে। সব সময়ই বাবলিকে খুব ইনোসেন্ট দেখায়। গাছ-পালার মতো সরল। আমি মনে মনে বলি ইয়াঃ গ্রীন লেডি!
অনু মামা নেই। তবুও ফর্মালিটিটা ঠিকই হয়। আমি ট্রায়াল রুম থেকে বেরিয়ে দেখি বাবলির সামনে দু কাপ কফি। আমি গিয়ে বাবলির পাশে বসতেই বাবলি কফির কাপ হাতে নেয়। আমিও।

দু তিন চুমুকে কফি শেষ করে সিগারেট ধরাই। আমার সবকিছুতে চিরকালই খুব দ্রুততা। আজ একটু বেশি।

লর্ডস থেকে বেরিয়ে বাবলিকে জিজ্ঞেস করি, কোথায় যাবো?

তুমি যেখানে নিয়ে যাও। বাবলির ভয়েস মফস্বলী প্রেমিকাদের মতো।

আমি একটু হাসি। স্কুটারের জন্য চারদিকে তাকাই। বাবলি বলে, আজ শুধু তোমার জন্যে বেরিয়েছি। সারাদিন তোমার সঙ্গে থাকবো।

ঠিক তখুনি নাইনটি সি সি হোণ্ডা চালিয়ে এক যুবক আমাদের সামনে এসে থামে। হ্যাল্লো বাবলি, হাউ আর ইউ?

বাবলি হাসে, ফাইন!

আমার বিচ্ছিরি লাগে। এদিক ওদিক তাকিয়ে স্কুটার খুঁজি। আড়চোখে ছেলেটাকে দেখি। বিড়বিড় করে স্কুটার অলাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করি। সারা দেশে কি একটাও খালি স্কুটার নেই!

ছেলেটা চলে যেতেই আমরা একটা রিক্‌শায় উঠে বসি। বাবলি বসে আমার বাঁ পাশে।

রিকশা চলতে শুরু করলে বাবলি বলে, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো?

আমি হেসে বলি, না।

বাবলি একটু চুপ করে থাকে। তখন টয়োটা করোনা থেকে সানগ্লাস পরা এক মোটা মতো ভদ্রলোক বাবলিকে দেখে হাত ওঠায়। রিকশায় বসে বাবলিও। দেখে আমার বুকের ভেতরটা চমকায়। বাবলিকে সবাই চেনে।

আমি বাবলির মুখের দিকে তাকাই। বাবলি মিষ্টি করে হাসে। আমি কখনো ইচ্ছে করে তোমাকে কষ্ট দিইনি। আমি আসলে ভুলে যাই।

আমি কথা বলি না। বাবলি ডান হাত আমার ডান হাতে মৃদু ছুঁয়ে থাকে। আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা স্লাইট একটা জাম্প করে।

রিকশা তখন নিউমার্কেট ছাড়িয়ে পুবমুখো চলছে। মোড় পেরুতেই দুটি যুবক হৈ হৈ করে আমাদের রিকশার সামনে এসে দাঁড়ায়। বাবলি, কি খবর?

বাবলি হাসে, ভালো। তোমরা?

ছেলেগুলো কি বলতে চায়, আমি রিকশাঅলাকে বলি, চালাও।

রিকশা চলতে থাকে। বাবলি রিকশার পেছন দিয়ে তাকিয়ে ছেলে দুটোর উদ্দেশ্যে বলে, পরে দেখা হবে।

আমার বুকের ভেতরটা রাগে দুঃখে জ্বলে যায়। বাবলিকে সবাই চেনে। হায়!

ইউনিভার্সিটির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মাত্র পাঁচ সাত মিনিটে দশ বারোটি ছেলে, কি খবর বাবলি, হ্যালো বাবলি, করলো। কেউ কেউ কথা বলতে না পেরে হাসিমুখে হাত নাড়লো। বাবলিও আমার পাশে রিকশায় বসে ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে গেলো, হাত নেড়ে গেলো। দেখে তো আমি থ। হোয়াট ইজ দিস?

বাবলি আমার ডান হাত ধরে আছে এখন। আমরা কেউ কোনো কথা বলছি না। আমার বুকের ভেতর কোমল একটা দুঃখ ক্রমশঃ হিংস্রতার দিকে যাচ্ছে। আমি বাবলিকে সম্পূর্ণ একা পেতে চাই। অন্তত আজকের দিনটির জন্যে। যেনো বাবলিকে আমি ছাড়া আর কেউ চেনে না আজ, এমন হতে হবে।

কিন্তু বাবলিকে নিয়ে কোথায় যাবো! ঢাকা শহর খুব ছোট জায়গা। যেখানেই যাই বাবলির কেউ না কেউ পরিচিত বেরুবে। রাগে দুঃখে আমার বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়।

বাবলি আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলে, কি হলো তোমার?

আমি ফ্যাকাশে মুখে বাবলির দিকে তাকাই। জোর করে একটু হাসি। তখুনি রাস্তা থেকে একটা ছেলে তীক্ষ্ণ স্বরে শিস দিয়ে ওঠে। বাবলি তার দিকে তাকিয়ে হাসে, হাত নাড়ে। আমার মাথার ভেতর ঝাৎ করে আগুন জ্বলে ওঠে। কি যে হয়ে যায় বুঝতে পারি না। ঘুরে প্রচণ্ড জোরে এক চড় কষি বাবলির গালে। বাবলি কিছু বুঝতে পারে না।

রিকশাঅলা ভয় পেয়ে সরোওয়ার্দী উদ্যানের সাইড ঘেঁষে রিকশাটা দাঁড় করায়।

আমি বাবলির হাত ধরে দ্রুত রিকশা থেকে নামি। পকেট হাতড়ে একটা পাঁচ টাকার নোট রিকশাঅলার দিকে ছুঁড়ে দিই। তারপর শক্ত করে বাবলির হাত ধরে মাঠের ভেতর দিয়ে, কোনো নিরালা ভূমির উদ্দেশ্যে, যেখানে বাবলিকে কেউ চেনে না, ছুটতে থাকি।

শাড়িতে বাবলির পা জড়িয়ে যায়, বাবলি পড়ে যেতে যেতে সামলে ওঠে। গুনগুন করে কাঁদে। আমি কিছুই খেয়াল করি না। ছুটতে থাকি, ছুটতে থাকি। বাবলিকে আমার চাই ই। সম্পূর্ণ একা!

১৯৭৬

মন বলে

সকালবেলা ঘুম ভেঙে তরীর মনে হলো, তরী একদিন ভেসে যাবে। দূরে, বহু দূরে।

তরীর ঘুম ভাঙে বেলা করে। বরাবরই। ঘুম ভাঙার পর প্রতিদিনই কলেজে যেতে তরীর খানিকটা দেরি হয়। কলেজে পৌঁছে প্রতিদিনই তরী দেখে, ফার্স্ট পিরিয়াডের অর্ধেকটা হয়ে গেছে। মফস্বলের কলেজ। স্যাররা সব চেনাশোনা। বাবা এই শহরের নামী লোক। কোর্টের পেশকার। পেশকার সাহেবের মেয়ে। তরীকে কেউ কিছু বলে না। তবুও প্রতিদিন কলেজে পৌঁছে তরী খানিকটা অপরাধ বোধ করে। ভয়ে, লজ্জায় চুপিচুপি ক্লাশে ঢোকে। পেছনের বেঞ্চে গিয়ে বসে। বন্ধুরা সবই জানে, দেরি হলেও তরী ঠিক কলেজে আসবে। স্যাররাও জানেন। এই নিয়ে কখনো কোনো কথা হয় না।

ফার্স্ট পিরিয়াড শেষ হলে তরীর চারপাশে অনেক ছেলেমেয়ে। সবাই তরীর বন্ধু। জ্যোৎস্না মনি লতা ডালিয়া নাসিমা জলি হাবিব সিরাজ সারোয়ার ও অপু।

সবারই এককথা, তরী তুমি আজ কেমন আছো? তরী তুই আজ কেমন আছিস?

তরী বলে, ভালো। তরীর মন বলে, আমি ভালো নেই। ভালো নেই। তরীর বুকের ভেতর কি অসুখ, কেউ জানে না। ডাক্তার কাকাও না। এই শহরের বড়ো ডাক্তার অশ্বিনী কাকা। বাবার ছেলেবেলার বন্ধু। সপ্তাহে দুদিন ডাক্তার কাকা আসেন তরীকে দেখতে। বিকেলবেলা। হাতে পুরোনোকালের কালো ব্যাগ। গলায় স্টেথিসকোপ, মালার মতন দোল খায়। পরনে আদ্দিকালের ঢোলা শাদা প্যান্ট, গায়ে ফুলহাতা শার্ট। পকেটঅলা। এ রকম শার্ট আজকাল কেউ পরে না। তবুও ওসব ছাড়া ডাক্তার কাকাকে মানায় না। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ, মোটাসোটা মানুষ। এখনো কলেজে পড়া ছেলেদের মতন ক্লিনসেভ করেন। মানুষটা বড়ো ভালো। বাড়ি ঢুকেই চেঁচিয়ে ডাকেন, তরী মামণি কই। এসো হাতটা দেখি। তারপর বারান্দার হাতাঅলা চেয়ারটায় বসবেন। তরী এসে নিঃশব্দে দাঁড়াবে ডাক্তার কাকার সামনে। রোগা ডান হাতটা বাড়িয়ে দেবে। মা থাকবে রান্নাঘরে।

বিকেলবেলা ডাক্তার কাকা চা না খেয়ে যান না। তরীর হাত দেখা হলে ডাক্তার কাকা দেখবেন জিভটা। কখনো চোখের কোল। আবার কখনো তরীকে শুতে হয় বিছানায়। স্টেথিসকোপ লাগিয়ে ডাক্তার কাকা তরীর বুক পরীক্ষা করেন। সেই সময়টা বড়ো লজ্জার। তরী খুব অস্বস্তিবোধ করে। তরীর বুক এখনো বাচ্চা মেয়ের মতন। শরীরটা পাখির মতন রোগা। তরীকে দেখে কে মনে করবে তরী কলেজে পড়ে। সতেরো বছর বয়স। এই বয়সে মেয়েদের শরীর আষাঢ়ের ধান চারার মতো ডগমগ। চোখে মুখে ফেটে পড়ে যৌবন। বিয়ে হলে বাচ্চা হয় বছর ঘুরতে। তরীর সে সবের বালাই নেই। তবুও লজ্জাটা হয়। মেয়েমানুষ তো!

এসব শেষ হলে চা খেতে খেতে বাবার সঙ্গে কথা বলেন ডাক্তার কাকা। তরী তখন দোতলার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে বহুদূরের গ্রামসীমার দিকে বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকে। তবুও ডাক্তার কাকার কথা, বাবার কথা কানে আসে তরীর। কোনো অসুখই নেই।

শুনে বাবা রেগে যান। তুমি ধরতে পারছো না, তাই বলো। এই বয়সের মেয়ে অতো রোগা থাকবে কেন, অতো বিষণ্ণ থাকবে কেন? আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তিরিশ বছর ধরে ডাক্তারী করি, এমন কখনো দেখিনি। জন্মের পর থেকে মেয়েটা আমার ওষুধ খায়। রেগুলার। খাওয়া দাওয়া ভালো। তবুও ওর শরীরে কিছু নেই কেন! ভেতরটা ফাঁকা কেন!

বাবা বলেন, ভালো কিছু ওষুধ দাও। আমার একটাই মেয়ে। তুমি ওকে সারিয়ে তোলো। টাকা পয়সার চিন্তা করো না।

ডাক্তার কাকা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। শুনে তরীর মন বলে, তরী একদিন ভেসে যাবে। দূরে, বহু দূরে।

এই কথা তরীর মনে হয় যখন তখন। আজ মনে হলো সকালবেলা। ঘুম ভেঙে। তরীর কখনো এমন হয় না। আজ ঘুম ভাঙার পর তরী দেখে দোতালার জানালায় কি সুন্দর রোদ। জানালার সঙ্গে যে বিশাল কদম গাছ, তার সবুজ পাতায় অবোধ শিশুর মতন খেলছে হাওয়া। একটা পাখি ডাকছে থেকে থেকে। তরী কখনো এসব খেয়াল করে না। ঘুম ভাঙার পর প্রতিদিনই মনে হয়, আর একটা দিন শুরু হলো! কি বাজে! আজ মনে হলো, আ কি সুন্দর দিন। জানালার শিক ধরে তরী বাইরে তাকিয়ে থাকে। দেখে চারদিকের পৃথিবী কি সুন্দর! তরীর কখনো যা হয় না, আজ তাই হলো। অকারণে মনটা খুব ভালো হয়ে যায়। তখুনি তরীর মন বললো, তরী তুমি আজ খানিকটা ভেসে দেখো।

মা এখন রান্নাঘরে। বাবার নাস্তা তৈরি করছে। বাবা আছে কুয়োতলায়।

বালতি বালতি জল তুলে গোসল করছে। তারপর নাস্তা খেয়ে পাজামা আর ফুলহাতা শার্ট পরে যাবে কোর্টে। বাবার বুক পকেটটা সব সময় উঁচু। কাগজের পাহাড় বুক পকেটে পুরে রাখে বাবা। আর একটা খয়েরি রঙের ফাউন্টেনপেন। বাচ্চা ছেলের হাতের মতন মোটা। প্রেসিডেন্ট কলম। মোটা থ্যাবড়া লেখা হয়। একদিন কালি ভরলে পনেরো দিন যায়। এসব কলম আজকাল কেউ ব্যবহার করে না। বাবা পুরোনোকালের মানুষ। বাবার সবকিছুই পুরোনো। তবুও বাবাকে বড়ো ভালো লাগে তরীর।

বাবার কথা ভাবতে ভাবতে তরী রেলিংয়ে যায়। সেখানে সবসময় এক বালতি জল তোলা। তরীর এখন নিচে যেতে ভাল্লাগছে না। কুয়োতলায় গিয়ে জল তোলো তারপর মুখ ধোও। তরী আজ ওসব করতে পারবে না। রেলিংয়ে গিয়ে বালতির জলে শিশুর মতন জল ছিটিয়ে মুখ ধোয় তরী। তারপর কামিজের খুটে মুখ মোছে। তরী এখনো ওড়না পরে না। দরকার হয় না।

তরী তারপর ঘরের ভেতর যায়। মন বলে, তরী তুমি আজ খুব সুন্দর করে সাজো।

তরীর একটাও শাড়ি নেই। তরী ভাবে, মার সুটকেস থেকে সেই নীল শাড়িটা, তরীর খুব পছন্দ, বের করে পরবে। মার ব্লাউজ ছায়া সব পরবে।

কিন্তু মার ব্লাউজ ছায়া কিছুতেই তরীর গায়ে লাগে না। ব্লাউজ ঢলঢল করে, ছায়াটা পায়ের অনেক নিচ পর্যন্ত ঝুলে থাকে। দেখে তরীর একটু মন খারাপ হয়। তবুও তরী আজ শাড়ি পরবে।

তখন তরীর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে। নিজের ধোয়া সালোয়ার কামিজই পরে তরী। তার ওপর জড়িয়ে নেয় মার শাড়িটা। তারপর আয়নায় নিজেকে দেখে। একদম বোঝা যাচ্ছে না তো! সালোয়ারটা হয়ে গেছে ছায়া, কামিজটা ব্লাউজ। দেখে তরী খুব খুশি। কেউ বুঝবে না তরী আসলে ছায়া ব্লাউজ পরেনি। পরেছে সালোয়ার কামিজ। তরী তখন আয়নায় নিজের মুখটা দেখে। তরীর মুখটা সবসময়ই বিষণ্ণ। চোখের কোলে গাঢ় হয়ে জমে থাকে কালি। জন্মের পর এক মুহূর্তও সঠিক ঘুম ঘুমোয়নি তরী। মনে বলে, তরী তুমি একদিন সুন্দর ঘুমুবে।

তরীর মুখে সবসময় ধুলোবালির মতন জমে থাকে খড়ি। শীতকাল গরমকাল নেই। কিন্তু তরীর দাঁতগুলো খুব সুন্দর। তরীর হাসিতে একসঙ্গে ঝরে আনন্দ এবং বিষাদ।

কৌটো থেকে তিব্বত স্নো বের করে মুখে লাগায় তরী। চোখে সরু করে কাজল টানে। মাথাটা সুন্দর করে আঁচড়িয়ে লম্বা একটা বেণী

করে। তারপর বেণীর ডগায় রাবারব্যাণ্ড জড়িয়ে আস্তে ধীরে নিচে নেমে যায়।
বাবা তখন জামা কাপড় পরে নাস্তা খাচ্ছে। মা দাঁড়িয়ে আছে তার পিঠের কাছে। হাতে তাল পাখাটা আছেই। আস্তে ধীরে নাড়ছে। শীতকাল গরমকাল নেই বাবাকে খেতে দিয়ে মা ঠিক পিঠের সামনে দাঁড়াবেই। হাতে পাখাটা থাকবেই। অভ্যেস। দেখে তরীর কেন যে আজ ভালো লাগে। আমার যদি বিয়ে হয়, আমার যদি একটা বর হয় তাহলে আমিও কি মার মতো! কথাটা ভেবে ভেতরে ভেতরে লজ্জায় লাল হয়ে যায় তরী। মাগো, কি লজ্জা!
তরীকে প্রথম দেখে মা। দেখে অবাক হয়ে যায়। তারপর দেখে বাবা। দেখে খাওয়া ভুলে তাকিয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ করে চেঁচিয়ে ওঠে, আরে বা, মা মণিকে কি সুন্দর লাগছে!
তরী লজ্জায় মুখ নিচু করে। মৃদু হাসে।
মা বলে, দেখো তো মেয়ে আমার কি সুন্দর শাড়ি পরতে শিখেছে। তুমি ওকে শাড়ি কিনে দাও না কেন?
খাওয়া শেষ করে বাবা লাফিয়ে ওঠে। দাঁড়াও, মামণিকে এ মাসে চারটে শাড়ি কিনে দেবো। তারপর তরীর মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে দেয়। ঠিকঠাক মতো ওষুধটা খেয়ো মা।
এই একটা বাজে ব্যাপার। এখুনি খেতে হবে ডিম সেদ্ধ, দুধ কলা আরো কতো কি। তারপর পাঁচ পদের ওষুধ। এতো খাবার, এতো ওষুধ মানুষ খেতে পারে! প্রতিদিনই খেতে বসে তরী খানিকটা কাঁইকুঁই করে। তারপর বিকৃতমুখে নাস্তা খায়, ওষুধ খায়। তার পর দে ছুট, কলেজ। এখন তো আর কলেজ নেই। এক মাস বন্ধ। তবুও সেই একই নিয়ম।
তরী বললো, দশটা টাকা দেবে বাবা?
মাত্র দশ টাকা! বাবা পকেট হাতড়ে একটা দশ টাকার নোট বের করে। তারপর তরীর হাতে গুঁজে দিয়ে বেরিয়ে যায়। বাবার কোর্টের সময় হলো।
বাবা বেরিয়ে যেতেই মা তরীর নাস্তা সাজিয়ে দেয়। খেয়ে নাও।
তরী আজ কোনো কথা না বলে নাস্তা খায়, ওষুধ খায়। মা তখন টেনেটুনে তরীর শাড়ি ঠিক করে দিচ্ছে। কোথায়ও যাবি?
কলেজ বন্ধ। বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না।
রোদে ঘোরাঘুরি করিস না।
শুনে তরী একটু বিরক্ত হয়। ইস সবসময় খালি এসব কথা। অমুকটা করিস না, তমুকটা করিস না। মানুষ এতো নিয়ম মানতে পারে! তখন বাড়ির সামনের খোলা মাঠ ভেঙে টুংটাং শব্দে এগিয়ে আসছিলো

একটা সাইকেল। দূর থেকে শব্দটা পায় তরী। তরী কি আসলে এই শব্দটার জন্য অপেক্ষা করছিলো! ভেতরে ভেতরে এ জন্যেই খানিকটা উতলা হয়েছিলো! কে জানে, তরী এসব বুঝতে পারে না।

আনমনে গেটের কাছে ছুটে যায় তরী! ছোট্র টিনের গেট খুলে দেখে সবুজ ঘাসের মাঠে ঝিমঝিম করছে ভোরবেলার রোদ। সেই রোদ ভেঙে সাইকেল চালিয়ে আসছে অপু। পরনে খয়েরি রঙের প্যান্ট, গায়ে হাফ হাতা শার্ট। অপুটা দেখতে খুব সুন্দর। ছোটখাটো। মাথায় ঘন চুল, সবসময় পরিপাটি করে আঁচড়ানো। এসব দেখে কলেজের আদু ভাইগুলো অপুকে বলে, গোলআলু। গোলআলু কেন বলে?

কথাটা একদিন লতাকে জিজ্ঞেস করেছিলো। লতাটা অনেক কিছু জানে। বললো, ওটা অসভ্য ইঙ্গিত। তরী কিছু বুঝতে না পেরে বললো, ছেলেতে ছেলেতে আবার অসভ্য ইঙ্গিত কি?

শুনে সবাই হেসে উঠেছিলো। তুই ওসব বুঝবি না।

তরীকে গেটের কাছে দেখে অপু খুব অবাক। তার ওপর গত এক বছরে যা দেখেনি, আজ তাই। তরী শাড়ি পরেছে। দেখে সাইকেল থেকে নামে না অপু। তরীর সামনে এসে দুপা মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। তারপর তরীর দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে তরী কি বোঝে কে জানে, ঠোঁট টিপে হাসে। কি দেখছিস?

তোকে আজ খুব সন্দর লাগছে।

শুনে তরীর হঠাৎ করে খুব লজ্জা হয়। অপু ওর বন্ধু। কলেজে একসঙ্গে পড়ে। ফার্স্ট ইয়ারে। অপু থাকে কলেজের হোস্টেলে। বাড়ি মুন্সিগঞ্জ থেকে দশ মাইল। আড়িয়ল। বালিগাঁর ওদিকে। কলেজ ছুটি হলে অপু বাড়ি চলে যায়। এবার যায়নি। কলেজ নেই, বাড়িও যায়নি। অপু রোজ সকালবেলা তরীর সঙ্গে দেখা করতে আসে। অপুটা খুব ভালো ছেলে। কেউ কিছু মনে করে না। তাছাড়া তরী যে মেয়েমানুষ, কলেজে পড়ে, এই কথাটাই কারো মনে থাকে না। তরী রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে কেউ তাকিয়ে দেখে না। রাস্তার মোড়ে আড্ডা দেয়া ছেলেগুলো, কলেজের বখাটেগুলো, কেউ না। এজন্যে তরীর কোনো দুঃখ নেই। অথচ এই শহরেরই আরেক নাম প্রেমনগর। শহরের স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েগুলোও না কি প্রেম করে। গোপনে প্রেমপত্র চালাচালি করে। কতো কেলেঙ্কারির খবর পাওয়া যায়। কিন্তু তরীকে আজ পর্যন্ত কেউ তাকিয়েও দেখলো না। সতেরো বছর বয়স হলো। আজ প্রথম অপুটা কেমন করে তাকালো। ইস কি লজ্জা। বুকের ভেতর কেমন করে! তরী খানিকক্ষণ কথা বলতে পারে না।

অপু বললো, কোথাও যাবি?

কোথায় যাবো?
তাইতো জিজ্ঞেস করছি। ভারি তো সেজেছিস!
এমনিতেই। শাড়ি পরে দেখলাম কেমন লাগে। কেমন লাগছে রে?
পেত্নীর মতন।
দেখ রাগাবি না। তাহলে মাকে ডাকবো।
ডেকে দেখ না! তোর মা আসার আগেই আমি সাইকেল নিয়ে ভোঁ। একদম বাড়ি চলে যাবো।
তুই এবার বাড়ি গেলি না? একমাস বন্ধ!
যেতে ইচ্ছে করছে না।
কেন?
চলে গেলেই তো রোজ আর তোর সঙ্গে দেখা হবে না! তোকে যে ভারি দেখতে ইচ্ছে করে।
ইস। আহ্লাদ!
সত্যি কি তুই কোথাও যাচ্ছিস?
না! তুই আমাকে কোথাও নিয়ে যাবি?
আমার কাছে পয়সা নেই।
আমার কাছে আছে।
কতো?
দশ টাকা।
অতো কম টাকায় হবে না।
হবে না কেন? আমরা তো হেঁটে যাবো!
অপু এবার সিরিয়াস মুখ করে বললো, কোথায় যাবি?
শুনে তরী খুব রেগে যায়। তুই আমার সঙ্গে যাবি কিনা, নয়তো আমি একাই যাবো!
তারপর গেট থেকেই চেঁচিয়ে মাকে ডাকে। মা, আমি যাচ্ছি।
বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা বললো, তাড়াতাড়ি ফিরিস।
তরী তারপর আর কোনো কথা বলে না। হাঁটতে শুরু করে। মুখ ভার, অপুর দিকে তাকায়ও না। অপু খানিকক্ষণ সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর তরীর পেছন পেছন ধীরপায়ে সাইকেল চালায়।
আচ্ছা, ঠিক আছে চল।
তবুও তরী কথা বলে না। অপু আবার বলে, যাচ্ছি তো!
তরী কথা বলে না। অপু এবার সা করে সাইকেল নিয়ে তরীর একেবারে পায়ের কাছে। তরী লাফিয়ে ওঠে। তারপর রেগে যায়।
ভালো হচ্ছে না কিন্তু!
আমার কথা কানে যায় না?
না।

চল কোথায় যাবি।

না যাবো না।

অপু নরম গলায় বললো, রাগ করিস কেন?

আমার সঙ্গে তো তোর যেতে লজ্জা করবে! আমি দেখতে বাজে। তুই অতো সুন্দর।

দেখ বাজে কথা বলবি না। তাহলে আমি তোর সঙ্গে আর কথাই বলবো না।

তারপর কেউ কোনো কথা বলে না। অপু সাইকেলের হ্যাণ্ডেল এক-হাতে ধরে তরীর পাশাপাশি হাঁটে। হাঁটতে হাঁটতে কলেজের সামনে চলে আসে।

কলেজের মাঝ মধ্যিখানে খোলা মাঠ। ফুটবল খেলার। দুটো কাঠের বারপোস্ট সকালবেলার রোদে একা দাঁড়িয়ে। তারপর বাঁধানো পুকুর। পুকুরের ওপাশে পুরোনোকালের তিনতলা বিল্ডিং। হোস্টেল।

অপু বললো, তুই একটু দাঁড়া। আমি সাইকেলটা রেখে আসি।

তরী কোনো কথা বলে না। অপু সাইকেল চালিয়ে হোস্টেলের দিকে চলে যায়।

খানিকপর হোস্টেলের পেছন দিয়ে বেরিয়ে আসে অপু। তরী আনমনা ছিলো। অপু যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, খেয়ালই করেনি। অপু দেখেছে তরী আনমনা। পা টিপে টিপে তরীর পেছনে এসে দুহাতের চার আঙুল মুখে পুরে তীব্র শিস দেয়। শুনে তরী ভীষণ চমকে ওঠে। বুকে হাত দিয়ে অপুর দিকে তাকায়। তাকিয়ে শিসের কথা ভুলে যায়। অপু জামা কাপড় পাল্টে এসেছে। এখন পরেছে টেটরনের প্যান্ট। তীব্র শাদা রঙ। পায়ের দিকে একহাত চওড়া। বেলবটম। আর কি লম্বা! মাটি ছুঁয়ে ধুলোবালির সঙ্গে কথা বলে। পায়ে আড়াই ইঞ্চি হিলের জুতো, তবুও। আজকাল এই ফ্যাশান শুরু হয়েছে।

তরী তারপর আস্তে ধীরে চোখ দুটো ওপরের দিকে তোলে। অপুটা এই প্রথম ইন করে শার্ট পরেছে। নীল রঙের ফুলহাতা। হাতা আবার অল্প গুটিয়েছে। মুখে স্নোও মেখেছে। অপু এখনো সেভ করে না। মুখে দাড়ি গোঁফের কালচে রেখা। মুখটা ধবধবে শাদা বলে কালচে ভাবটা সুন্দর লাগে। আর চুল তো আছেই। লম্বা, পরিপাটি করে আঁচড়ানো। অপু কখনো এতো সাজগোজ করে না। তবুও সবকিছু বাদ দিয়ে তরী খেয়াল করে অন্য একটা ব্যাপার। অপুর বুক পকেটে ক্যাপস্টান সিগারেটের প্যাকেট। দেখে তরী বললো, তুই সিগারেট খাস?

আজ খাবো।

কেন?
এমনিতেই। ইচ্ছে করছে। জানিস, হোস্টেলের দোকানটায় গিয়ে সিগারেট চাইতেই লোকটা অবাক হয়ে বললো, সিগ্রেট কার লেইগা? বললাম, আমিই খাবো। শুনে ও শালাও খুব অবাক।
এই খবরদার গাল দিবি না।
সরি।
তারপর দুজনেই একটু চুপচাপ। অপু বললো, কোথায় যাবি চল।
তুইই বল না। আমি কি কিছু চিনি!
সিনেমা দেখবি?
না। হেঁটে হেঁটে অনেকদূর চলে যাবো। আমি কখনো পায়ে হেঁটে দূরে কোথাও যাইনি।
ইস আজ কি রোদ। এই রোদে হাঁটলে তোর শরীর তো খারাপ করবে!
কিছু হবে না।
তোর মা বাবা শুনলে আমাকে আর তোদের বাড়িই যেতে দেবে না।
আমি কাউকে বললে তো!
কিন্তু সত্যি রোদটা খুব বাজে।
তখন তরীর মন বলে, আজ দুপুরে বৃষ্টি হবে। কেন যে বলে!
তরী বললো, দেখিস দুপুরবেলা খুব বৃষ্টি হবে।
তাহলে তো আরো বাজে।
তুই ভয় পাচ্ছিস?
এই কথা শুনে অপু হঠাৎ করে পুরুষ মানুষ হয়ে গেলো।
কিসের ভয়, চল।
ওরা দুজন হাঁটতে শুরু করে।
কলেজের সামনের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে ওরা ব্রিজটার কাছে চলে আসে। এখানে কয়েকটা মুদি মনোহারী দোকান। একটা চায়ের দোকান। চায়ের দোকানটায় সারাদিন আড্ডা দেয় কয়েকটা ছেলে। চা খায়, সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ায় আর গালাগাল করে। সবারই একটা করে সাইকেল আছে। কলেজে পড়ে দুএকজন, কেউ কেউ এখানো স্কুল পেরোয়নি। দুএকজন আছে স্কুল ছেড়েছে অনেকদিন। বাপের হোটেলে খায়, চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয় আর চক্রা বক্রা জামা পরে সাইকেল নিয়ে মেয়েদের স্কুলের সামনে চক্কর খায়। ছেলে-গুলোকে দেখলেই তরীর গা জ্বলে। যদিও তরীর দিকে কেউ কখনো তাকায় না। কিন্তু তরী এখান দিয়ে হেঁটে গেলে আড়চোখে একবার না একবার দোকানটার দিকে তাকাবে। এই যেমন এখন। কিন্তু দোকানটা এখন একদম ফাঁকা। কেউ নেই।
তরী একটু অবাক হয়। কিন্তু অপুকে বুঝতে দেয় না কিছু।

এই রাস্তাটাই শহর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে গেছে পশ্চিমে। শহরের পর কাঁচামাটির সড়ক। তারপর আবদুল্লাপুর বালিগাঁও আড়িয়ল, কতোগ্রাম। লোকবসতি। তরী অতোসব চেনে না। অপুর কাছে শুনেছে। আজ যতোদূর ইচ্ছে চলে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে।

শহরের কাছাকাছি আসতেই দেখে পাঁচ ছটা সাইকেল আস্তে ধীরে কলেজের দিকে যাচ্ছে। সেই ছেলেগুলো। চক্রাবক্রা শার্ট আর বেলবটম প্যান্ট পরা। চুলের কি বাহার একেকজনের। জুলপি গালের নিচ পর্যন্ত নামানো।

দেখে তরীর গাটা জ্বলে। অপুর হাত টেনে রাস্তার ধারে দাঁড়ায়। ওরা বোধহয় খেয়াল করে। চলে যেতে যেতে দলের ভেতর থেকে কে একজন শিস দিয়ে ওঠে। শুনে অপু বললো, শালারা বদমাশের হাড্ডি। অপুর মুখে গাল শুনে তরীর খুব রাগ হয়। ছেলেগুলোর কথা ভুলে বললো, তোকে না বলেছি গাল দিবি না।

অপু হেসে বললো, রাগলে আমার খুব গাল দিতে ইচ্ছে করে।

আমার সঙ্গে থাকলে কক্ষণো দিবি না। অপু কথা বলে না। পকেট থেকে সিগারেট বের করে কায়দা করে ঠোঁটে গোঁজে। তরী আড়-চোখে দেখে প্যান্টের পকেট থেকে ম্যাচ বের করেছে অপু। তারপর ফস করে কি সুন্দর সিগারেট ধরায়। এই মুহূর্তে অপুকে পুরুষ পুরুষ লাগে। সিগারেট না খেলে পুরুষ মানুষদের চেনাই যায় না আজকাল। কাপড় চোপড় আর লম্বা চুলে মেয়েদের মতো দেখায়। কবে যে সব শাড়ি পরে বেরুবে!

সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে অপু বললো, রিকশা নেবো?

কেন?

কতোদূর যাবি?

যতোদূর ইচ্ছে।

সত্যি কি হেঁটে যাবি?

আমি তোর সঙ্গে কখনো মিথ্যে বলেছি!

কিন্তু হাঁটতে তো তোর কষ্ট হবে!

কিচ্ছু হবে না।

তাহলে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে দুপরের দিকে ফিরে যাবো।

না।

তাহলে কি করবি?

যতোদূর ইচ্ছে চলে যবো।

শুনে অপু হেসে ফেলে। পাগলামী করিস না।

সত্যি বলছি। বড়ো সড়ক ধরে দূরে কোথাও চলে যাবো। সারাদিন হাঁটবো।

সত্যি?
তো কি!
চল যাই। আমি কখনো কোনো মেয়ের সঙ্গে সারাদিন বেড়াইনি।
আমি যেনো ছেলেদের সঙ্গে খুব বেড়িয়েছি।
তোর মা বাবা শুনলে?
কচু হবে।

এইভাবে ওরা একসময় সত্যি সত্যি শহর থেকে বেরিয়ে গেলো। শহরের পরই বড়ো সড়ক। উঁচু, চওড়া। শাদা ধুলোবালি মেখে কোথায়, কতোদূরে যে চলে গেছে! দুপাশে উদাস শস্যের মাঠ, দূরে গ্রাম, গাছপালা। রোদে শাদামাটি চকচক করে। আর কতো যে লোক সড়কে। আসছে যাচ্ছে। লোকেরা যে সব কোথায় কোথায় যায়!
খানিক হেঁটেই একটা গ্রামের বাঁক। দুপাশে মানুষের ঘরবাড়ি, তার মাঝমধ্যিখান দিয়ে চলে গেছে সড়ক। তরী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ঘরগেরস্থি করছে মানুষেরা। একপাশে অল্পজলের একটা খাল। তার জলে নেমে হল্লাচিল্লা করছে বাচ্চা ছেলেমেয়েরা। একটা দামড়া গোরু টেনে হিঁচড়ে জলে নামাচ্ছে একবুড়ো। কিন্তু তরীর চোখে লাগে একটা নতুনবউ। লাল শাড়ি পরা, বুক পর্যন্ত ঘোমটা টানা। জড়ো-সড়ো হয়ে জলে নামছে। গোসল করবে। কদিন আগে বিয়ে হয়েছে বোঝা যায়। এই সময় মেয়েরা কি খুব লাজুক হয়ে যায়! প্রথম রাতে কেমন করে বরের সঙ্গে কথা বলে? চেনা নেই শোনা নেই হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে রাতেরবেলা একা ঘরে। মাগো! তবুও ব্যাপারটা তরীর কেমন ভালো লাগে। বউটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন একটা আবেশ চলে আসে চোখে। আমারও কি এমন করে বিয়ে হবে একদিন! একটা অচেনা লোক আমার বর হবে! কিন্তু
অপু বললো, কি দেখছিস?
বউ।
সঙ্গে সঙ্গে অপুও তাকায়। দেখে তরী খুব রেগে যায়। এই তুই মেয়েমানুষের গোসল করা দেখছিস কেন?
অপু হেসে ফেলে। তুই যে দেখছিস?
আমি তো মেয়ে।

অপু তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কেন যে! তরী বললো, কি হলো?
তোরও তো একদিন বিয়ে হবে। তোর শ্বশুরবাড়ি যদি পুকুর না থাকে, কুয়ো না থাকে, চাপকল না থাকে, বাড়ির পাশে যদি থাকে নদী কিংবা খাল তাহলে তো তোকেও এই বউটার মতো ঘোমটা দিয়ে জলে নামতে হবে।

শুনে তরী খিলখিল করে হেসে ওঠে। তখুনি মন বলে, তরী একদিন ভেসে যাবে। দূরে, বহুদূরে।

চারদিকের পৃথিবীতে তখন রোদ নামছে বৃষ্টির মতো। রোদে ঝিম ধরে গেছে চরাচর। কোথাও কোনো শব্দ নেই। রবীন্দ্রনাথের ছবির মতো গম্ভীর প্রকৃতি। ইস কি রোদ আজ! এটা কি মাস? ইংরেজী মে। বাংলা মাসের নাম মনে থাকে না তরীর। এ সময় খুব রোদ থাকে। বৃষ্টিও হয় মাঝে মাঝে। বর্ষা আসতে দেরি নেই। হঠাৎ বৃষ্টি বর্ষার কথা মনে করিয়ে দিতে আসে। আজ বৃষ্টি হবে। হবেই। কখন? তরীর মন বলেছে, দুপুরের পর।

সামনে আর কোনো বাড়িঘর নেই। দুপাশে শস্যের মাঠ, স্বচ্ছ জলের খাল। জলে আর শস্যের মাঠে শিমুল তুলোর মতো হাওয়া। সেই হাওয়ায় রোদ ভেসে যায়। রোদ কোনদিকে যায়? দূরে গঞ্জের বাঁক, আবদুল্লাপুর সেদিকে।

হাঁটতে হাঁটতে অপু আবার সিগারেট ধরায়। তারপর তরীর দিকে তাকায়। তরীর মুখ রোদে পুড়ে আস্তে ধীরে পাল্টাচ্ছে। নাকের তলায় ঘামের চিকন রেখা। দেখে অপু বললো, আবদুল্লাপুর থেকে ফিরে আসবো।

কেন?

তুই খুব বেশি হাঁটতে পারবি না।

কে বলেছে?

এখনই তোকে কেমন দেখাচ্ছে।

ঠিক হয়ে যাবে। হাঁটলে মানুষ টায়ার্ড হয় না! ওসব কিছু না। আমি যাবো, যতোদূর ইচ্ছে।

পাগল হলি না কি?

তোর ভাল্লাগছে না?

আমার হাঁটার অভ্যেস আছে।

তাহলে আর কোনো কথা বলবি না।

শুনে অপু হেসে ফেলে।

কি যে পাগলামী হচ্ছে আজ। ফেরার সময় রিকশা নেবো।

আর যদি না ফিরি!

যাবি কোথায়?

কোথাও চলে যাবো।

আমি কোথাও যেতে পারবো না।

তোর যেতে হবে না। আমি একাই যাবো।

তাহলে এখুনি যা। আমি রিকশা নিয়ে ফিরে যাই।

না, এখন না।

এইভাবে দুপুর। দুপুরবেলা আবদুল্লাপুর। গঞ্জের বাজার। আবদুল্লা-পুর এসেই অপু বললো, আমার খুব খিদে পেয়েছে।
আমারও।
চল বাজারে গিয়ে মিষ্টি খাই।
না, আমি বাজারের ভেতর যাবো না। বেশি লোকজন আমার ভাল্লাগে না।
তাহলে তুই এখানে দাঁড়া, আমি কিনে নিয়ে আসি।
তরীর মন বলে, তুমি একদিন ভেসে যাবে। দূরে, বহুদূরে। একা। তরী কেমন একটু শিউরে ওঠে। না আমি একা দাঁড়াতে পারবো না। এখানে একা দাঁড়ালে কি হবে! এখানে তো কেউ নেই!
তবুও।
তরী তারপর বাজারে ঢোকার মুখের দোকানটা দেখিয়ে বলে, ওখান থেকে কিছু কিনে আন।
ওখানে কি পাবো?
যা পাওয়া যায়। বিসকিট ফিসকিট।
তোর যে কতো রকমের তাল। অপু বিরক্ত হয়ে দোকানে যায়। তার-পর চারটে সাগরকলা হাতে ঝুলিয়ে ফেরে।
এখানে আর কিছু নেই।
কলাতেই চলবে।
তাতো চলবেই।
তুই না বললি পয়সা নেই। কলা কিনলি কি দিয়ে?
অপু কলা খেতে খেতে বললো, পুরুষমানুষের পকেটে সবসময় পয়সা থাকে।
ইস কি আমার পুরুষমানুষ রে!
রোদের ঝিমমারা শব্দটা তখন আরো বেড়েছে।' বাজারের কোলাহল ছাপিয়ে ঝিমমারা শব্দটা পাওয়া যায়। গরম ভাবটা আছেই। দুজনেই ভেতরে ভেতরে ঘামছিলো। তবুও তরী কিছু বলে না, অপু কিছু বলে না! আবার হাঁটতে থাকে।
হাঁটতে হাঁটতে একটা সরুখাল! তার ওপর বাঁশের সাঁকো। সাঁকো দেখে তরী বললো, আমি সাঁকো পেরুবো কেমন করে?
মন বললো, সব সাঁকো একা পেরোতে হবে তরী। একা।
তরী আবার একটু শিউরে ওঠে।
অপু বললো, পেরোনোর দরকার নেই। চল ফিরে যাই।
না।
তাহলে আমার হাত ধর।
তরী অবলীলায় অপুর হাত ধরে। ধরে টের পায় পুরুষমানুষের

হাত ধরায় কেমন একটা নিশ্চিতভাব আছে। কে জানে কার উদ্দেশ্যে তরী মনে মনে বললো, এই তো অপু আছে। আমি কি একা!

খালের ওপারে আবার সড়ক। দুপাশে আগের মতো শস্যের মাঠ। বহুদূর অব্দি। তারপর গ্রাম। গাছপালার সবুজতা। সেদিকে তাকিয়ে তরীর মন বলে, ওখানে গেলেই বৃষ্টি নামবে।

কথাটা অপুকে বলে না। হাঁটতে থাকে।

চারদিকের পৃথিবী খুব নিথর হয়েছিলো সেই সময়। মাথার ওপর আকাশ ছিলো খোলামেলা। হাওয়া ছিলো ঝির ঝির। আর ছিলো পাতলা মেঘের একটা ছায়া। রোদের তলায় এসে দাঁড়িয়ে যায় কখনো কখনো। তার ছায়া এসে পড়ে পৃথিবীতে, শস্যের মাঠে। কোথাও কোনো লোক ছিলো না। কেবল ওরা দুজন। দূর থেকে ওদের দেখায় পাখির মতো ছোট্ট, সুন্দর।

তরীকে এখন খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। রোদে হেঁটে হেঁটে মুখটা পুড়ে গেছে। ঘাম শুকিয়ে বিষণ্ণ একটা ভাব চেহারায়। অপু দেখে বিষণ্ণতাই তরীকে সুন্দর করে। দেখে অপুর বুকের ভেতরটা একটুখানি দুলে ওঠে। তবুও অপু কোনো কথা বলে না।

বিকেলের মুখে মুখে ওরা এসে পেঁছুলো সেই গ্রামে। গ্রামের ভেতর দিয়ে চলে গেছে সড়ক। দুপাশে মানুষের ঘরবাড়ি। হলে হবে কি, গ্রামটা বড়ো নীরব। অনেকক্ষণ হেঁটেও কোনো লোকজন দেখা যায় না। অপু বললো, চল কোথাও বসি।

তখন রোদ মুছে গিয়ে কখন যে পাতলা মেঘ জমে গেছে আকাশে, ওরা কেউ খেয়াল করেনি। হঠাৎ ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়। বৃষ্টির ফোঁটা গায়ে পড়তেই তরী খুশিতে নেচে ওঠে। আমি আগেই বলেছি, আজ বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি দেখে অপুর খুব মন খারাপ হয়ে যায়। সারা-দিনে এই প্রথম অপু একটু চিন্তিত হয়। মাইলখানেক দূরেই ওদের গ্রাম। বিকেল হয়ে গেছে। তার ওপর নামলো বৃষ্টি। একটা মেয়ে নিয়ে অপু এখন কোথায় যায়! বাড়ি চলে যাবে? বাড়ি গেলে সবাই খুব অবাক হবে। তরীকে নিয়ে কতো রকমের কথা উঠবে। আজ যাবে না ফেরা। তরী কাউকে বলেও আসেনি। বিরাট গণ্ডগোল হয়ে যাবে। মুন্সিগঞ্জ আর ফেরাই যাবে না। ইস খেলার ছলে কি যে করলাম! আর বৃষ্টি যদি না থামে! তাহলে?

অপু আর কিছু ভাবতে পারে না। বৃষ্টি ওদের দুজনকে ভিজিয়ে দিচ্ছিলো, অপু অনেকক্ষণ বুঝতেই পারে না। যখন খেয়াল হয়, চমকে ওঠে। তারপর তরীকে বলে, চল দৌড়োই।

তরী হাসে। তারপর অপুর পেছন পেছন দৌড়োয়। সামনে কোনো বাড়িঘর নেই। কেবল একটা ছাড়া মতো বাড়ি। সবুজ ঘাসে ঢাকা

উঁচু জমির ওপর বহুকালের পুরোনো একটা মন্দির। গা ফুঁড়ে বেরিয়েছে অশথ্বের চারা।
অপু কোনোদিকে না তাকিয়ে সেই মন্দিরে গিয়ে ওঠে। তরীও যায় পিছু পিছু। বৃষ্টি তখন ঝেপে নেমেছে। কিন্তু মন্দিরটা এতো পুরোনো, এতো ভাঙাচোরা ভেতরে কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। অপু তবুও বৃষ্টির ছাঁট বাঁচিয়ে মন্দিরের ভেতরে দাঁড়ায়। পায়ের তলার মাটি অসমতল, ভেজা। পা পিছলে পিছলে যায়। মন্দিরের গা ফুঁড়ে যে অশথ্বের চারা বেরিয়েছে, যার অসংখ্য শেকড় বাকড় ঝুলছে মন্দিরের ভেতর, একহাতে শক্ত করে তার একটা আঁকড়ে ধরে অপু।
তরী তখন বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজছে। সারা শরীর ভিজে চুপসে গেছে। তবুও তরীকে খুব সুন্দর দেখায়।
অপু বললো, এখানে আয়।
দাঁড়াবো কোথায়?
আয় না, জায়গা হয়ে যাবে।
তরী খুব কষ্টে কষ্টে উঠে আসে।
ভেতরে সত্যি কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই। তাছাড়া ভেজা মাটিতে তরীর পা পিছলে যায় বার বার। অপু হাত বাড়িয়ে তরীর একটা হাত ধরে। তারপর গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ায়। তরীর পায়ে ছিলো পাতলা স্যাণ্ডেল। ভেজা মাটিতে বারবার পিছলে যায়। তরী দুহাতে অপুর বুকের কাছে শার্ট চেপে ধরে। অপু এক হাতে অশথ্বের শেকড় ধরে আছে। তরী ধরে আছে অপুর জামা। এক হাতে দুজনের ভার অপু কেমন করে রাখে!
অপু তারপর একহাতে তরীর পিঠের দিকটা জড়িয়ে রাখে। তরী ধরে রাখে অপুর শার্ট। তরী কখনো কোনো পুরুষমানুষের কাছাকাছি হয়নি। টের পায় অপুর শরীরে পাতলা একটা উত্তাপ। অপুর বুকের ভেতর ধুকপুক শব্দ। এসবের ভেতর কোথায় যে লুকিয়ে আছে নারীজাতির অসীম সুখ! তরীর বারাবার ইচ্ছে করে অপুর বুকে মুখ চেপে রাখতে।
তরী তাই করে। আহা এভাবে যদি চিরকাল থাকা যেতো!
তখুনি তরীর মন বলে, তরী একদিন ভেসে যাবে। দূরে, বহুদূরে।
তরী বললো, তোর মুখে সিগারেটের গন্ধ। কি বিচ্ছিরি!
অপু কথা বলে না। অপু ভাবছিলো অন্য কথা। বৃষ্টি যদি না থামে, তাহলে! ঝোঁকের মাথায় কি যে করলাম!
তখনো বেলা ছিলো। বৃষ্টির জন্যে মনে হয় সন্ধ্যা। চারদিকে আবছা মতো অন্ধকার জমে গেছে। আর সারাদিন খুব রোদ ছিলো বলে এখন বৃষ্টির জন্য গাছপালা ঘাসবন আর মাটি থেকে চমৎকার একটা

ভাপ উঠে ছড়িয়ে যাচ্ছে চারদিকে। তার মৃদু গন্ধে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। যে কোনো সুখ কিংবা দুঃখের মুহূর্তেই কি মানুষ তার ছেলেবেলায় ফিরে যায়!

খানিকবাদে বৃষ্টিটা হঠাৎই থেমে যায়। যেমন নেমেছিলো, তেমনি। দেখে অপুর মন খারাপ ভাবটা কাটে। মন্দির থেকে বেরিয়েই বলে, আর কোনো কথা নেই। এখন সোজা বালিগাঁ। বালিগাঁ থেকে সন্ধ্যেবেলা মুন্সিগঞ্জের লঞ্চ ছাড়ে। সেই লঞ্চ ধরবো। পা চালিয়ে হাঁট।

শুনে তরী গম্ভীর গলায় বললো, জোরে হাঁটতে আমি পারি না।

বাড়ি যাবি না? সন্ধ্যে হয়ে এলো। কথাটা অপু বলে বিরক্ত হয়ে।

শুনে তরী একপলক অপুর মুখের দিকে তাকায়। তুই আমার সঙ্গে রাগ করে কথা বলিস কেন? আমার সঙ্গে তো কেউ কখনো রাগ করে কথা বলে না।।

শুনে অপু হেসে ফেলে। রাগ করছি কই! বাড়ি না গেলে তো তোরই অসুবিধা। তুই তো মেয়ে।

বাড়ি ফিরে যেতে আমার ইচ্ছে করে না। সেই একই ঘরদোর, মা-বাবা। কলেজ। ডাক্তার কাকা। আর খালি অমুকটা করিস না, তমুকটা করিস না। ঘন্টায় ঘন্টায় ওষুধ খাও। অসুখ নিয়ে কথা। কেউ আমার সঙ্গে রাগ করে কথা পর্যন্ত বলে না। আমি মনে কষ্ট পেলে অসুখটা বাড়বে, এসব আর আমার ভাল্লাগে না।

অপু বললো, অসুখ কারো চিরকাল থাকে না। সেরে যাবে। তারপর তোর বিয়ে হবে, ছেলে হবে। আমার কথা ভুলে যাবি। বলে, অপু খুব হাসে। তরীর মন বলে, সব মিথ্যে।

তখন মেঘ কেটে বিকেলবেলার শেষ আলো ফুটে উঠেছে চারদিকে। পাতলা একটা হাওয়া আছে। বৃষ্টির পরে পৃথিবী খুব নির্মল হয়ে যায়। এখন সেই সময়। এ সময় পৃথিবী নির্মম খেলাড়ীর মতন মানুষকে অনেককাল বেঁচে থাকার জন্যে লোভী করে তোলে। কি মনে হতে চারদিকের পৃথিবীকে তরী খুব গোপনে জানিয়ে দেয়, আমি একদিন ভেসে যাবো। দূরে, বহুদূরে।

১৯৮১

রানীর কাছে যাবো

চিনতে পারেন?
মিলন না?
হু।
রানীর চেহারায় রোদ খেলে গেলো। ভেতরে আসুন।
ভেতরে ঢুকে রানীকে জিজ্ঞেস করি, চিনলেন কেমন করে?
কাগজে আপনার ছবি দেখেছি।
রানী আঁচল দিয়ে চেয়ার মুছে দেয়। বসুন
আমি রানীকে দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। রানী এতো ঘরোয়া মেয়ে!
রানী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলো। আসতে ইচ্ছে হলো?
আমি চেয়ারে বসতে বসতে বলি, অনেকবারই ইচ্ছে হয়েছে। সময় করে উঠতে পারিনি। তাছাড়া
কি?
একটা ভয় ছিলো।
কি রকম?
হুট্ করে একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে ময়মনসিংহ চলে আসা। ব্যাপারটা কেমন না!
কেমন কি! আমাকে জানিয়ে এলেই হতো।
আমি কথা বলি না। চারদিকে তাকিয়ে ঘরের ভেতরটা দেখি। বুঝতে পারছিলাম রানী আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। তবুও রানীর দিকে তাকাই না। একটি মেয়ে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে, ব্যাপারটা ভালোই লাগে।
রানী বললো, কবে এসেছেন?
কাল বিকেলে।
আমাকে জানাননি কেন? রানী সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকায়।
আমি হেসে বলি, সময় ছিলো না। সাডেন প্রোগ্রাম। রানী দাঁড়িয়েই ছিলো। আমি বললাম, বসুন।
রানী মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসলো। এবার আমি সম্পূর্ণ রানীকে দেখি। আ রানী, তুমি এতো সুন্দর!

রানীর একগোছা চুল এসে পড়েছে গালে। রানী পরে আছে একটা সাধারণ তাঁতের শাড়ি। রানী বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিলো। গালমুখ ফোলা ফোলা। চোখ দুটো দারুণ। আমি রানীর চোখের দিকে তাকিয়ে একটা জিনিস আবিষ্কার করি, রানীর চোখ হাসে।

এক সময় রানী হাই তুললো, ঘুমিয়ে ছিলাম।

আমি কথার পিঠে কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ করে বলে ফেললাম, বিয়ে করেছেন নাকি?

কেন বলুন তো? রানী আলতো হাসলো।

আমি লজ্জা পেয়ে বললাম, না এমনিতেই মনে হলো। রানী কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিলো। তারপর বললো, আকদ হয়েছে।

কবে?

কদিন আগে।

একটা বাচ্চা মেয়ে পর্দার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি মেরে আমাকে দেখছিলো। ব্যাপারটা খেয়াল করে রানী হাত ইশারায় মেয়েটিকে ডাকে। মেয়েটা পিটপিট এগিয়ে আসে। কাছে এলে আমি ওকে হাত বাড়িয়ে ধরতে চাই। পারি না। মেয়েটা সরে রানীর কোলের কাছে চলে যায়।

আমি জিজ্ঞেস করি, তোমার নাম কি?

মেয়েটা জবাব দেয় না। রানী ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। বলো, নাম বলো।

মেয়েটি আস্তে করে বললো, ইতি।

বা ভারি মিষ্টি নাম তো!

মেয়েটি ফিক করে হেসে ফেললো। তোমার নাম কি?

রানী খিল খিল করে হেসে ওঠে। আমিও। এবং রানী পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে ইতিকে ঠেলে ভেতরে পাঠায়। যাও, মেজপাকে বলো বড়োপার বন্ধু এসেছে। চা দাও।

ইতি এক দৌড়ে ভেতরে চলে গেলো। তখন আমি বলি, মুন্সীগঞ্জ থেকে আপনাকে একটা চিঠি লিখেছিলাম না?

হ্যাঁ। আমি তো জবাবও দিয়েছিলাম। পরে আপনি আর চিঠি লিখলেন না কেন?

একটু ব্যস্ত ছিলাম।

আসলে আপনি আমাকে ভুলে গিয়েছিলেন। গল্প টল্প পড়ে একটা মেয়ে চিঠি লেখে। তাকে কোন লেখক কদিনই বা মনে রাখে!

এটা ভুল ধারণা। আপনাকে আমার খুব মনে ছিলো। এবার ময়মনসিংহে সাহিত্য সেমিনারে এলেও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলেন আপনি।

সত্যি?

সত্যি ?

দুজনেই একটুক্ষণ চুপ করে থাকি। তারপর বলি, আপনার বিয়ে কবে ?

মাস দুয়েকের মধ্যেই। আপনাকে কার্ড পাঠাতাম।

আমি হাসি। রানী বলে, আসতেন ?

জানি না। কিন্তু এখন আসবো।

একটা চাকর গোছের মেয়ে ট্রেতে করে চা আর কি সব পিঠা টিঠা নিয়ে আসে। আমি অবাক হয়ে বলি, এসব করেছেন কেন ?

রানী কথা বলে না। তখন আমি হুট করে বলি, চিঠিতে তো আমরা দুজন দুজনকে তুমি করে বলতাম। এখন আপনি আপনি করছি কেন ?

ব্যাপারটা আমিও ভেবেছি। রানী হাসলো। নিন, চা নিন।

আমি তখন প্লেট থেকে একটা পিঠা তুলে রানীর দিকে বাড়িয়ে দিই, একটা কিছু দিয়ে আপন করতে হয়। নাও।

রানী হেসে ফেলে। পিঠাটা নেয়। আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বলি, তোমার ভদ্রলোক কি করেন ?

বিজনেস।

গুড ! বিয়ের পরে তোমার কাছে আসা যাবে। মেয়েদের বিয়ে না হলে ফ্রেণ্ডশিপটা জমে না।

আসলেই। কিন্তু তুমিতো আসবে না। ঢাকা গেলেই ভুলে যাবে।

আমি চায়ের কাপ নামিয়ে রাখি। আসবো, সত্যি আসবো।

রানী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখ ঝিলিক দিয়ে হাসে, আমি দেখতে পাই। আমার তখন বলতে ইচ্ছে করে রানী, বড়ো দেরি হয়ে গেলো তোমার কাছে আসতে। বলা হয় না।

আমি ঘড়ি দেখি। উঠতে হয়। ওরা অপেক্ষা করবে।

কারা ?

ঢাকা থেকে আরো কজন লেখক এসেছেন।

আজ তোমার প্রোগ্রাম ?

হুঁ।

কি করবে ?

সাম্প্রতিক ছোট গল্পের ওপর আলোচনা।

বাব্বা ! তুমি অনেক বড়ো লেখক হয়ে গেছো।

যা !

রানী হাসে। আমি কলেজে যাবো। চলো এক সাথে যাই।

তুমি তো আবার ড্রেস করবে !

বেশিক্ষণ লাগবে না। রানী ভেতরে চলে গেলো।

রাস্তায় নেমে রানী বললো, আমাদের কলেজে চলো। বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।

আমি রানীকে দেখছিলাম। রানী একটা প্রিন্টের সিফন পরেছে। মুখে পাউডার বুলিয়েছে আলতো করে। ঠোঁটে হালকা গোলাপী রংয়ের লিপস্টিক। আর রানীর চোখ তো অবিরাম হাসছে।

রানী বললো, কি দেখছো?

তোমাকে দারুণ লাগছে।

রানী মিষ্টি করে হাসলো। লেখকরা অনেক বাড়িয়ে বলে।

সত্যি না!

একটা রিকশা ডেকে রানী বললো, ওঠো।

না। তুমি বিকেলে ফাংশানে এসো। এখন গেলে লেট হয়ে যাবে।

রানী দাঁড়িয়ে থাকে। এটুকু হেঁটে ওর নাকের তলায় ঘাম জমে গেছে। আমার মনে হচ্ছিলো আর দুমিনিট রোদে দাঁড়িয়ে থাকলে রানী গলে যাবে। আমি হাত ধরে ওকে রিকশায় চড়িয়ে দিই। বিকেলে এসো কিন্তু।

রানী হাসে। আসবো।

রানী রিকশায় বসেও দুবার পেছনে ফিরে তাকায়। হাসে। আমি দাঁড়িয়েই থাকি। নড়তে ইচ্ছে করে না। সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। রানীর সাথে দেখা না হলেই ভালো হতো। আবার বোধ হয় একটা ভুল করে ফেললাম।

বিকেলে, কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায় এসেছে রানী। আমি বসেছিলাম স্টেজের কাছে। ঢাকা থেকে আগত বিশেষ অতিথির আলাদা একটা মূল্য আছে। আমি জোর করে চেহারায় একটা ভারিককি ব্যাপার আনি। কোনোদিকে তাকাই না।

রানী বসেছে মেয়েদের রোর মাঝখানে। আমি একবার আড়-চোখে রানীর দিকে তাকাই। রানী তো সরাসরি আমার দিকেই তাকিয়ে-ছিলো। আমাকে তাকাতে দেখে হাসে। আমি হাসতে পারি না। কি যে খারাপ লাগে! আর ঠিক তখুনি মাইকে আমার নাম ঘোষণা করা হয়। এবার সমকালীন ছোটগল্পের গতি প্রকৃতির ওপর আলো-চনা করবেন ঢাকা থেকে আগত তরুণ গল্পকার

আমার মাথা ঠিক নেই। তবুও স্টেজে গিয়ে উঠি। কি বলবো! আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে। দুবার গলা খাকাড়ি দিই। তারপর বলতে থাকি, প্রিয় সুধীমণ্ডলি

রানীকে দেখি অপলক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তখন আমার আবার সব গোলমাল হয়ে যায়। মাইকে বলে দিতে ইচ্ছে করে, রাণী, আমার খুব দেরি হয়ে গেছে।

প্রবল হাততালির মধ্যে দিয়ে স্টেজ থেকে নেমে আসি। আমার নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসি। একবার রানীর দিকে তাকাই। রানী হাসে। আমি চোখ ফিরিয়ে নিই। আবার তাকাই। রানী তখন চোখ

ইশারা করে। আমি একটুক্ষণ বসে থাকি। তারপর গট গট করে বেরিয়ে আসি। দোতলার সিঁড়ির কাছে এসে দেখি রানী দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই হাসলো। দারুণ বলেছো!

সত্যি?

হুঁ তুমি খুব ভালো বলতে পারো।

রানী গরদের শাড়ি পরে এসেছে। শেষ বিকেলের আবছা আলোয় ওকে কি যে সুন্দর লাগছে!

রানী বললো, চলো!

কোথায়?

আমাকে এগিয়ে দিয়ে আসবে।

অনুষ্ঠান শুনবে না?

ধেৎ! আমি তো শুধু তোমার বক্তৃতা শুনতে এসেছিলাম।

তখন একটা বাচ্চা মতো মেয়ে এসে আমাদের মাঝখানে দাঁড়ায়। চশমা পরা মোটা সোটা। আমি তাকাতেই ছোট একটা ডায়রী মেলে ধরলো, অটোগ্রাফ দিন।

আমি রানীর দিকে তাকিয়ে হাসি। ডায়রীটা টেনে গট গট করে লিখে দিই, গোপনে গোপনে জল বেড়ে উঠছে। নিচে সিগনেচার।

মেয়েটা চলে গেলে আমি খেয়াল করি সিঁড়ির কাছে অনিন্দ্য প্রকাশন স্টল খুলেছে। রানী ঝুকে ঝুকে বই দেখছে। একটা বই পছন্দ হয়ে যায় ওর। আমি রানীর হাত থেকে বইটা নিয়ে তার দাম মিটিয়ে এক কোণে লিখে দিই, রানুকে।

রানী অবাক হয়। রানু?

তোমাকে তো আমি রানু বলেই ডাকতাম।

রানী হাসে। কই, একবারও তো ডাকলে না!

আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে ডাকি, রানু রানু রানু।

রানী হাসে। ওর হাসিতে এক ধরনের বিষাদ। আমার মন খারাপ হয়ে যায়।

রিকশায় উঠে রানী বললো, চলো নদীর দিকটা ঘুরে যাই।

কিন্তু ওরা আমাকে খুঁজবে যে?

খুঁজুক।

রানী আমার হাত ধরে রিক্শায় তোলে। রানীর পাশে বসে আমি টের পাই, রানী খুব নরম মেয়ে। আর ওর গায়ে কি মিষ্টি গন্ধ! আমি রানীর কাঁধে হাত রাখি। রানী হাসে। কাল সারাদিন আমরা এক সাথে থাকবো।

আমি কথা বলি না। বুকের ভেতর সুন্দর এক দুঃখ, টের পাই দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে।

নদীর পাড়ে এক নির্জন জায়াগায় এসে দাঁড়াই। সন্ধে বসে গেছে। নদীতে এক রকম বিষন্ন হাওয়া, কুলকুল শব্দ।
রানী নদীর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। নদীর তীরে দাঁড়ালে মানুষের মন খারাপ হয়ে যায়। আমার একটু একটু খারাপ লাগছিলো। ব্যাপারটা কাটানোর জন্য রানীর কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে ডাকি, রানু।
রানী ঘুরে দাঁড়ায়। তারপর আবছা অন্ধকারে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে, তুমি এতো দেরি করে এলে কেন?
আমি কথা বলতে পারি না। দুহাতে রানীকে জড়িয়ে রাখি।
পরদিন ভোর পাঁচটার ট্রেনে আমি চলে এসেছি। ট্রেনে আমার রিজার্ভেশান ছিলো। আমি একমুহূর্তও বসিনি। সিটের ওপর ব্যাগটা বসিয়ে রেখেছি। আর আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম হ্যাণ্ডেল ধরে দরোজার কাছে। রানীর কথা ভেবে মন খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো। রানী আমাকে অপরাধী করে দিলো। কথা ছিলো আজ সারাদিন রানীর সঙ্গে থাকবো। আমি পালিয়ে এসেছি। দুঃখ বাড়িয়ে কি লাভ!
অথচ রানী আজ সারাদিন আমার অপেক্ষায় থাকবে। আমার কথা ভাববে। ভাববে আর অপেক্ষা করবে।
রানী, দেখো তোমার কথা ভেবে ভেবে কাল সারারাত ঘুম হয়নি। আর ট্রেনে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। তবুও বসছি না। এর সবকিছুই তোমার জন্যে। তুমি ভালো থেকো। আমি আবার আসবো।

১৯৭৫

হে প্রেম

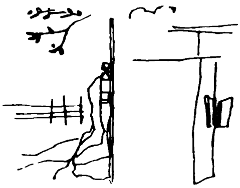

ঘরে ঢুকে টুই দেখে জাকি তখনো শুয়ে আছে। খোলা জানালা দিয়ে খানিকটা রোদ এসে ঢুকেছে ঘরের ভেতর। জাকির পায়ের কাছে রোদ। দেখেই রেগে যায় টুই। কি যে ঘুম! আমি কোন সকালে উঠে সব করছি আর উনি পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছেন।
জাকির পিঠের কাছে গিয়ে বসে টুই। চুল ধরে টানে। এই ওঠো!
জাকি ঘুমের ভেতর একটু আরামের শব্দ করে। তারপর টুইর দিকে মুখ ফিরিয়ে শোয়। নড়াচড়ার ফলে ওর বাঁ হাঁটুর কাছে উঠে যায় লুঙ্গি। শাদা পায়ের গোছা দেখা যায়। ঘন কালো লোমে ভরে

আছে। একবার সেদিকে তাকিয়ে রাগটা বেড়ে যায় টুইর। জাকির চুল মুঠিতে ধরে জোরে টানে। তুমি উঠবে?

জাকি কথা বলে না। টুই বুঝতে পারে, জেগে আছে। এবার আর একটু রাগে। ধমকের সুরে বলে, তুমি উঠবে? এই?

জাকি একপলক চোখ খুলে টুইকে দেখে। তারপর আবার চোখ বোঁজে।

টুই এবার লাফিয়ে ওঠে। এই আমি পানি আনতে যাচ্ছি। দেবো ঢেলে।

জাকি আড়মোড় ভেঙে বিকট একটা আরামের শব্দ করে।

টুই দূরে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় ডাকে, জাকি তুমি উঠবে?

কথাটা শুনেই জাকি স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে ওঠে। করছো কি! সকাল বেলা উঠেই হাজবেণ্ডের নাম ধরে ডাকছো!

ফাজলামো করো না।

জাকি হাত বাড়িয়ে টুইকে ধরে। কাছে টেনে বলে, চা দাও।

চিনি ফিনি কিচ্ছু নেই। আমি চা করবো কোথথেকে! গরম জলে চায়ের পাতা ছেড়ে রেখেছি, খাওগে।

জাকি হেসে ফেলে। নো প্রোবলেম। তুমি হাতদে ছুঁয়ে দিলেই মিঠে হয়ে যাবে।

হুঁ! আমি যেনো চিনি!

চিনি নও চুইংগাম।

বাজে কথা বলো না।

বাজে কথা হলো নাকি! কথাটা বলেই চমকে ওঠে জাকি। টুইর মুখটা অতো বিষন্ন কেন? চোখের কোলে কালি জমেছে! কি ব্যাপার!

দুহাতে টুইর মুখটা তুলে ধরে জাকি জিজ্ঞেস করে, তোমার চোখের কোলে কালি কেন?

জাকির স্বরে কি ছিলো কে জানে। টুই নরম হয়ে যায়। বাধুক মেয়ের মতো বলে, রাতেরবেলা একটুও ঘুমুতে পারিনি। খুব মাথা ঘুরেছে। দুতিনবার ওয়াক উঠেছে। দৌড়ে বাথরুমে গেছি, বমি হয়নি।

আমাকে ডাকলে না কেন?

এ্যা ডাকলে যেনো উনি শুনতেন। যা ঘুম তোমার! হঠাৎ মুখ চেপে হেসে ফেলে টুই। এমা ভুলে গেছো?

কি?

সেদিন না তোমাকে খাটের তলা থেকে টেনে বের করলাম। শুনে জাকিও হাসে। ঘুমের ঘোরে খাট থেকে পড়ে গিয়েছিলো। আজব বপার। ঘুমটা ভাঙেনি। জাকির ঘুম খুব গভীর। একবার ঘুমিয়ে পড়লে দেশে কু হয়ে গেলেও টের পাবে না! তো সেদিন হয়েছে কি, পড়ে গিয়েও ঘুমটা ভাঙেনি জাকির। রাতে বেশ গরম ছিলো। খালি গায়ে নিচে পড়ে যেতেই শীতল মেঝে পেয়ে ছিলো। আ কি আরাম।

ঘুমটা আরো গভীর হয়ে গেছে। ঘুমের ভেতর আরো শীতল জায়গা খুঁজতে খুঁজতে খাটের তলায় চলে গিয়েছিলো।

সকালে ঘুম ভাঙলে টুই দেখে জাকি নেই। এতো সকালে ওর ঘুম ভাঙার অভ্যেস না। গেলো কোথায়?

টুই বাথরুম খুঁজে আসে, রান্নাঘর খুঁজে আসে। না নেই, কোথাও নেই। একটু ভাবনায় পড়ে গিয়েছিলো টুই। মন খারাপ করে ঘরে ঢুকতে যাবে, দরোজার কাছ থেকে দেখে খাটের তলায় দুটো পা দেখা যায়। ছুটে এসে টেনে বের করে ছিলো জাকিকে। তারপর সেকি হাসাহাসি।

এই মুহূর্তে কথাটা ভেবে জাকির খুব হাসি পাচ্ছিলো। হাসি হাসি মুখে টুইর দিকে তাকায়। দেখে টুই গম্ভীর হয়ে আছে।

কি হলো, ফ্রিজ হয়ে আছো কেন?

টুই কথা বলে না। জাকি টুইর মুখের কাছে হাওয়া করার মতো হাত নাড়ে।

চুইংগাম, ও চুইংগাম।

টুই জাকির বুকের কাছে চেপে আসে। ডান হাতটা রাখে জাকির খোলা বুকে। বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, আমার জন্যেই তো তোমার এতো কষ্ট হচ্ছে!

কি বললে? জাকি ঠোঁট কুঁচকায়।

এই ঘরে, এই গরমে তোমার তো থাকার অভ্যেস নেই!

জাকি হঠাৎ করে একটা কবিতার লাইন আওড়ায়, 'যদি ভালোবাসা পাই আবার শুধরে নেবো জীবনের ভুলগুলো।' তোমার জন্যে আমি সব পারি।

টুই কথা বলে না। একহাতে নিজের কপাল চেপে ধরে। চোখ বোজে। টুইর শরীরটা একটু টলে যায়। দেখেই লাফিয়ে ওঠে জাকি। টুই কি হলো?

মাথাটা একটু ঘুরে উঠলো।

আমি ডাক্তার ডাকছি।

জাকি ব্যস্ত হয়ে শার্ট খোঁজে। এখন আর কিচ্ছু মনে নেই ওর। টুই উঠে গিয়ে ওর একটা হাত ধরে। নরম গলায় বলে, যেতে হবে না। এমন হয়।

জাকি কিছু বুঝতে পারে না। ক্যাবলাকান্তের মতো টুইর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখে টুই ঠোঁট টিপে হাসে। টুইর হাসি কি বলে কে জানে! জাকি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলে, হবে?

এমা, কি অসভ্য! বলেই জাকির বুকে দুহাতে কিল মারতে থাকে টুই। জাকি দৌড়ে সরে যায়। টুই আবার ওকে ধরে। তখন টুইর কোমর ধরে দুহাতে শূন্যে তোলে জাকি! তারপর পাগলের মতো ঘুরপাক খেতে থাকে। টুই চেঁচায়, উ ব্যথা পাচ্ছি। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি।

ক্লান্ত হয়ে টুইকে নামিয়ে দেয় জাকি। তারপর বলে, মেয়ে! আমি একটি মেয়ে চাই।
না ছেলে।
না মেয়ে।
না।
জাকি একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, আচ্ছা ছেলেই। ঠিক আমার মতো হতে হবে।
এরপর একটু থেমে আবেগের গলায় বলতে থাকে, আমি না খুব ছেলেবেলায়, আহা কি একখানা ছিলাম দেখতে। গ্লাক্সোর বিজ্ঞাপনে যে রকম বাচ্চাদের ছবি থাকে, একজাকটলি ওরকম।
ইস। তাহলে এখন এমন নাড়ু গোপালের মতো কেন হয়েছো!
এই, নাড়ু গোপাল বলবে না।
টুই হাসে। তারপর আবার গম্ভীর হয়ে যায়। একটু উদাসীনতা, একটু বিষণ্নতা ওর চেহারায় ছায়া ফেলে। জাকি ওর দুকাঁধে দুহাত রাখে, কি হলো আবার মাথা ঘুরছে?
না।
তাহলে কি ভাবছো?
যদি মরে যাই।
শক খাওয়ার মতো ছিটকে সরে যায় জাকি। গলা ভারি করে বলে, কি বললে?
অনেকেই তো মরে যায়।
আর কখনো ওকথাটি আমার সামনে উচ্চারণ করবে না।
টুই হেসে ফেলে। একদিন তো মরে যাবোই!
সে তো আমিও মরবো।
তোমার আগে আমি।
না, আমি তোমার আগে।
টুই ফাজলামো করে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়! এসো বাজি! জাকি খুশি হয়ে টুইর হাতের ওপর হাত রাখে। একটু হাসে। বাজি। কতো টাকা?
টাকা পয়সা না।
তাহলে?
যদি আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি তাহলে আমি আগে মরে যাবো।
আর যদি আমি তোমাকে বেশি ভালোবাসি তাহলে আমি আগে মরে যাবো। ও কে?
ও কে!

জাকি উত্তেজিত হয়ে বালিশের তলা থেকে ক্যাপস্টানের প্যাকেট বের করে। দেখেই টুই ছুটে গিয়ে ওর হাত ধরে, খবরদার খালি পেটে সিগারেট খাবে না।
জাকি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে একটু মাথা চুলকোয়। তারপর সিগারেটের প্যাকেটটা আবার বালিশের তলায় রেখে দেয়।

খোলা মেঝেতে বসে টুই আর জাকি নাস্তা করছে। একটা প্লেটে পরোটা আর ডিমভাজা। একপাশে একটা এলুমিনিয়ামের কেটলি, দুটো প্লাস্টিকের কাপ। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বলে কেটলির মুখে কাগজ গুঁজে রেখেছে টুই। খেতে খেতে জাকি বললো, ও তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। কাল আলমের বোনটার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।
টুই একটু ডিম ভাজা মুখে দিয়ে বললো, তোমার সেই লাইলী!
আমার লাইলী মানে?
মেয়েটার নাম লাইলী না?
হ্যাঁ, তো কি!
লাইলী তোমাকে চিঠি লিখতো না?
জাকি একটু হাসে। মেয়েটার খুব উইকনেস ছিলো।
এখন নেই?
এখন কি আর থাকে! তোমার কথা তো সারা পৃথিবী জানে।
বা রে আমরা বিয়ে করেছি লোকে জানবে না!
তো?
তো কি?
আমার বউ আছে শুনে আর কারো উইকনেস থাকে?
অনেক মেয়ের তবুও থাকে।
তোমার আবার অন্য কারো জন্যে
টুই ভীষণ রেগে যায়। চোখ বড়ো করে বলে, খাবো না কিন্তু!
জাকি খাওয়া ছেড়ে হাত জোড় করে। থাক বাবা, মাফ চাইছি।
দেখে টুই হাসে। লাইলী কি বললো?
কিছু বলেনি। আমি আলমের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।
আলম ভাই এখন কোথায়?
অস্ট্রেলিয়ায়। জাহাজের চাকরি।
তাইতো দুবন্ধুর তো একসঙ্গেই যাওয়ার কথা ছিলো।
তাতো ছিলোই। আপনার জন্যেই তো আমার যাওয়াটা হলো না।
টুই কাপে চা ঢালতে থাকে। দুকাপে ঢেলে একটা জাকির দিকে বাড়িয়ে দেয়, যাওয়া হলো না বলে তোমার খুব দুঃখ।
আরে যা। তোমার জন্যে বাবাকে ছেড়ে দিলাম, আর জাহাজের চাকরি।

টুই চায়ে চুমুক দিয়ে জাকির দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে। জাকি চায়ে বড়ো রকমের একটা চুমুক দেয়। তারপর উ করে ওঠে। কাপ ছলকে খানিকটা চা পড়ে যায় মেঝেতে।

দেখে টুই খুব হাসে। মুখ পুড়েছে ভালো হয়েছে।

জাকির চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে গেছে। সামলে নিয়ে বললো, খুব খুশি লাগছে, না?

টুই দুঃখি মানুষের মতো মুখ করে, ঠোঁটে চুকচুক শব্দ করে। একটুও খুশি লাগছে না। দুঃখে পরাণ ভরে যাচ্ছে।

শুনে জাকি গলা ছেড়ে হাসে। টুইও।

জাকি তারপর চায়ে ফুঁ দিতে দিতে বললো, আলম আর আমি এক সঙ্গেই পাসপোর্ট করলাম। বাবার কাছে থেকে সাত আট হাজার টাকাও নিয়েছিলাম। প্ল্যান ছিলো গ্রীসে চলে যাবো। গিয়ে জাহাজের চাকরি। তখনই তো তুমি

আমি কি?

ঐ যে তুমি বললে, আমি চলে গেলেই তোমাকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে দেবে।

দিতোই তো?

এ জন্যেই তো আমার যাওয়াটা হলো না। আলম অবশ্য আগেই বলেছিলো আমার যাওয়া হবে না। শুনে আমি খুব রেগে গিয়েছিলাম। বললাম, আয় শালা বাজি। পাঁচশো টাকা।

জাকি চায়ে চুমুক দেয়। আলম না কি চিঠিতে লাইলীকে সেই টাকাটার কথা লিখেছে। এই নিয়ে লাইলীদের বাসায় খুব হাসাহাসি।

জাকি উঠে গিয়ে বালিশের তলা থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে। ম্যাচ বের করে। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে আরামসে টান দেয়। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে, মনে আছে প্রথম যেদিন তোমার সামনে সিগারেট ধরাই, নারায়ণগঞ্জে ধলার বাসায়, তুমি রাগে লাফিয়ে উঠেছিলে।

তোমার সিগারেট খাওয়া দেখে সেদিন মনে হয়েছিলো তোমার সঙ্গে আমার কখনো প্রেম হবে না।

হলো কেমন করে?

বুঝি না। এখন তোমাকে সিগারেট খেতে দেখলে কিন্তু বেশ লাগে।

আরে এটা তো আগে বলতে হয়।

জী না। বেশি খেতে পারবেন না। বলেই টুই কাপ প্লেট গোছাতে থাকে।

ঠিক তক্ষুণি দরোজায় টুক টুক করে শব্দ হয়। জাকি উঠে গিয়ে দরোজা খোলে। খুলেই ভারি গলায় বলে, আয়।

কাঁধে কলেজের ব্যাগ, সুন্দর শাড়ি পরা জরি ঘরে ঢোকে। ঢুকেই কাঁধের ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে খাটের ওপর। তারপর দুহাতে টুইর গলা জড়িয়ে ধরে। ভাবী, কেমন আছো তুমি?

টুই অভিমানের গলায় বলে, আমার কথা তোমার মনে ছিলো?

মনে না থাকলে আসতাম না কি? আর তোমার কথা আমার মনে না থেকে পারে? আমার একটি মাত্র ভাবী তুমি।

দরোজা আটকাতে আটকাতে জাকি বলে, থাক আর মহব্বত দেখাতে হবে না।

শুনে জরি ক্ষেপে যায়। টুইর গলা ছেড়ে দিয়ে বলে, তুই আমাদের ব্যাপারে নাক গলাস কেন ভাইয়া? কাল তোকে নিয়ে কতো ফাইট দিলাম বাবার সঙ্গে।

টুই উদগ্রীব হয়ে বললো, কি বলেছো?

জরি কিছু বলার আগেই জাকি বললো, বাদ দে। আমাকে নিয়ে কোনো ফাইট করার দরকার নেই।

টুই বললো, শুনি না।

জাকি একটু রেগে যায়। কি হবে শুনে? আমি আর ওখানে ফিরে যাচ্ছিনা।

জরি বললো, কটা দিন যেতে দে না দেখবি বাবাই তোদেরকে নিতে আসবে।

জাকি পুরো ব্যাপারটা উল্টে দিয়ে বললো, তুই আজ কলেজে গেলি না জরি?

রোজ রোজ কলেজে যেতে ভাল্লাগে না। আর

টুই হেসে বললো, আর কি? মাস্টারটা তোমাকে এখনো জ্বালাচ্ছে?

জরি বিরক্ত হয়ে খাটে বসে। উ লোকটা আমাকে পাগল করে ফেললো। অমন একটা গাবদা গোবদা লোকের সঙ্গে এসব করা যায়!

একটু নাচাও না।

টুইর কথা শুনে জাকি রেগে যায়। এই খবরদার, আমার বোনটাকে নষ্ট বুদ্ধি দেবে না। ও কি তোমার মতো?

আমার মতো মানে? আমি কি আর দুচারটে প্রেম করেছি না কি ? না কি আর কাউকে নাচিয়েছি ?

করোনি আবার। জামান তো এখনো তোমার জন্যে

এ কথায় টুই ভীষণ রেগে যায়! চোখ পাকিয়ে বলে, ভালো হবে না কিন্তু।

জাকি টুইর দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে হাত জোড় করে। মাফ চাইছি। তারপর জরিকে বলে, কাল তোর কলেজে যাবো। শালাকে দেখাবি। দাঁত ভেঙে ফেলবো।

টুই বললো, থাক বাহাদুরী দেখাতে হবে না। তুমি বেরোও।
বেরোও মানে?
তোমার না কোথায় যাওয়ার কথা!
জাকি লাফিয়ে উঠে। যা শালা, ভুলেই গেছি। টুই আমার শার্টটা
জাকি সকাল থেকেই প্যান্ট পরে আছে। একটাই লুঙ্গি। সকাল বেলা গোসল করার পর জাকিকে প্যান্ট পরতে হয়।
টুই শার্ট এগিয়ে দিলে ব্যস্তভাবে পরে ফেলে জাকি। বোতাম লাগাতে লাগাতে বলে, জরি সত্যি কাল তোর কলেজে যাবো।
কিন্তু এখন যাচ্ছিস কোথায়?
একটা চাকরির ব্যাপার আছে।
কি? তুই চাকরি করবি?
চাকরি না করলে খাবো কি?
আমি এক্ষুণি বাসায় গিয়ে বলে দেবো।
তাহলে তুই আর এখানে আসতে পারবি না।
আমি আসবোই। ভাইয়া তুই
জরির চোখ ছল ছল করে। দেখে জাকি বলে, তুই এখনো খুব ছেলেমানুষ জরি। চাকরি না করলে চলবে কেমন করে?
আমি তোকে মাস মাস টাকা দেবো।
জাকি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। নারে তোদের টাকা পয়সা আমি নেবো না।
জরি দুঃখের গলায় বলে, আমারটা নিতে তোর দোষ কি?
তোরটা কি আলাদা?
আলাদাই তো? আমার জমানো টাকা।
সে আর কটাকা।
কম না। তোদের চলে যাবে।
পাগলী! যা বাড়ি যা।
জাকি চিরুণী খুঁজে মাথা আঁচড়ায়। জরি বলে, তুই আমাদের ফ্যামেলির সবকিছু ভুলে গেছিস ভাইয়া।
আমাদের ফ্যামেলিতে কেউ কখনো চাকরি করেনি।
তোদের ফ্যামেলিতে তো কেউ কখনো পালিয়ে বিয়েও করেনি। ওসব গোঁড়ামি। আমি মানি না।
টুই একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। এবার সুযোগ পেয়ে বললো, তুমি কথা বলবে, না যাবে।
যাচ্ছি। তারপর জরির দিকে তাকিয়ে বললো, জরি কাল তোর কলেজে জরি কথা বলে না। মুখ গোমড়া করে বসে থাকে। জাকি খুব স্পিডে বেরিয়ে যায়।

অধুনা বিজ্ঞাপনী সংস্থার ছিমছাম একটা রুমে বসে আছে জাকি। রুমটা বড়ো সাহেবের। জাকির সামনে একটা গ্লাসটপ বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। কাঁচের তলায় ছড়ানো ছিটানো কিছু রঙ বেরঙের ছবি। ওপাশে রিভলবিং চেয়ারে বসা বড়ো সাহেব। ইয়াংম্যান। জাকির চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়ো হবেন। বেশ সুন্দর চেহারা। ক্লিন সেভড। জাপানী প্রিন্টের হাফ হাতা শার্ট পরে আছেন। হাতে ইলেকট্রনিক্সের ঘড়ি। বড়ো সাহেবের পকেটে লাল ডানহিলের প্যাকেট। বের করে জাকির দিকে বাড়িয়ে দিলেন। নিন।

জাকি অবলীলায় সিগারেট নিলো। বড়ো সাহেব ঝকঝকে লাইটার বের করলেন। প্রথমে জাকির সিগারেট ধরিয়ে দিলেন। পরে নিজেরটা ধরালেন। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে দোল খেতে খেতে, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, আপনার পোশাবে?

জাকি ধীর গলায় বললো, পুশিয়ে নিতে হবে।

আমার ফার্মটা ছোট। এ বছর তেমন বিজনেসও পাইনি।

আমি কিছু বিজনেস দিতে পারবো।

গুড, ভেরি গুড।

জাকি একটু থেমে বললো, কিছু বিজনেসম্যান আত্মীয় স্বজন আছে, তাদের কাছে যেতে হবে আর কি।

বড়ো সাহেব একটু থেমে থাকলেন। কিছু একটা বোধহয় ভাবলেন। তারপর বললেন, একটা কথা বলি মিস্টার জাকি, ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়াইজ। আপনার প্রোবলেমটা কি?

জাকি একটু চুপ করে থাকে। নিজের প্রোবলেমের কথা কাউকে বলতে ওর খারাপ লাগে। গায়ে বনেদীআনা লেগে আছে। তবুও বললো, পালিয়ে একটা মেয়েকে বিয়ে করলাম। বাবা বাড়ি থেকে বের করে দিলেন।

বড়ো সাহেব একটু নড়ে বসলেন, আমি এতো দূর ভাবিনি!

আপনি কি ভেবেছেন?

প্রথম আপনি যেদিন আমার এখানে আসেন, সত্যি বলতে কি আপনাকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম। মনে হয়েছিলো আপনি এসব চাকরি-বাকরি করবেন না। জোক করতে এসছেন।

জাকি হাসে। এমন তো মনে হওয়ার কথা না।

আমি লোক দেখে বুঝতে পারি। আপনার ফেস বলে এ রকম গোটাদশেক ফার্ম আপনি কিনতে পারেন।

জাকি বললো, বাবা বিজনেসম্যান। বাবার কাছে আমি কখনো ফিরে যাবো না।

ইটস অল রাইট। আপনি কাল থেকে অফিসে আসুন। ছশো টাকায় শুরু করুন তো, পরে দেখা যাবে।

জাকি উঠে দাঁড়ায়। সো কাইণ্ড অব য়্যু স্যার।
বড়ো সাহেবও উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, রাখেন ওসব। স্যারফ্যার বলবেন না। আমি ফর্মালিটি পছন্দ করি না। বন্ধুর মতন ভাববেন। আমার ডাকনাম বাচ্চু। কেউ বাচ্চু ভাই বলে ডাকলে ভালো লাগে।
জাকি মুগ্ধ চোখে লোকটাকে দেখে। তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

দোতলার ড্রইংরুমে বসে একটা ইংরেজি পত্রিকা পড়ছেন বাবা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছেন। সামনের ছোট্ট টেবিলের ওপর ট্রিপল ফাইভের প্যাকেট, চিনে মাটির সুন্দর এসট্রে। বাবা সিগারেট খাচ্ছেন। তাঁর ডানপাশে বিশাল ডেকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্যাসেট বাজছে। আর মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে।
পাঁচ মিনিট পর ক্যাসেটটা বন্ধ হয়ে গেলো। বাবা উঠে ক্যাসেটটা উল্টে দিয়ে আবার এসে বসলেন। ক্যাসেটে গমগম করে উঠলো জাকির গলা। কবিতা পড়ছে জাকি।
সম্পূর্ণ একটা আচ্ছন্নতার মধ্যে এই পথ পেরিয়ে এলাম,
নিঃসঙ্গ নির্জন এই দীর্ঘ কালো পথ
স্তব্ধতার প্রতিমূর্তি এই মধ্য রাত্রি
মানুষের প্রতিনিধি ক্ষুদ্র এই একাকী মানুষ
এটুকু হতেই বাবা ব্যস্ত হাতে ক্যাসেটটা বন্ধ করে দিলেন। তারপর দরোজার দিকে তাকাতেই দেখেন কপাটে হেলান দিয়ে জরি দাঁড়িয়ে আছে। একটু থতমত খেয়ে গেলেন বাবা। তিনি কিছু একটা বলতে যাবেন, জরি এসে ঘরে ঢুকলো। কোনো ভনিতা না করেই বললো, বাবা তুমি একদিন যাও না!
বাবা গম্ভীরভাবে বললেন, না।
এতো জেদ থাকলে মানুষের খুব কষ্ট পেতে হয়।
ওর জন্যে আমার কোনো কষ্ট নেই।
তোমার কষ্ট হবে কেন, তুমি তো একটা পাষাণ। মা বেঁচে থাকলে কষ্টটা হতো তাঁর।
কথাটা বলতে বলতে জরির গলা ভিজে আসে। তবুও বলে, মা নেই ওর জন্যে এখন কষ্টটা আমার একার।
এ কথায় বাবা একটু রেগে যান। তুই খুব পেকেছিস জরি।
এটা কাঁচা পাকার ব্যাপার নয়। ভালোবাসা।
ভালোবাসা! বলেই বাবা ঘরের ভেতর পায়চারী করতে থাকেন। যেনো নিজের কাছেই বলছেন এমন স্বরে বলেন, যে ছেলে আমার প্রেস্টিজ দেখবে না তার জন্যে আবার ভালোবাসা কি!
তোমার প্রেস্টিজ ও কতোটা নষ্ট করেছে! তুমি মেনে নিলেই হতো।

আজকাল রেগুলার এসব হচ্ছে। তুমি আসলে খুব ব্যাকডেটেড। এ জন্যেই প্রেস্টিজ প্রেস্টিজ করছো।

বাবা হঠাৎ করে হেসে ফেলেন। তারপর আরাম করে সোফায় বসেন। সিগারেটের প্যাকেটে হাত দিতে যাবেন, জরি ছোঁ মেরে প্যাকেটটা নিয়ে নিলো। তুমি আবার অনিয়ম করছো?

বেশি কথা বললে আমার সিগারেট খেতে হয়।

বেশি কথা বলতে কে বলেছে তোমায়?

তুইই তো বলাচ্ছিস!

আমি বলাচ্ছি কি! তুমি বসে বসে ভাইয়ার গলা শুনছো, আর আমি ওর কথাটা তুললাম, এইতো।

বাবা একটু থেমে থেকে বললেন, তোর সঙ্গে দেখাটেখা হয়?

কদিন আগে হয়েছিলো। একটা এডভার্টাইজিং ফার্মে চাকরি নিয়েছে।

কি?

হ্যাঁ। কেন, তোমার প্রেস্টিজে লাগছে?

আমাদের বংশের কেউ কখনো চাকরি করেনি।

চাকরি করলে কেউ ছোট হয়ে যায় নাকি? না বংশ নষ্ট হয়ে যায়!

বাবা গম্ভীর স্বরে বললেন, তুই বড়ো বেশি কথা বলিস জরি।

তুমি ওদের নিয়ে এসো, আমি আর কখনো কিছু বলবো না।

না মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়।

বাবা মেয়েটা আসলে বড়ো ভালো।

যাকগে। ওসব নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না। বলেই বাবা আবার সিগারেটের প্যাকেটে হাত দেন। জরি আড়চোখে বাবার দিকে তাকায়। দেখেই বাবা থেমে যান।

জরি বলে, মা বেঁচে থাকলে তোমার সিগারেট খাওয়া নিয়েও আমাকে কিছু বলতে হতো না। মা নেই, এখন সব কিছুই আমাকে দেখতে হয়!

বাবা একবার জরির দিকে তাকান। কথা বলেন না।

জরি হঠাৎ করে উচ্ছল হয়ে উঠে। ও বাবা তোমাকে তো খুশির খবরটা দেয়া হয়নি। ভাইয়ার ছেলে হবে।

বাবা চমকে ওঠেন। কি বললি?

জরি ওসব খেয়াল করে না। হাততালি দিয়ে ওঠে। ইস কি যে মজা হবে না। বাবা, বাবা তুমি ওদের নিয়ে এসো। বাচ্চাটা আমাদের এখানেই হোক।

বাবা কোনো কথা বলেন না। থম ধরে বসে থাকেন।

জরি বলে, বাবা তুমি ওষুধ খেয়েছো?

বাবা কথাটা এড়িয়ে যান। দূরাগত গলায় জানালার দিকে তাকিয়ে বলেন, জাকিকে নিয়ে আমি যে কতো কি ভেবে রেখেছিলাম। কিছুই

হলো না। ইন্টারমিডিয়েট পাস করে ও আর লেখা পড়াই করলো না! বললাম, বিজনেস দেখ্। দেখলো না। ক'দিন খুব বিদেশ যাবে বিদেশ যাবে করলো। টাকা নিলো। গেলো না, করলো একটা বিয়ে। তাও পালিয়ে।

এখন আর ওসব নিয়ে মাথা ঘামিও না তো। আমি তোমার ওষুধ নিয়ে আসছি।

বাবা থামিয়ে দিয়ে বললেন, জরি, ছেলেবেলায় জাকি কিন্তু খুব শান্ত ছিলো। তোর তখন জন্মই হয়নি। আমরা থাকতাম গেণ্ডারিয়ায়। ভারি নিরিবিলি ছিলো বাড়িটা। আমার বিজনেস ছিলো নারায়ণগঞ্জে। সকালবেলা বেরিয়ে ফিরতাম রাত নটা দশটায়। তোর মা মাঝে মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তেন। জাকি ঠিক জেগে থাকতো। আমার গেট নক করা ও বুঝতো। দৌড়ে গেট খুলে দিয়েই হাত পাততো, এনেছো বাবা। আমি পকেট থেকে বের করতাম বাসের টিকিট, কখনো পেপার কাটিং তাতে সুন্দর ছেলেমেয়েদের মুখ। জাকি যে কি খুশি হতো পেয়ে! বাবা একটু থামলেন। তারপর সেই রকম উদাস স্বরে বলতে থাকেন, যেদিন ও চলে গেলো তোর তো মনে আছে, আমি ওকে একটা বিশ হাজার টাকার চেক দিয়েছিলাম।

জরি বললো, সব মনে আছে। ওসব বাদ দাও।

না, শোন। ও যখন চেকটা ছুঁড়ে ফেললো সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পেরেছিলাম ওর সঙ্গে আমার একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। সত্যি বলতে কি জানিস, আমার তখন ছেলেবেলার জাকির কথা মনে পড়েছিলো। বাসের পুরনো টিকিটও জাকি কি যত্ন করে রাখতো। ছবি। ওর সেই ছবিটা নষ্ট হয়ে গেছে। বিশ হাজার টাকার লোভে না হোক, একটা সুন্দর কাগজের প্রতি ওর লোভটা থাকলে আমি খুশি হতাম।

জরি বললো, বারে তুমি ওকে তাড়িয়ে দিচ্ছো, তোমার টাকা ও নেবে কেন?

বাবা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার দুঃখটা তুই বুঝবি না জরি।

খাটের উপর বসে দেয়ালে সুন্দর বাচ্চা ছেলের ছবি লাগাচ্ছে জাকি। বিদেশী পত্রিকা থেকে কেটে নিয়েছে। ছবিটার পেছনে আঠা লাগিয়ে যত্ন করে দেয়ালে সেঁটে দিচ্ছে ছবিটা। ঠিক এ সময়ে দরোজা ঠেলে টুই ঢুকলো। একটু সাজগোজ করা, হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। বোঝা যায় বাইরে কোথাও গিয়েছিলো। জাকি একবারও টুইর দিকে তাকালো না। মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে থাকলো। টুই এগিয়ে এসে বললো, কি করছো?

জাকি খুব সিরিয়াস গলায় বললো, ডিস্টার্ব করো না!

ইস কি এমন কাজ করছো?

টুই ভ্যানিটি ব্যাগটা খাটের ওপর রাখে। তারপর জাকির একেবারে গায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।
ছবিটা লাগানো শেষ হয়েছে। জাকি এবার টুইর দিকে তাকিয়ে অকারণে সরল একটা হাসি হাসলো, ছবিটা দারুণ না?
টুই ছবিটার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বাঁকালো, খুব একটা ভালো না।
খুব ভালোর দরকার নেই। আমি এমনই চাই।
কথাটা বলেই জাকির যেনো হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন স্বরে বলে, ও ডাক্তার কি বললো?
কিছু সাজেশান দিলো।
কি রকম। ওসব মেয়েলি ব্যাপার তোমার শুনে কাজ নেই।
জাকি হঠাৎ করে দুহাতে টুইকে জড়িয়ে ধরে, বলো না গো।
এমা তুমি মেয়েদের মতো কথা বলছো?
জাকি মাথাটা এলিয়ে দেয় টুইর বুকের কাছে। টুই একটা হাত দিয়ে জাকির মাথার চুল এলোমেলো করে দিতে থাকে।
জাকি টুইর বুকে মুখটা একটু ঘষে দিয়ে বলে, ছেলেবেলায় তো আমি মেয়েদের মতোই ছিলাম। ছবি ছিলো বাচ্চা ছেলেমেয়ের ছবি কালেকশান। বাবা এনে দিতো।
টুই বললো, তুমি এখনো মেয়েদের মতো। এই যে ছবি লাগালে?
এটা তো আমার ছেলের কথা ভেবে।
টুই হাসে। ছেলের সঙ্গেই দেখা নেই।
বারে দেখা তো হবেই।
জাকি তারপর টুইকে ছেড়ে টুইর ভ্যানিটি ব্যাগ নিয়ে নাড়াচাড়া করে। মেয়েদের ভ্যানিটি ব্যাগ দেখলেই আমার কেবল খুলতে ইচ্ছে করে। আর
আর কি?
সিনেমা হলে গেলে আমার সবসময় মেয়েদের বাথরুমে ঢুকতে ইচ্ছে করে। মেয়েদের বাথরুম কেমন হয়!
ছি তুমি যে কি!
জাকি টুইর ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে ফেলে। ভ্যানিটি ব্যাগে দু একটা খুচরো টাকা, কিছু পয়সা, একটা ছোট্ট ফেস পাউডার, একটা মুন ড্রপসের সবুজ শিশি আর একটা লিপস্টিক। জাকি সব রেখে লিপ-স্টিকটা বের করে।
টুই বলে, লাইলীর ভ্যানিটিব্যাগ দেখোনি?
না।
মিথ্যে কথা বলো না?
না, সত্যি!

তোমার সত্যি। দেখলেই কি তুমি আমাকে বলবে।
জাকি মৃদু হাসে, বললে কি তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে?
যদি যাই!
পারবে?
টুই দুহাতে জাকির গলা জড়িয়ে ধরে। একটু দোল খেয়ে বলে, ডাক্তার যে কতো কি বললো! মাগো, লজ্জায় মরে যাই।
ডাক্তারটা ইয়াং না তো?
শুনেই টুই লাফিয়ে ওঠে। যা। দুয়ো। ডাক্তারটা তো মহিলা।
দুজনেই খুব হাসতে থাকে।
জাকি তারপর লিপস্টিকের ক্যাপ খুলে দেয়ালে কিছু একটা লিখতে যায়। টুই ওর হাত চেপে ধরে। কি করছো? আমার তো ঐ একটাই।
তাতে কি কিনে দেবো।
না।

জাকি টুইর দিকে তাকিয়ে সেই সরল হাসিটা হাসে। তোমার ঠোঁট এমনিতেই খুব লাল, লিপিস্টিক না লাগালেও চলে।
টুই কথা বলে না। নরম চোখে তাকিয়ে থাকে। জাকি তখন লিপস্টিক দিয়ে দেয়ালে লাগানো বাচ্চার ছবিটার তলায় গোটা গোটা অক্ষরে লেখে, 'মে গড ব্লেজ ইউ মাই সান'। শাদা দেয়ালে লেখাটা সুন্দর হয়ে ফুটে থাকে। ঠিক তক্ষুণি দরোজায় কে নক করে। টুই দরোজা খুলে দেয়। আর দরোজা খুলতেই বাইরে থেকে মুকুলের লম্বা সালাম ভেসে আসে। স্লামালেকুম ভাবী।

টুই হাসে। মুকুল আঙুলে চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে ঘরে ঢোকে। জিনস পরা, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মুকুল বেশ সুন্দর দেখতে।
জাকি বললো, আয়। কেমন আছিস দোস্ত?
তোর মতো ভালো নেই।
ওরকমই মনে হয়। আছো তো শালা বাপের হোটেলে, বিয়ে শাদী করোনি টেরটি পাচ্ছো না।
বিয়ে করে তুমি ইজরাইল দখল করেছো মালুম হয়!
জাকি ওসব পাত্তা না দিয়ে বলে, চুইংগাম চা লাগাও।
টুই বললো, যাই।
মুকুল একপাক খেমটা নাচ নেচে বললো, ফাস কেলাস। বড়ো তিয়াস লেগেছে রে।
টুই চলে যায়।
জাকি বললো, একটা ফিল্টার খাওয়া দোস্ত।
মুকুল পকেট থেকে বেনসানের প্যাকেট বের করে। জাকিকে দেয়, নিজে নেয়। তারপর লাইটার জ্বেলে একসঙ্গে দুজনে ধরায়।

প্রথম টানটা দিয়ে জাকি একটা আরামের শব্দ করে।
আবার ব্রাণ্ড চেঞ্জ করেছিস?
কি করবো, এক সিগারেট বেশিদিন খেতে ভাল্লাগে না।
বেনসান ধরেছিস কবে?
সপ্তাখানেক।
কদিন চলবে?
আর তিন সপ্তা।
আরে বা

মুকুল সিগারেটে বড়ো সড়ো একটা টান দিয়ে বললো, আমার সব কিছুতেই এরকম। এক জিনিস বেশিদিন ভাল্লাগে না। পারলে মাসে-মাসে স্বাস্থ্য চেহারাটাও চেঞ্জ করতাম। নিজেকে বড়ো একঘেঁয়ে লাগে। ভাবছি বিয়ে ফিয়ে করবো না। একটা বউ নিয়ে সারাজীবন কাটানো ইমপসিবল।

বউ চেঞ্জ করে নিবি। তাছাড়া তুই নিজেকে বেশ চেঞ্জ করতে পারিস। এই সেদিন দেখলাম ক্লিন সেভড, দাড়িগোঁফ কিচ্ছু নেই আর আজ দেখছি পুরো ফ্রেঞ্চকাট মেরেছিস।

টুই তক্ষুণি চা নিয়ে ঢোকে।

মুকুল খেয়াল না করে বললো, এ জন্যেই বিয়ে করবো না। রোজ রোজ এক জিনিসের মুখ দেখা। বোরিং লাগবে।

টুই বললো, কি বললেন?

মুকুল থতোমতো খেয়ে গেলো। তারপর হেসে বললো, না কিছু না ভাবী।

টুইর হাতে এক কাপ চা দেখে জাকি বললো, আমার চা কই?

তুমি এখন চা পাবে না।

আরে

টুই একটু রেগে যায়। অফিসে বসে তো ভর পেট চা খেয়ে এসেছো। তোমাকে না বলেছি বেশি চা খাবে না।

জাকি বোকার মতো টুইর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। টুই চায়ের কাপটা মুকুলের হাতে দেয়। জাকি তখন মুকুলের মুখের দিকে তাকায়।

তোর বাহনটা আনিসনি?

এনেছি।

টুই বললো, এমা তাহলে যে শব্দ পেলাম না!

দূরে থামিয়ে ঠেলে ঠেলে এনেছি। তোমাদের একটা সারপ্রাইজ দিলাম। জাকি হঠাৎ করে লাফিয়ে ওঠে। চাবিটা দে তো দোস্ত!

কেন?

আরে দে না। তারপর ছোঁ মেরে মুকুলের হাত থেকে চাবিটা নেয়। টুই দাঁড়িয়েছিলো সামনে। জাকি কিছু না বলে টুইর হাত ধরে বেরিয়ে

যায়। দরোজার কাছে গিয়ে বলে, তুমি চা খাও দোস্ত। মুকুল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। বাইরে তক্ষুণি একটা হোণ্ডা স্টার্ট নেয়ার শব্দ ওঠে।

অফিসে বাচ্চু সাহেব তাঁর নিজের রুমে বসেছিলেন। হাতে সিগারেট, চেহারায় একধরনের অস্থিরতা। রিভলবিং চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছেন তিনি।

হঠাৎ কলিং বেল বাজালেন। মুহূর্তে দরোজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো মাঝবয়সী পিয়ন। বাচ্চু সাহেব তার দিকে না তাকিয়েই বলেন, জাকি সাহেবকে সালাম দাও।

পিয়ন কিছু না বলেই বেরিয়ে যায়।

জাকি আসে পাঁচ মিনিট পর। দাঁড়িয়ে থেকেই বললো, ডেকেছেন?

ও জাকি, বোস।

জাকি বাচ্চু সাহেবের টেবিলের সামনে বসে। কি ব্যাপার?

কিছু না। চা খাবি?

জাকি খানিকক্ষণ বাচ্চু সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, বাচ্চু ভাই আপনাকে আজ খুব অন্যরকম লাগছে। শরীর খারাপ নাকি?

না।

বাচ্চু সাহেব আবার কলিংবেল বাজান। দুকাপ চায়ের অর্ডার দেন। তারপর ডানহিলের প্যাকেট বের করে জাকির দিকে এগিয়ে দেন। নে, সিগারেট খা।

জাকি কথা না বলে একটা সিগারেট নেয়। বাচ্চু সাহেব নতুন ঝকঝকে গোল্ডেন কালারের একটা ইলেকট্রনিক্সের লাইটার বের করেন। জাকির সিগারেট ধরিয়ে দেন।

জাকি লাইটার দেখে হাত বাড়ায়, দেখি বাচ্চু ভাই।

বাচ্চু লাইটারটা এগিয়ে দেয়। জাকি মনোযোগ দিয়ে দেখতে দেখতে বলে, বা সুন্দর তো!

পছন্দ হয়?

সুন্দর জিনিশ পছন্দ হবে না!

ওটা তুই নিয়ে নে।

এ কথায় জাকি একটু লজ্জা পায়। আরে না না, লাইটার দিয়ে আমি কি করবো?

সিগারেট ধরাবি। বলেই বাচ্চু সাহেব একটু হাসেন। তুই ওটা রেখে দে।

জাকি মৃদু হাসে। বাচ্চু ভাই, আমি খাই ক্যাপস্টান। অতো দামি লাইটারে ক্যাপস্টান ধরাতে দেখলে লোকে হাসবে।

বাচ্চু সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। লোকের হাসাহাসিতে কিছু এসে যায় না। লোকে হাসাহাসি করবে এই ভয়ে জীবনে আমরা অনেক কিছুই করতে পারি না। পরে সেজন্যে সারাজীবন দুঃখ পেতে হয়। লোকের হাসাহাসি গ্রাহ্য করবি না।

জাকি হাত কচলে বললো, একটা কথা বলবো বাচ্চু ভাই?

বল। আমাকে কিছু বলতে তো তোর সংকোচ থাকার কথা নয়! আমি না তোকে বলেছি আমার কাছে কোনো ব্যাপারে ভণিতা করবি না। আমি পছন্দ করি না।

আফটার অল আপনি আমার বস।

তাতে কি? আমি কি তোর সঙ্গে বসের মতো বিহেভ করি? তাহলে কি তোকে তুই তুকারি করতাম?

জাকি লজ্জা পেয়ে যায়। সরি!

বাচ্চু সাহেব ম্লান হাসেন। এবার বল।

জাকি বাচ্চু সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, কি হয়েছে আমাকে বলুন।

পরে বলবো। তার আগে তোকে একটা কাজ করতে হবে।

বলুন।

আমি কদিনের জন্যে বাইরে যাবো। তোকে আমার চেয়ারে বসতে হবে। রোজ তোর জন্যে এক প্যাকেট করে ডানহিল আসবে। আমি অফিসে বলে দিয়ে যাচ্ছি, সবাই তোকে বড়ো সাহেব হিশেবে ট্রিট করবে।

না, আমার ভীষণ খারাপ লাগবে।

খারাপ লাগার কি আছে!

অফিসে তো আরো লোক আছে, ওদের কাউকে বলুন।

ওদের দিয়ে হবে না। তুই ছাড়া এই অফিসের আর কাউকে আমার চেয়ারে মানায় না।

জাকি কথা বলে না। মাথা নিচু করে চা খায়।

বাচ্চু সাহেব উঠে দাঁড়ান। আয় বোস আমার চেয়ারে।

জাকি কাচুমাচু করে। দেখে বাচ্চু সাহেব রেগে যান। আমি তোর বস। অর্ডার করছি, আয়।

জাকি উঠে গিয়ে চেয়ারটায় বসে। দেখেই বাচ্চু সাহেব হাসেন। তোকে কিন্তু আমার চেয়েও ভালো মানায়।

জাকি হাসে, বাচ্চু সাহেবও।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জাকি দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে আড়মোড় ভাঙতে ভাঙতে বিকট একটা শব্দ করে। টুই ছিলো রান্না ঘরে। শুনেই পাগলের মতো ছুটে আসে। কি হলো, এ্যাঁ।

জাকি তার সরল হাসিটা হাসে। তারপর টুইর দুকাঁধে দুহাত রেখে বলে, কিছু না, একটু আমোদ করলাম।
টুই রেগে যায়। ঝটকা মেরে জাকির হাত নামিয়ে দেয়। তুমি যে কি না!
কি?
একেবারে ছেলেমানুষ।
জাকি সিরিয়াস গলায় বললো, ছেলেমানুষ বলো না, ছেলের বাবা বলো।
থাক থাক, হয়েছে।
জাকি হঠাৎ করে দুহাতে টুইর কোমর ধরে শূন্যে তুলে ফেলে। তারপর চরকির মতো ঘুরতে থাকে। টুই শিশুর মত হাসফাঁস করে, ছাড়ো ছাড়ো।
পুরো তিন মিনিট চরকিবাজি খেয়ে থামে জাকি। টুইকে নামিয়ে দেয়। আমার আজ বড়ো আমোদ লাগছে টুই।
কারণটা কি?
বুঝতে পারছি না। খুব সম্ভব বাচ্চু ভাইয়ের ব্যাপারটা।
বাচ্চু ভাইয়ের আবার কি হলো?
আরে যা, তোমাকে তো বলাই হয়নি। আমি তো এখন অফিসের চীফ বস।
মানে?
বাচ্চু ভাই আমাকে তাঁর চেয়ারে বসিয়ে ছুটিতে গেছেন। এখন আমার জন্যে প্রতিদিন এক প্যাকেট করে ডানহিল বরাদ্দ। অফিসের সবাই আমার কথায় ওঠে বসে।
গুল মেরো না।
আসো না একদিন অফিসে। দেখিয়ে দেবো।
টুই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তোমার অফিসে যেতে আমার ভাল্লাগে না।
কেন?
ওসব কাজে তোমাকে মানায় না। একটা নোংরা টেবিলে বসে মাছি-মারা কেরানীর মতো কলম চালাচ্ছো দেখলে আমার কান্না পাবে।
এখন একদিন এসো। আমার রুম আর চেয়ার টেবিল দেখলে তোমার ওসব দুঃখ টুঃখ আউট হয়ে যাবে।
পরের ধনে পোদ্দারি। ও আমার দেখতে হবে না।
জাকি বিরক্তির মুখ করে। ইস তুমি যে মাঝে মধ্যে এমন বাজে ল্যাঙ্গোয়েজ ইউজ করো না!
বাজে ল্যাঙ্গোয়েজ মানে?

এই যে পোদ্দারি ফোদ্দারি। ভদ্রলোকের স্ত্রীরা এসব শব্দ ব্যবহার করে কথা বলে?

আমি ভদ্রলোকের স্ত্রী? কে বললো তোমাকে?

টুই, বাজে বকো না!

কি করবে? মারবে?

মারবোই তো?

টুই বুক ফুলিয়ে বলে, মারো তো দেখি, কেমন বাহাদুরি!

জাকির হঠাৎ করে কি হয় কে জানে। ঠাস করে চড় মেরে বসে টুইর মুখে। টুই আ করে করুণ একটা শব্দ করে। তারপর চোখ বুজে টলতে থাকে।

জাকি থতোমতো খেয়ে যায়। দ্যাখে টুই পড়ে যাচ্ছে। দুহাতে ধরে ফেলে। টুই নেতিয়ে পড়েছে। কোনো শব্দ করছে না। জাকি পাগলের মতো চেঁচায়, টুই টুই কি হলো তোমার? টুই, টুই।

জাকি প পাঁজাকোলে করে টুইকে খাটে নিয়ে যায়। শুইয়ে দিয়ে ঘরের ভেতর জল খোঁজে। নেই, কোথাও একফোঁটা জল নেই। কি করে, জাকি এখন কি করে!

হঠাৎ চোখ যায় ফ্লাওয়ার ভাসটার দিকে। দুটো তাজা গোলাপ ফুটে আছে। জাকি দৌড়ে গিয়ে ফুলটুল ছুঁড়ে ফেলে। ভাসটা নিয়ে খাটের কাছে এসে, ভেতর থেকে জল বের করে টুইর চোখে মুখে ছিঁটাতে থাকে। টুই একটু একটু কাঁপে।

জল শেষ হলে ফ্লাওয়ার ভাসটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় জাকি। টুইর মুখের ওপর ঝুঁকে পরে ডাকে, টুই টুই।

টুই চোখ মেলে। তারপর অপলক তাকিয়ে থাকে জাকির মুখের দিকে।

জাকি নার্ভাস গলায় বলে, টুই আমি, আমি

টুই কথা বলে না। তাকিয়ে থাকে। কি নরম চোখ। পৃথিবীর সব ভালোবাসা এখন ঐ চোখে।

জাকি টুইর মুখের কাছে আর একটু ঝুঁকে যায়। আমি বুঝতে পারিনি টুই।

টুই ঠাণ্ডা গলায় বলে, আমার কিন্তু একটুও লাগেনি।

তুমি আমাকে মাফ করে দিও।

বউর কাছে কেউ মাফ চায়! বলেই জাকির মাথাটা দুহাতে নিজের বুকে টেনে নেয়। জাকি বাচ্চা ছেলের মতো টুইর বুকে মুখ রেখে পড়ে থাকে। টুই দুটো নরম হাতে ওর পিঠ থামছে থামছে ধরে, বুলিয়ে দেয়। আমাকে নিয়ে তোমার অতো ভয় কেন? বউকে তো কতো লোকেই মারে।

আমি তোমাকে কখনো মারবো না। শুধু ভালোবাসবো, শুধু ভালো-বাসবো।

তোমার ভালোবাসার যা বহর। এই, তুমি যে আমাকে নিয়ে এমন হুড়োহুড়ি করো, কিছু বোঝো না?
কি বুঝবো?
এ সময় এমন করতে নেই।
ডাক্তারের নিষেধ?
হুঁ।
আমাকে বলোনি কেন?
বললে কি তুমি বিশ্বাস করতে? ভাবতে গুল মেরে আমি তোমাকে ভয় খাওয়াচ্ছি।
আমি তো এমন কিছু করিনি।
করোনি? সেদিন ভাঙা রাস্তায় কি স্পিডে হোণ্ডা চালালে। আজও তো, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ।
আমি বুঝতে পারিনি। আর করবো না।
মনে থাকে যেনো?
তারপর একটু থেমে বলে, বাজির কথাটা মনে আছে?
আছে। দেখবে আমিই জিতবো।
না, আমি। মনে হয় আমিই তোমাকে বেশি ভালোবাসি।
সে তো আমারও মনে হয়। বাজি ফাজি বাদ দাও। মরে যাওয়ার কথা ভাবতে ভাল্লাগে না।
টুই দুহাতে জাকিকে আরো জোরে আঁকড়ে ধরে।
একটা কথা বলবো?
বলো!
তুমি রাগ করো না।
আচ্ছা।
তখন কিন্তু আমি অজ্ঞান হইনি। ভান করলাম। দেখি তুমি কেমন করো।
জাকি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে। ওরে
তারপর আবার হাত তুলে টুইকে মারতে যায়।
টুই এখন খুব হাসছে।

বাচ্চু সাহেবের চেয়ারে বসে একটা বিজ্ঞাপনের ডিজাইন দেখছিলো জাকি। দেখতে দেখতে হঠাৎ কলিংবেল বাজালো। পিয়ন ঢুকতেই বললো, একাউনট্যান্ট সাহেবকে সালাম দাও।
পিয়ন বললো, উনি তো আসেন নাই স্যার।
বলো কি, কটা বাজে?
পোনে বারোটা!

অফিস তো দশটায়! পোনে বারোটা বাজে এখনো তিনি আসেননি?
পিয়নটা একটু কাইকুই করে। জাকি জিজ্ঞেস করে, কিছু বলবে?
একটা কথা কইতে চাইছিলাম স্যার।
বলো।
আপনে কিছু জানেন না স্যার?
না তো, কি হয়েছে?
বড়ো সাহেব বলে পলাইছে।
তার মানে?
জ্বি স্যার! কোন পার্টির কাছ থিকা বলে চাইর পাঁচ লাখ টাকা লইছে। লইয়া বলে বিদেশ গেছে গা। আর আইবো না।
এ কথায় জাকি একটু রেগে যায়। ধমকে বলে, বাজে কথা বলো না। তাহলে অফিস চলবে কেমন করে?
অফিস তো চলবোই না স্যার। হুনলাম খুচরা খাচরা টেকা যেহানে যা আছিলো হেইগুলা সরাইছে একাউনট্যান্ট সাব। হেয়ও আর অফিসে আইবো না।
জাকি হঠাৎ করে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পকেট থেকে ডানহিলের প্যাকেটটা বের করে, লাইটার জ্বালিয়ে ধরায়। এখন আমি তাহলে কি করবো?
পিয়নটা পণ্ডিতের মতো বললো, আপনেরে একটা ভালা বুদ্ধি দেই স্যার। অফিসে তালা মাইরা চাবিটা লইয়া কাইটা পড়েন। নাইলে আপনেও বিপদে পড়বেন।
আমি বিপদে পড়বো মানে?
মাইনষে তো আইয়া আপনেরে ধরবো! আপনে বহেন বড়ো সাহেবের রুমে।
জাকি সিগারেটে টান দিয়ে বলে, একটা কাজ করতে পারো। বড়ো সাহেবের বাড়ির ঠিকানাটা
পিয়নটা হাসে। আপনে তো দেহি কিছুই জানেন না স্যার। সাবের তো বাড়ি ঘরের ঠিক নাই। হেয় থাকতো হোইটালে হোইটালে।
জাকি দমে গিয়ে বলে, দেখো তো অফিসে আর কে কে আছে?
পিয়ন বেরিয়ে যায়। খানিক পর সাদেক সাহেবকে নিয়ে ঢোকে।
জাকি সাদেক সাহেবের দিকে তাকিয়ে বললো, সাদেক সাহেব, আর কেউ আসেনি?
না স্যার।
আপনি কিছু শুনেছেন?
শুনেছি।
এখন কি করা যায় বলুন তো?

অফিসে তালা মেরে চলে যাওয়াই ভালো মনে হচ্ছে।
আপনারা মাইনে টাইনে নিয়েছেন?
হ্যাঁ। আপনি নেননি?
না। তা হোক, মাইনেটা বড়ো কথা নয়। অফিসে তালা মেরে যাবো, চুরিটুরি হলে?
হলে আমাদের কি? তাছাড়া অফিস তো পার্টির টাকায় করা। বড়ো সাহেবেরও না।
জাকি সিগারেট টানতে টানতে উদাস হয়ে যায়। তখন ডাক পিয়ন একটা চিঠি দিয়ে যায়। জাকির নামে বিদেশী খামে লেখা চিঠি।
জাকি ব্যস্ত হয়ে চিঠিটা খোলে। বাচ্চু ভাইর লেখা। 'আমি এখন জার্মানীতে। তোর সঙ্গে আর কোনোদিন হয়তো দেখা হবে না। তোকে চিঠি লেখার কোনো দরকার ছিলো না। তবুও লিখছি। তোর ওপর আমার খুব মায়া পড়ে গিয়েছিলো। হয়তো সব কথাই তুই শুনেছিস। আমাকে ঘৃণাও করছিস, তাতে আমার কিছু এসে যায় না অবশ্য। কিন্তু আমার জীবনে একটা গল্প ছিলো। প্রত্যেক মানুষেরই থাকে। সেই গল্পটা তোকে শোনাবো না। তুই আমাকে ঘৃণাই করিস। আমার একটা কথা রাখিস। ছোটখাটো কটা পার্টির কাছে আমার কিছু পাওনা আছে। লিস্ট পাঠালাম। অধুনার প্যাডে আমার ফরে সিগনেচার করে টাকাটা তুই তুলে নিস। হাজার বারো হবে। তোর ছেলের জন্য আমার চিরকালের শুভেচ্ছা।'
চিঠিটা পড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জাকি। এ সময় ঝামেলাটা বাঁধলো। টুইর শরীর খারাপ। ডাক্তার বলেছে এ মাসের মধ্যেই। জাকি যে এখন কি করে!

বাসায় ঢুকে জাকি দেখে ঘরে তালা ঝুলছে। দেখেই বুকটা একবার ধড়াস করে ওঠে। টুই গেলো কোথায়? এ সময়ে একা তো ওর কোথাও যাওয়ার কথা নয়! শরীর খারাপ করলো, ডাক্তারের কাছে গেছে!
জাকি ঠিকঠাক বুঝতে পারে না। পকেটে ডুপ্লিকেট চাবি ছিলো। তালা খোলে। তারপর ঘরে ঢুকে জুতোটুতো নিয়ে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। অফিসে তালা মেরে এসেছে। চাবিটা ওর পকেটে।
কিন্তু টুই গেলো কোথায়?
তক্ষুণি পাশের বাড়ির একটা বাচ্চা মেয়ে এসে জাকিকে ডাকে, আপনার টেলিফোন এসেছে।
জাকি লাফিয়ে ওঠে! কে করেছে?
জানি না। আম্মু বললো আপনাকে ডেকে দিতে।

চলো। জাকি মেয়েটার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। এরা বাড়িঅলার আত্মীয়। জাকিকে খুব খাতির করে।

ড্রয়িংরুমে মেয়েটার মা বসেছিলো। জাকিকে দেখে একটু হাসলো। তারপর বেরিয়ে গেলো।

জাকি টেলিফোন ধরলো। হ্যালো

ওপাশে থেকে জরির গলা ভেসে আসে। ভাইয়া

কে, জরি?

হ্যাঁ।

কি ব্যাপার?

তুই কি বলতো, ভাবীকে ওভাবে ফেলে অফিসে চলে গেছিস।

কি হয়েছে?

ওর শরীর খারাপ। সকালে আমি তোর বাসায় গিয়ে দেখি মুখ চোখ কালো হয়ে আছে। জোর করে নার্সিংহোমে নিয়ে এলাম। ডাক্তার বললেন, দু একদিনের মধ্যেই

আমি এক্ষুণি আসছি।

হ্যাঁ চলে আয়।

জরি শোন, আমার হাত একেবারে খালি। অফিসে একটা গণ্ডগোল হয়েছে। চাকরিটা নেই।

বাদদে ওসব। ভাবতে হবে না।

টুইকে চাকরির কথাটা

আচ্ছা বলবো না, তুই চলে আয়।

জরি টেলিফোন ছেড়ে দেয়। জাকি তখন টের পায় ওর বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডের শব্দটা পাল্টে যাচ্ছে। টুইর কি এখন খুব কষ্ট হচ্ছে? দৌড়ে রাস্তায় নামে জাকি।

বাবা।

কি রে?

ভাবীর ছেলে হবে।

ছেলে হবে মানে?

নার্সিংহোমে রেখে এলাম।

ও।

তুমি এমন ভাব করছো যেনো জানোই না কিছু। আমি না কদিন আগে তোমাকে বললাম।

বাবা চুপ করে থাকেন। দেখে জরি একটু রেগে যায়। কথা বলছো না কেন?

কি বলবো?

কি বলবে মানে! টাকা পয়সা লাগবে না? ভাইয়ার চাকরিটাও তো গেছে।
বাবা হঠাৎ খুব রেগে যান। আমার ইচ্ছে মতো কিছু হয়েছে? আমি টাকা দেবো কেন?
বাবা তুমি এখন আর ওসব কথা বলো না। ভাইয়ার এই বিপদের সময়
বিপদ নিজে ডেকে আনলে কার কি করার থাকে?
এ কথায় জরির খুব অভিমান হয়। গলা ভারি করে বলে, ঠিক আছে তোমার কিছু করতে হবে না।
জরি দরোজার দিকে পা বাড়ায়। বাবা ডাকেন, শোন।
কি?
কোন নার্সিংহোমে আছে?
এলিফেন্ট রোডে
তুই গিয়েছিলি?
হ্যাঁ। আমিই তো নার্সিংহোমে নিয়ে গেলাম। ভাইয়াটা যে কি! কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই। দিব্যি অফিসে চলে গেছে। আমি হঠাৎ গেছি ভাবীকে দেখতে। গিয়ে দেখি মুখ টুখ কালো করে শুয়ে আছে। জিজ্ঞেস করতেই বললো, ব্যথা হচ্ছে। জোর করে নার্সিংহোমে নিয়ে গেলাম। ডাক্তার বললেন দু একদিনের মধ্যেই
ঝি এসে এমন সময় হরলিকসের গ্লাস রেখে যায়! বাবা সেদিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তারপর উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। জাকির ছেলে হবে, বহুকাল পর সংসারে একজন আসছে। কি যে সুখের দিন! এ দিন আমার আনন্দ কে দেখতো! কিন্তু জাকি যে কি করলো!
এখন আর ওসব বলে কি হবে। তুমি ভাইয়াকে কিছু টাকা দাও।
ওকি আমার টাকা নেবে?
নেবে না কেন? আমি ম্যানেজ করবো।
ঠিক আছে টাকা যা লাগে তুই নিয়ে যাস।
এ কথায় জরি যে কি খুশি হয়! বলে, বাবা তুমি আসলে খুব ভালো। ভাবীকে দেখতে যাবে না?
বাবা একটা দীর্ঘ শ্বাস ফেলেন। যাবো। যেতে তো হবেই!

নার্সিংহোমের বেডে শুয়ে আছে টুই। জাকি টুল নিয়ে বসে আছে ওর সামনে। টুইর মুখটা খুব শুকনো। চোখের কোণে কালি, চেহারা বিষণ্ন দেখাচ্ছে।
জাকি বললো, আমার ছেলে কিন্তু ঠিক আমার মতো হবে দেখতে।

টুই কথাটা গ্রাহ্য না করে জাকির ডান হাতের দিকে তাকালো। ছোট্ট ব্যাণ্ডেজ বাঁধা জাকির হাতে। দেখে বললো, তোমার হাতে কি হয়েছে?
জাকি লজ্জা পেয়ে বললো, কিছু না। হাতটা লুকোতে চেষ্টা করলো।
টুই ক্লান্ত গলায় বললো, আমাকে বলবে না?
জাকি এবার একটু হাসে। রান্না করতে গিয়েছিলাম।
কে যে তোমাকে ওসব করতে বলেছে!
কি করবো, হোটেলে খেতে আমার ভাল্লাগে না।
টুই ম্লান হাসে। বিকেলে মা আসবেন। তাঁকে বলে দেবো তোমার খাবার পাঠিয়ে দিতে।
দরকার নেই ওসবের।
আমি বাড়ি নেই, তোমার খুব কষ্ট হয় না?
হয় না মানে! কাল রাতে একটুও ঘুমুতে পারিনি। বারবার তোমাকে আকড়ে ধরতে গেছি, হাতটা ফিরে এসেছে। কি যে খারাপ লেগেছে!
টুই উদাস গলায় বললো, আমি যদি আর কোনোদিন তোমার কাছে ফিরে যেতে না পারি!
জাকি শক খাওয়ার মতো চমকে ওঠে। তারপর অপলক তাকিয়ে থাকে টুইর মুখের দিকে। খানিক পর বলে, তাহলে আমি মরে যাবো।
যা বউর জন্যে কেউ মরে নাকি!
মরে। ভালোবাসা থাকলে সব হয়।
এ সময় হাসতে হাসতে জরি ঢোকে। ঢুকেই জাকিকে দেখে রেগে যায়। এই বেরো, বেরো। এখানে ছেলেদের থাকতে নেই।
জাকি উঠে দাঁড়ায়। যাচ্ছি।
জরি বললো, শোন। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে অনেকগুলো টাকা বের করে। নে।
জাকি নেয় না! বলে, তোর কাছেই থাক। যা লাগে খরচ করিস।
আমি সারাক্ষণ থাকবো নাকি!
থাক না, আমার আর কে আছে!
হয়েছে। যা ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করগে।
জাকি বেরিয়ে যায়। জরি গিয়ে বসে টুইর সামনে। খুশি খুশি গলায় বলে, ভাবী ছেলে নিয়ে কিন্তু এবার সোজা আমাদের বাসায়। বাবা তোমাকে নিতে আসবেন।
টুই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আমার বড়ো ভয় করে জরি।

ডাক্তার বললেন, আপনি অঁতো নার্ভাস হচ্ছেন কেন?
জাকি বললো, আমার কেমন যেনো লাগছে। এতো লেট হচ্ছে কেন?

অনেকের এ রকম হয়।
একজন নার্স এসে তখন ডাক্তারের কানে কানে কিছু বলে যায়। ডাক্তার ওঠেন। জাকি গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। অন্যমনে দাঁড়িয়ে থাকে। পেছন থেকে মুকুল এসে ওর কাঁধে হাত রাখে। জাকি চমকে ওঠে। তারপর মুকুলকে দেখে শ্বাস ফেলে।
মুকুল বললো, কি খবর দোস্ত?
খবর নেই।
তোর ছেলে হলে আমি একটা পার্টি দেবো।
আমার ভাল্লাগছে না দোস্ত।
এ সময় কারোরই ভাল্লাগে না। নে সিগারেট খা।
মুকুল রোথম্যানের প্যাকেট বের করে। জাকি সিগারেট নিতে নিতে মুকুলের মুখের দিকে তাকায়। মুকুলের ফ্রেঞ্চকাট নেই। ক্লিন সেভড। দেখে জাকি হাসে। জিওগ্রাফি চেঞ্জ করেছিস আবার?
কি করবো! একটা কিছু নিয়ে তো মেতে থাকতে হবে। তুই তো আছিস বউ নিয়ে।
বউ নিয়ে কতো ঘাপলা দেখছিস না?
তোর বাবার খবর কি?
বাবা ঠিক হয়ে গেছেন। বলেছেন টুইকে দেখতে আসবেন। বাচ্চা হয়ে গেলে টুইকে নিয়ে যাবেন আমাদের বাসায়।

গুড। ভেরি গুড।
বাবা বোধহয় টাকা পয়সাও পাঠিয়েছেন। জরি আমাকে অনেকগুলো টাকা সাধলো। বুঝলাম টাকাটা বাবাই পাঠিয়েছেন। জরির হাতে তো অতো টাকা থাকার কথা নয়। জরি অবশ্য আমাকে বলেনি।
কেন, বললো না কেন?
ভেবেছে বাবার কথা বললে আমি যদি টাকাটা না নিই। কিন্তু আমি কি আর এখন ওসব ধান্দায় আছি। আমি আছি টুইর চিন্তায়। বড়ো ভয় করছে দোস্ত। টুই যদি
ফালতু প্যাচাল পারিসনে। দুনিয়াতে আর কারো বাচ্চা হয় না!
তুই বুঝবি না দোস্ত। আমার বুকের ভেতর কেমন করছে।
বাচ্চার মুখ দেখলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
জাকি একটু হাসে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
টুইর সঙ্গে আমার একটা বাজি চলছে জানিস?
মুকুল ভ্রুকুচকে বললো, কিসের বাজি?
যদি টুই আমাকে বেশি ভালোবাসে তাহলে টুই আগে মরে যাবে। আর যদি আমি
শুনে মুকুল গলা খুলে হেসে ওঠে। বেশ আছিস তোরা দোস্ত।

জাকি মন খারাপ করে বললো, তুই হাসছিস? আমার কিন্তু বাজির কথাটা খুব মনে পড়ছে।
রাখ ওসব ফালতু চিন্তা।
তখন জরি বেরিয়ে এসে বললো, ভাইয়া তুই একটু ভাবীর কাছে বোস। ভাবী ঘুমুচ্ছে। এই ফাঁকে আমি একটু বাড়ি থেকে আসি। তারপর মুকুলের দিকে তাকিয়ে বললো, মুকুল ভাই তোমার হেলিকপ্টারটা আছে?
রেস্টে আছে।
কোথায়?
নিচে।
জাকি বললো, তাহলে তুইই জরিকে নিয়ে যা না দোস্ত। যাবি আর আসবি।
ও কে।
লেট করিস না।
জরি বললো, না যাবো আসবো।
ওরা দুজন লম্বা বারান্দা পেরিয়ে চলে গেলো। জাকি গিয়ে ঢুকলো টুইর রুমে। ঢুকে টুইর সামনে বসলো। টুই চোখ বুজে পড়ে আছে। জাকি ডাকে, বউ ও বউ, ঘুমুচ্ছো?
টুই চোখ মেলে। তারপর অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে জাকির দিকে। চোখ দুটো কেমন উজ্জ্বল দেখায়।
জাকি বললো, কষ্ট হচ্ছে?
না। একটা স্বপ্ন দেখলাম। সুন্দর একটা বাগান। কি যে বিশাল! কতো যে ফুল ফুটে আছে! বাগানের শেষে বাংলো প্যাটার্নের সুন্দর একটা নীল বাড়ি। আমি সেই বাড়িটার দিকে হেঁটে যাচ্ছি।
একা?
হ্যাঁ।
আমাকে নিলে না?
টুই দুহাতে জাকির একটা হাত আঁকড়ে ধরে। তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না।
একথায় জাকির বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে ওঠে। টুইর গলার কাছে মুখ গুজে হু হু করে কেঁদে ফেলে জাকি। টুই দুহাতে জাকির গলা জড়িয়ে রাখে। তুমি কাঁদছো কেন? কেঁদো না। কাঁদলে ভালোবাসা গভীর হয়ে যায়। আমাদের বিয়ের অনেক আগে, এক দুপুরে, আমাদের খুব একটা সুন্দর মুহূর্তে তুমি আমার বুকে মুখ রেখে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিলে। কেন যে কেঁদেছিলে। সেই কান্না আমি কোনোদিন ভুলতে পারিনি। আর কেঁদো না। আমি সইতে পারি না।
জাকি কথা বলে না। কাঁদে, কেবল কাঁদে।

নার্সিংহোমের বারান্দায় জাকি পায়চারি করছে। চেহারায় চাপা উত্তেজনা থমথম করছে। টুইর রুমের দরজা বন্ধ। ভেতরে ডাক্তার নার্সদের কথাটথা শোনা যায়। জাকি ওসব খেয়াল করতে চাইছে না। তবুও বারবার আনমনা হয়ে যাচ্ছে সে। কান খাড়া করছে ঘরের ভেতর থেকে কোনো শব্দ পাওয়ার জন্য।

এ সময় ধীর পায়ে বাবা এসে দাঁড়ালেন ওর পাশে। জাকি এতো বেশি মগ্ন ছিলো, বাবার আগমন টের পেলো না।

কাছে এসে বাবা ডাকলেন, জাকি।

জাকি চমকে ওঠে। তারপর বাবাকে দেখে হঠাৎ বেশ সাহসী হয়ে ওঠে। বাবা, বাবা তুমি

বাবা জাকির দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি অতো নার্ভাস হচ্ছো কেন? সব ঠিক হয়ে যাবে।

বাবা, ডকটর বললেন প্যাসেন্টের অবস্থা সিরিয়াস।

ও কিছু না। ডাক্তাররা অমন বলেন।

জাকি বাবাকে বন্ধু ভেবে বলে ফেললো, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাবা।

বাবা একটা হাত তুলে জাকির কাঁধে চাপ দিলেন। সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

তারপর একটু থেমে বলেন, জরি কই?

আছে কোথাও। বাবা

আমি তো তোমার সামনেই আছি! অতো ভয় পাচ্ছো কেন?

বাবা তুমি এখনো আমার ওপর রাগ করে আছো?

নারে বোকা! তাহলে কি আর তোমাদের দেখতে আসতাম!

তুমি আমাকে মাফ করে দিও বাবা।

তক্ষুণি টুইর ঘরের দরোজা খুলে গেলো। ডাক্তার আর দুজন নার্স বেরিয়ে এলো। জাকি পাগলের মতো ডাক্তারের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ডকটর, কি খবর?

ডাক্তারের চেহারায় এক ধরনের হতাশা। প্রথমে কোনো কথা বললেন না তিনি।

জাকি বললো, কি ব্যাপার ডকটর?

ডাক্তার ভারি গলায় বললেন, আপনার একটা ছেলে হয়েছিলো!

হয়েছিলো?

বাবা এগিয়ে এসে বললেন, বউমা কেমন আছে?

ডাক্তার হতাশ গলায় বললেন, সরি একজনকেও

শুনেই জাকি পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলো। টুই, আমার টুই।

তারপর দৌড়ে গিয়ে ঢুকলো টুইর রুমে।

নার্সিংহোমের বারান্দায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। জাকি মুকুল বাবা জরি আর টুইর মা, দুভাই। আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদছে জরি। টুইর মা আর ভাইদের চোখ মুখ ফুলে গেছে। মুকুল জাকির বাবার সামনেই সিগারেট টানছে। জাকির চেহারা হেরে যাওয়া খেলোয়াড়ের মতো ক্লান্ত, ভাঙাচোরা।
হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা গলায় জাকি বললো, তুমিই জিতে গেলে বাবা।
শুনে বাবা একটু থতোমতো খেয়ে যান। অস্থির গলায় বলেন, জাকি মাই সান, এ আমি চাইনি। ভুলটা শুধরে নিতে এসেছিলাম। অঘটন ঘটে গেলো। ইটস এন অ্যাকসিডেন্ট। এ আমি চাইনি। তুমি যাকে ভালোবাসো আমিও তাকে ভালোবাসি। কেবল একটু অভিমান।
মুকুল এগিয়ে এসে বললো, এখন ওসব বলে কি লাভ?
জরি মুখ মুছতে মুছতে এসে জাকির হাত ধরলো। বাড়ি চলো ভাইয়া।
জাকি সে রকম ঠাণ্ডা স্বরে বললো, না। ওখানে ফিরে গিয়ে কি করবো! যার জন্যে আমি তোদের ছেড়ে এসেছিলাম, তার জন্যেই আবার তোদের ছেড়ে যাচ্ছি।
মুকুল বললো, পাগলামো করিস নে।
জাকি একটু থেমে থাকে। তারপর বলে, আমি বারবার কেন হেরে যাই দোস্ত। টুইর সঙ্গে আমার একটা বাজি ছিলো। টুই জিতে গেলো।

কথাটা বলে জাকি দুহাতে মুখ ঢাকে। নিঃশব্দে একটু কাঁদে। বাবা এসে ওর কাঁধে হাত রাখেন।
জাকি নিজেকে সামলে নেয়। বাবা, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। হয়তো বা কোনোদিন তোমার কাছে আমি ফিরে যাবো।
জরি সামনে ছিলো। জাকি শান্তভাবে ওর কাঁধে হাত রাখে। লক্ষ্মী আপু, কাঁদিসনে।
তারপর আর কোনো কথা না বলে, কোনোদিকে না তাকিয়ে লম্বা বারান্দা ভেঙে হেটে যায় জাকি। পেছনে জরি কাঁদে। ডুকরে ডুকরে কাঁদে।
বাবা আস্তে করে বলেন, মে গড ব্লেজ ইউ মাই সান।

নার্সিংহোম থেকে বেরিয়ে জাকি নির্জন একটা রাস্তায় পড়ে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাইরের পৃথিবীতে মিষ্টি একটা হাওয়া। জাকির একটু শীত করে। বুকের কাছের বোতামটা লাগিয়ে দেয় জাকি। শার্টের কলারটা ঠিক করে। তারপর পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের প্যাকেটা বের করে।

লাইটার বের করে। লাইটারের সঙ্গে উঠে আসে বাচ্চু ভাইর অফিসের চাবি। চাবিটা অন্ধকারের দিকে ছুঁড়ে ফেলে জাকি। সিগারেট ধরায়। তারপর খা-খা নির্জন রাস্তা দিয়ে সিগারেট টানতে টানতে হেঁটে যায় জাকি। ওকে একসময় চড়ুই পাখির মতো ছোট দেখায়।

১৯৭৭

কিছু দুঃখ

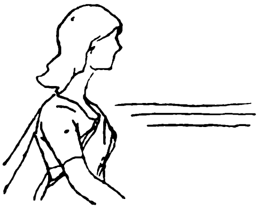

ক্লাশ থেকে বেরিয়ে সামনের রেলিংয়ে দেখি লোক দুটো দাঁড়িয়ে। কাল বাড়ি থেকে বেরুনোর সময়ও দেখেছি। পান দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে। দুজনই। একজন একটু লম্বা মতন আরেকজন তার তুলনায় ইঞ্চিখানেক ছোট। সুন্দর জামা-কাপড় পরা। দেখতে বেশ। আমি রিকশা ঠিক করার ফাঁকে ফাঁকে দেখি দুজনেই আমার দিকে তাকিয়ে। লম্বাজন কি বললো, সঙ্গের লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে। দেখে আমি চমকে উঠি। কি ব্যাপার, ওরা কি আমাকে ফলো করছে!

বুকের ভেতরটা বড়ো কাঁপে। রিকশা করে সোজা চলে আসি ইউনিভার্সিটিতে। একটা ভয়, একটা উৎকণ্ঠা বুকের ভেতর লেগে থাকে। আমার বিয়ে টিয়ের কথা হচ্ছে। এ সময় কিছু একটা ঘটে গেলে মান যাবে। আমাদের ফ্যামিলিটা খুব ব্যাকডেটেড। প্রেম ফ্রেমের কথা শুনলে বাবা হার্ট ফেল করবে। মা ঝাড়ু দিয়ে পেটাবে। বড়ো সাংঘাতিক মহিলা। জাঁদরেল। আমার বন্ধুরা বলে দারোগা।

আমি ফ্যামিলির একমাত্র মেয়ে। দুভাইয়ের একজন প্রেম করে বিয়ে করেছে। বাবা তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলো, এখন বউ নিয়ে রাজশাহী থাকে। কি চাকরি বাকরি করে কে জানে। চিঠিপত্রের যোগাযোগও নেই। ওর জন্যে আমার খুব কষ্ট হয়। আমার ইমিডিয়েট বড়ো। পিঠেপিঠি ভাইবোন। আর একটা তো আমার অনেক ছোট। ফাস্ট ইয়ারে পড়ে। আর্টস। ড্রেসফ্রেস দেখে ওকে কেউ ১৯৭৯ সালের ইয়াং ছেলে বলবে না। আজকালকার ছেলেরা সব লম্বা চুল রাখে। জিনসের জামা কাপড় পরে। প্যান্ট শার্টে স্টিকার লাগায়। খোকা ওসবের ধারে কাছে নেই।

একবার খোকার চুল একটু লম্বা হয়েছিলো। দেখে বাবার সেকি গালাগাল। মা বললো, এক্ষুণি চুল কেটে আয়। টাকা গুঁজে দিলো হাতে। খোকা মাত্র কলেজে ভর্তি হয়েছে। সব ছেলেদের লম্বা চুল দেখে ওরও ইচ্ছে হয়েছে। আমি বুঝতে পারি। কিন্তু বুঝতে পেরে কি লাভ! টু শব্দটি করার জো নেই। কিছু বললে আমার ওপরও আসবে ঝড়। ইউনিভার্সিটিতে পড়া বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় পড়াটা বন্ধ হোক আমি চাই না। খোকাকে ডেকে বলি, যা চুল কেটে আয়।

খোকা মন খারাপ করে চলে যায়।

আমার ইউনিভার্সিটিতে পড়া নিয়েও কি কথা কম হয়! মেয়েমানু-ষের অতো লেখাপড়ার কি দরকার! কোন জজ ব্যারিস্টার হবে! কথাগুলো রোজই একবার দুবার বলে মা। লেখাপড়া বাদ দিয়ে ঘরকন্নার কাজ করো। রান্নাবান্নাটা শেখো ভালো করে। কাজের কাজ হবে, পয়সাও বাঁচবে।

আমি সব শুনে যাই। কথা বলি না।

বাড়ি থাকলে মার সঙ্গে কাজ টাজ করি। মেয়েদের আবার রান্নাবান্না শিখতে হয় নাকি! পারিই তো সব। ঈদে, সবেবরাতে আমিই তো করি রান্নাবান্না। গেস্ট টেস্ট এলেও তো। হাতের কাজও পারি। উল বোনা, জামা কাপড় বানানো। কোরান শরিফ পড়া শিখেছি সাত আট বছর বয়সে। নামাজও।

লেখাপড়ায় মোটামুটি ছিলাম বলে স্কুল কলেজ ডিঙিয়ে এসেছি সহজে। ম্যাট্রিক পাশের পর থেকেই বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে আমার। পাত্রটাত্র বাবার পছন্দ হয় না। ঘটক আসে, ঘটক যায়। পাত্রের চেহারা পছন্দ হয় তো বংশ পছন্দ হয় না। বংশ পছন্দ হয় তো চাকরি পছন্দ হয় না। এক জায়গায় আবার পাত্রের মা বাবা প্রেম করে বিয়ে করেছিলো শুনে বাবা এগোলো না। এই রকম।

আমি বেকার বসে থাকবো দেখে বাবা কলেজে ভর্তি করিয়ে দিলো।

মা অবশ্য মানা করেছিলো। কিন্তু বাবা তবুও।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

কলেজে যখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, এক জায়গায় বিয়ের কথা পাকা-পাকি হয়ে গেলো। দেখা টেখা শেষ, শুধু দিন তারিখটা হবে। এসময় বড়ো ভাই কাণ্ডটা ঘটালো। গোপনে বিয়ে করে এসে মাকে বললো। মেয়ে-টাকে আমি দেখেছি। ভারি মিষ্টি চেহারার, লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে। ভাইয়া আগেই মাকে বলেছিলো। মা কথাটা নিশ্চয় বাবাকে জানিয়েছিলো। কিন্তু দুজনের একজনও রাজি হয়নি। ভাইয়া আর কি করে। সাহস করে কাজটা করে ফেললো। পুরুষ মানুষ, ভালো চাকরি করে। মা বাবাকে পরোয়া করার ওর এমন কি দরকার!

কিন্তু বাসায় কথাটা জানাজানি হতেই বিচ্ছিরি কাণ্ড। মা বাবা দুজনে সমানে গালাগাল করে বাড়ি থেকে বের করে দিলো। এসব কথা তো আর চাপা থাকে না। আমার পাত্রপক্ষও শুনলো। শুনে কেটে পড়লো। সে একটা ঝড় গেছে, ভাইয়াকে কাছে না পেয়ে আমার আর খোকার ওপর দিয়ে। বাবা এক অফিসের মেজো কর্তা। অফিসে যাওয়ার মুখে পুরো একঘন্টা আমাদের দুজনকে গালাগাল, ফিরে এসে আবার। আর মা তো আছেই। এক মিনিটের জন্যেও, থামে না তার মুখ। আল্লা যে কোত্থেকে এ দুজনকে একত্রে মিলিয়েছিলো!

খোকা সারাদিন মন খারাপ করে থাকে। মরার মতো স্কুলে যায়, ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে একটাও কথা বলে না। আর আমার তো কলেজ যাওয়াই বন্ধ। বাড়ি বসে মার গালাগাল শুনি আর লুকিয়ে চুরিয়ে কাঁদি।

মাস দুয়েক পর ব্যাপারটা মিইয়ে যায়। আমি আবার কলেজে যেতে থাকি। পরীক্ষা দিয়ে পাশও করে ফেলি। ভাইয়ার কথা ভুলেও উচ্চারণ করে না কেউ। এর মধ্যে বাবা একদিন কোর্টে গিয়ে, আমাদের জায়গা সম্পত্তি থেকে ভাইয়া যাতে কিছু না পায় সে ব্যবস্থা করে এলো। মা বললো, ঠিক করেছো। শুনে সারা রাত আমি কেঁদেছিলাম।

আমার ইউনিভার্সিটি ভর্তি হওয়া নিয়ে আরেক বিচ্ছিরি ব্যাপার হলো। মা বাবা কিছুতেই রাজি নয়। বিয়েথাও ঠিক হচ্ছে না, আমি কি এখন বসে বসে ঘোড়ার ঘাস কাটবো!

ছোট চাচার বাসায় বেড়াতে গিয়ে চাচা চাচীকে খুব করে পটালাম। এদের দুজনকে আমার মা বাবা খুব দাম দেয়। পরের রোববার চাচা চাচী দুজনে এসে মা বাবাকে রাজি করিয়ে গেলো।

ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে আমি বুক ভরে শ্বাস নিই। আবার একটা কোনো কাজ পাওয়া গেলো। তখন মা বাবা পাগল হয়ে আমার বিয়ের চেষ্টা শুরু করেছে। রোজ সকাল বিকেল ঘটক আসে। কি যে চেহারা সুরৎ একেক জনের। গা জ্বলে যায়। কিন্তু কি করা, কথা বলার উপায় নেই। চায়ের পর চা করে খাওয়াতে হয় আমাকেই।

কদিন হলো শুনছি এক জায়গায় কথাটথা পাকা হয়ে গেছে। আমার ছবি দেখে পাত্রপক্ষ পছন্দ করেছে। কাল রাতে মা বললো, ওরা আগামী রোববার আসবে। তোকে দেখেই পাকা কথা দিয়ে যাবে।

শুনে আমার বুক কাঁপে। কাল রাতে একটুও ঘুম হয়নি। কতো কি যে মনে হয়। লোকটা কেমন হবে দেখতে! মনটা কেমন! আমাকে ভালোবাসবে তো!

এর আগে আমি কখনো এমন করে ভাবিনি। আরো তো কতোবার দেখাশুনা হলো। পাকা কথা হতে হতে হয় না। এবার কেন যে মনে হয়, আর পার পাওয়া যাবে না!

বুকটা কাঁপে।
মা বললো, ছেলেটা ভালো। দেখতে শুনতেও ভালো। এম এ পাশ। ভালো চাকরি করে। দেড় হাজার টাকা মাইনে। চার ভাইবোনের মধ্যে এই সবচে ছোট। কোনো ডিমাণ্ড নেই।
ডিমাণ্ড নেই শুনে আমি বুঝি, এবার হবেই। ডিমাণ্ড থাকলে মা বাবা দুজনেই খুব চিন্তা ভাবনা করতো। আমাদের যে অবস্থা খুব খারাপ, এমন নয়। বাবা ভলো চাকরি করে, ঢাকায় নিজের বাড়ি। গ্রামের বাড়িতে ম্যালা জায়গা জমি। বছরের খাওয়ার ধান আসে। পাট গোলআলু বেচে আট দশ হাজার আসে নগদ। কিন্তু মা বাবা দুজনেই হাড়কিপ্টে। টিপে টিপে পয়সা খরচ করে। রিকশা ভাড়ার বাইরে একটা পয়সাও দেয় না আমাকে। খোকাকেও। একটা বাড়তি শার্ট নেই খোকার, একটা বাড়তি শাড়ি নেই আমার।
এসব ভাবছি, তখুনি চমকে উঠি। কালকের দেখা লোক দুটো রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কি চায় ওরা? আমার পিছু নিয়েছে কেন?
বুকের ভেতরটা কাঁপে। লোক দুটোর দিকে একপলক তাকিয়ে সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত নেমে যাই। লম্বা মতন লোকটা দেখতে বেশ। পুরুষালী চেহারা, ফিগার। চুলগুলো কোকড়ানো, লম্বা। সিগারেট খাচ্ছিলো, কি সুন্দর যে লাগে দেখতে। এক পলকে আমি সব দেখে নিয়েছি। মেয়েরা খুব দ্রুত একজনকে পুরোপুরি দেখে নিতে পারে। লোকটা কিন্তু আমার দিকে বেশি একটা তাকাচ্ছিলো না। সঙ্গেরটা তাকিয়ে ছিলো হা করে। দেখে আমার খুব ভয় লাগে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবি আমার বর যদি ঐ লম্বা লোকটার মতো হয় দেখতে। তাহলে আমি খুব খুশি হবো।

ফেরার পথে রিকশায় বসে আমি আবার লোক দুটোর কথা ভাবি। কি চায় ওরা? প্রেম? ভেবে একা একাই হেসে ফেলি। হবে না। আমার সাহস নেই। বাবা জবাই করে ফেলবে। সম্ভব হলে আমি লম্বা লোকটাকে ভালোবাসতাম। বিয়ে করতাম।
স্কুলে পড়ার সময়ও একটা ছেলে আমার পিছু নিয়েছিলো। স্কুল টাইমে রাস্তায় খুব ঘোরাঘুরি করতো। একটু মাস্তান টাইপের। আমার পছন্দ হতো না। পুরো এক বছর ঘুরে ছেলেটা আমার আশা ছাড়লো। পরে প্রেম করলো আমার এক ক্লাশমেটের সঙ্গে। মেয়েটা যখন ক্লাশ টেনে পড়ে তখন ওদের বিয়ে হলো। দুবাড়ি থেকেই মেনে নিয়েছিলো। কতোকাল ওদের সঙ্গে দেখা হয় না। ওরা এখন কেমন আছে?
কলেজে পড়ার সময় এক বান্ধবীর ভাইয়ের সঙ্গে আমার খানিকটা জমে উঠেছিলো। ছেলেটা একদিন স্ট্রেট বললো, ভালোবাসি।

শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিলো। সেই প্রথম এবং শেষ আমি পুরুষ মানুষের গলায় শুনেছিলাম, ভালোবাসি।

আমিও ওকে ভালোবাসতে পারতাম। ছেলেটা মন্দ ছিলো না। বি এ ফেল। দুবার পরীক্ষা দিয়েছে। তখন বেকার। বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়। মা বাবা তো রাজি হবেই না। শুনলে আমাকে কোতল করে ফেলবে।

সেই ছেলেটা, ফরিদ, ওর সঙ্গে আমি আর কখনো দেখা করিনি। পরে শুনেছি, ফরিদ এখন ওয়েস্ট জার্মানীতে। হোটেলে চাকরি করে। আমার জন্য কি ও দেশ ছেড়ে গেলো! আর কখনো ফিরবে না!

ফরিদের জন্য আমার একটু কষ্ট হয়।

ইউনিভার্সিটিতে আমার সব বন্ধুরাই প্রেম ফ্রেম করে। ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। সিনেমা দেখে, আড্ডা মারে। দুএকজন গোপনে বিয়ে করে ফেলেছে। শুনে আমি কেঁপে উঠি। ভালোও লাগে। ওদের স্বাধীনতা আমাকে জ্বালায়। আমি কেন এমন ফ্যামিলিতে জন্মালাম! আমার বন্ধু জরি অনেকদিন ক্লাসে আসে না দেখে আমি মুনিয়াকে জরির কথা জিজ্ঞেস করি। মুনিয়া অবাক হয়ে বলে, তুই কিছু জানিস না?

না তো!

জরির কদিন আগে এবরসন হয়েছে।

শুনে আমি ভয়ে লজ্জায় মরে যাই। মাগো, কি সাহস!

ঢোক গিলে বলি, কার সঙ্গে?

আমাদের পাণ্ডা।

পাণ্ডা কে?

পাণ্ডাকে চিনিস না! ওই যে, দৈত্যের মতন দেখতে। কিরণ। ওকেই তো আমরা পাণ্ডা বলি।

আমার ততোক্ষণে হাত পা ঠাণ্ডা হওয়ার মতো। থতমত খেয়ে চলে আসি। কিন্তু জরিকে আমার একটুও ঘেন্না করতে ইচ্ছে করে না! খারাপ কি করেছে! ভালোবেসে একজনকে নিজের সব প্রেজেন্ট করেছে। আমি এসব পারিনি! সে আমার ভাগ্য। ইচ্ছে মতন কাউকে ভালোবাসার, বিয়ে করার ক্ষমতা আমার নেই।

এসব ভেবে আমি ঐ লোক দুটোর উদ্দেশ্যে মনে মনে বলি, তোমরা ভুল জায়গায় এসেছো। ভুল ঠিকানায়।

রোববার বিকেলবেলা পাত্রপক্ষের লোকজন আসে। ছেলের বাবা আর দুচারজন আত্মীয় স্বজন। ছোট চাচী আমাকে টুকটুকে লাল একটা শাড়ি পরিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে।

ড্রয়িংরুমে ঢুকে আমি হাত তুলে নরম ভঙিতে সালাম দিই। এখানেই বসেছিলো সবাই।

আমাকে দেখেই ছেলের মা উঠে এলেন। কাছে এসে আমার চিবুক ধরে বললেন, তাকাও তো মা।

আমি মাথা নিচু করে বসেছিলাম। ঘোমটা দেয়া। ঘোমটা দিতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। তবুও দিতে হয়। নিয়ম। তাছাড়া আমি তো এমনিতেই ঘোমটা টোমটা দিয়ে চলি। বন্ধুরা এই নিয়ে কতো কথা বলে! হাসে। কিন্তু উপায় কি! ঘোমটা না দিয়ে বাড়ি থেকে বেরুলে মা গাল পেড়ে ধুয়ে দেবে।

আজকাল আজান শুনেও অনেক মেয়ে ঘোমটা দেয় না। ফ্যাশান হয়ে গেছে। আর কতো রকমের যে ড্রেস পরে। শার্ট প্যান্ট মেক্সি জ্যাকেট পাঞ্জাবী। অনেকে ছেলেদের মতন চুল কাটায়। ভ্রু তোলে। আমারও ইচ্ছে করে। কিন্তু ঐ ইচ্ছে পর্যন্তই।

ভদ্র মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি মা?

আমি আস্তে করে বলি, শায়লা।

বুড়ো মতন ভদ্রলোক, ছেলের বাবা নিশ্চয়, বললেন, শায়লা কি?

শায়লা খোন্দকার।

এসব কি ওঁরা আগেই জানেন নি! জেনেছেন নিশ্চয়। তবুও জিজ্ঞেস করেন।

আমি চুপচাপ বসে থাকি। হঠাৎ করে চোখ যায় সামনের সোফায়। একজন বসে আছে। দেখেই চমকে উঠি। লম্বা মতন সেই লোকটা। একদিন আমাদের বাড়ির সামনে দেখেছি। আর একদিন ইউনিভার্সিটিতে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

কে, লোকটা কে?

আমার ভীষণ জানতে ইচ্ছে করে। তারপর একটা কথা ভেবে বুকের ভেতরটা খুশিতে দুলে ওঠে। বর কি নিজেও মা বাবার সঙ্গে আমাকে দেখতে এসেছে!

কদিন ধরে দুজন লোক আমাকে ফলো করছে। তার একজন এই লোক। লোকটাকে দেখে আমার ভালো লেগেছিলো। দেখতে বেশ। মনে মনে চেয়েছি আমার বর যেনো এরকম হয়। এখন দেখছি, যা চেয়েছি, জীবনে এই প্রথম তা পেতে যাচ্ছি। আ কি যে ভালো লাগে। কিন্তু সে একবারও আমার দিকে তাকাচ্ছে না কেন? কি ভাবছে! আমাকে কি তার পছন্দ নয়!

সন্ধ্যের মুখে ওরা ওঠে। যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে বিয়ের দিন তারিখ ঠিক করে যায়। আগামী মাসের সাত তারিখে। শুনে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এতোদিনে একটা হিল্লে হলো।

রাতের বেলা বিছানায় শুয়ে কিছুতেই আমার ঘুম আসে না। কতো কি যে মনে পড়ে! লোকট্যাকে আমার খুব পছন্দ। একপলক দেখেই মুগ্ধ হয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারি কদিন ধরে ওরা আমাকে ফলো করছিলো কেন। আসলে দেখে নিলো স্নো পাউডার না মেখে আমি কেমন দেখতে। আমার কোথাও লাইন টাইন আছে কিনা!
ভেবে হাসি পায়। তারপর আবার মনে হয় লোকটার কি আমাকে পছন্দ হয়েছে। তাহলে অমন উদাস ছিলো কেন? একবারও তো ভালো করে আমার দিকে তাকায়নি। ইউনিভার্সিটিতেও দেখেছি, সঙ্গের লোকটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। সে তাকায়নি একবারও। অন্যদিকে তাকিয়ে সিগারেট টেনেছে। কি সুন্দর যে লাগছিলো দেখতে!
মনের ভেতর একটা কাঁটা বিঁধে থাকে। হাসফাস করি। ঘুম আসে না। বাসররাতে লোকটা আমাকে প্রথম কি কথা বলবে? সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতো ঘরে ঢুকেই কি দুহাত বাড়িয়ে দেবে! জড়িয়ে ধরে প্রথমে কি করবে? চুমু?
সারাটা শরীর অবশ হয়ে আসে আমার। আবেশে চোখ বুজে আসে। কি লজ্জা!
শুনেছি ভালো ছেলেরা প্রথম দিন বেশি কিছু করে না। আস্তে ধীরে, দু'চারদিন পর। ডালিয়ার বর নাকি পুরো এক মাস নিয়েছিলো। ইস কি সব ভাবছি। মাথাটা দপদপ করে। উঠে বাথরুমে যাই। চোখ মুখে জল দিয়ে আসি। চোখ টানছে। ঘুম আসবে।
ঘুমিয়ে পড়ার আগে আমি মনে মনে বলি, ওগো তোমাকে যেনো একবার স্বপ্ন দেখি।

বিয়ের দিন সানাই বাজে না। বড়ো রকমের কোনো উৎসব নয়। খুব ঘরোয়াভাবে বিয়ে হচ্ছে। বাবা টাকা খরচ করতে চান না। আমি ভেবেছিলাম খুব জাঁকজমক হবে। বড়ো ছেলের বিয়ে তো আর বাবাকে দিতে হয়নি! খোকার বিয়ে, সে অনেক দিনের ব্যাপার। আমি একমাত্র মেয়ে। বাবার টাকা পয়সা আছে। কিন্তু খরচ করবে না। হাড়কিপ্টে। আমার বর এসব ব্যাপারে কেমন হবে! বাবার মতো! ইস তাহলে আমি মরে যাবো।
লোকটাকে দেখে কিন্তু কিপ্টে মনে হয়নি। দামি সিগারেট খায়। কাপড় চোপড় দেখে মনে হয় বেশ খরচের হাত। আল্লা, তাই যেন হয়।
বিয়েতে আমার বন্ধু এসেছে দুজন। মুনিয়া আর কোয়েল। আর কাউকে বলিনি। জরিকে বলতে চেয়েছিলাম। বলা হয়নি। বললে

কি ও আসতো! ও অনেকদিন ক্লাশে আসে না। শরীর তো সেরেই গেছে। জরি লজ্জায় আসতো না। কথাটা জানাজানি হয়ে গিয়েছিলো। যাকগে ওসবের জন্যে আমার কোনো দুঃখ নেই। বিয়ের পর বরকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সবার সঙ্গে দেখা করবো। তখন তো আর কোনো বাঁধা থাকবে না। ওকে আমি আমার ইচ্ছে মতো তৈরি করে নেবো।

শুভদৃষ্টির সময় আমি চমকে উঠি। এতো সেই লোক নয়। সঙ্গের লোকটা। বেটে মতো, দেখতে বিচ্ছিরি। ওমা, কেমন হা করে তাকিয়ে আছে! দেখে আমার বুকের ভেতরটা মুচড়াতে থাকে। এর জন্যে তো আমি আমাকে প্রস্তুত করিনি। এর কথা তো ভুলেও একবার ভাবিনি। তাহলে?

আমার ইচ্ছে করে লাফিয়ে উঠে যাই। লাথি মেরে ভেঙে দিই সব আয়োজন। গয়না টয়না খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিই। লাল শিফনে আগুন লাগিয়ে দিই। চিৎকার করে লোকটাকে বলি, তোমাকে আমি চাই না। কিন্তু এসবের কিছুই করা হয় না। সম্ভব নয়। তাহলে আমার আর কখনো বিয়েই হবে না। মা এক্ষুণি ঝাড়ু নিয়ে আসবে পেটাতে। বাবা আসবে গরু জবাই করার ছুরি নিয়ে।

না, জীবনটাই নষ্ট হয়ে গেলো। আমি আমার ভালো লাগার শেষ জিনিসটাও পেলাম না।

আমার কান্না পেতে থাকে। সামলে নিয়ে আড়চোখে বরের পাশে বসা লোকটার দিকে তাকাই। ঐতো সে বসে আছে। আমার স্বপ্নের পুরুষ। লোকটা কে? বরের বন্ধু! মুহূর্তে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। বন্ধুকে নিয়ে বর আমাকে গোপনে দেখতে আসতো। আমি ভুল বুঝে! কি যে হলো! তবুও আমি সব ভুলে যাই। ভুলে ঐ লোকটার দিকেই তাকিয়ে থাকি। বাসর ঘরটা সাজানো হয়েছে খুব সুন্দর করে। খাট ড্রেসিংটেবিল সোফা টেবিলের ওপর ঝকঝকে নতুন জগ, গ্লাস। ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে চারদিক। আমাকে ঘিরে বরপক্ষের সব ছেলে মেয়েরা। কতো রকমের কথা যে বলছে! বেশির ভাগই হাসির। কিন্তু আমার হাসি পায় না। বুকের ভেতরটা কেমন করে। কি যেনো একটা ঘটে গেলো।

আমার খাটের ওপরই একপাশে বসে আছে লোকটা। কথা বলছে খুব কম। সিগারেট খাচ্ছে। টিউব লাইটের শাদা আলোয় তাকে বড়ো সুন্দর দেখায়। আমি আড়চোখে বার বার দেখি। সে আমাকে একবারও না। সে কি কিছু ভাবছে! সে কি একটু উদাস! কেন? আমাকে কি তার ভাল লেগেছিলো!

কথাটা ভেবে বুকের ভেতর হু হু করে ওঠে।

দরোজায় খুট খাট শব্দ। তাকিয়ে দেখি বর। পাজামা পাঞ্জাবি পরা। আমার দিকে পেছন ফিরে দরোজা আটকাচ্ছে। ঘরটা কখন খালি হয়ে গেছে আমি বুঝতেই পারিনি! এতোক্ষণ কি ভেবেছি! ঐ লোকটার কথা!

খানিক পর বর এসে আমার পাশে বসে। একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। লোকটা খুব টায়ার্ড বোঝা যায়। তার দীর্ঘশ্বাসে আমি কি একটু কেঁপে উঠি।

লোকটা আস্তে করে আমার কাঁধে হাত রাখে। আমি কেঁপে উঠি। এই প্রথম একজন পুরুষ আমার কাঁধে হাত রাখলো। পুরুষের প্রথম ছোঁয়া। এরপর লোকটা কি করবে?

সে আস্তে করে আমার চিবুকে হাত দেয়। আলতো করে মুখটা তোলে। আমি তার দিকে তাকাতে পারি না। চোখ বুজে থাকি। সে কি এখন অপলক আমাকে দেখছে!

সে বললো, তুমি সুখী হয়েছো?

শুনে আমি আবার কেঁপে উঠি। একথার আমি কি জবাব দেবো! আমি কি সুখী!

একটা অচেনা লোকের সামনে, জীবনে প্রথম আমি তারপর হু হু করে কাঁদতে থাকি।

১৯৭৯

বলা যায় না

আমার কিছু কথা আছে। কিছু দুঃখ। কাউকে বলতে হয়। কাকে বলবো? এই ভেবে এক সুন্দর সকালে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। একজন কেউ কি নেই, যার কাছে অবলীলায় সব বলা যায়! মনে পড়ে না। মনে পড়ে না। পর পর তিন কাপ চা খাই। পাঁচটা সিগারেট। মনে পড়ে না।

এভাবে সাড়ে দশটার দিকে একজনকে মনে পড়ে। শ্যামা। ওকে ফোন করলে হয়। আমি খুশি হয়ে উঠি। এবং ঠিক এগারোটায় ফোন করি। হ্যালো!

ওপাশে মেয়েলী গলা, কে বলছেন?

শ্যামা আছে? আমার গলাটা একটু একটু কাঁপে।

আপনি কে?
বলবো না। শ্যামাকে দিন।
নাম বলুন না!
শ্যামাকে দিন। আমার গলা ভারি হয়ে যায়।
আশ্চর্য তো, নাম বলুন না!
শ্যামাকে দিন, নয়তো ছেড়ে দেবো।
বলছি। আপনি কে?
নীলু।
নীলুদা! কি আশ্চর্য! নাম বলছিলে না কেন? শ্যামার গলায় মুগ্ধ স্বর।
আমি বলি, তুমি নাম বলছিলে না কেন?
তুমি ফোন করবে, এ আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না। শ্যামা একটু থামে। তারপর বলে, তুমি আমার গলা শুনে বুঝতে পারোনি?
টেলিফোনে সব মেয়ের গলাই এক রকম শোনায়। কি করে বুঝবো?
শ্যামা একটু চুপ করে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করি, কি করছিলে?
কিচ্ছু না।
এরপর আমি আর কথা খুঁজে পাই না। শ্যামাকে কি বলবো? আমার কিছু কথা আছে, কিছু দুঃখ। এই! না, টেলিফোনে বলা যাবে না। আমি অন্য কথা বলি, শ্যামা, কাল রাতে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।
সত্যি?
সত্যি।
বিশ্বেস হচ্ছে না।
রিয়েলি। শ্যামা, তোমাকে আমি
যা!
সত্যি।
তিনবার বলো।
সত্যি সত্যি সত্যি।
শ্যামা আবার একটু চুপ করে থাকে। তারপর বলে, আমি তো তোমাকে সেই কবে থেকে
বিশ্বেস হয় না।
কি করলে হবে?
যদি এক্ষুণি চলে আসতে পারো।
ওমা, কোথায় চলে আসবো?
আমি যেখানে বলবো।
আসতে পারবো না।
তাহলে রাখি।
এই, না। ইস এতো রাগ! এতোদিন কোথায় ছিলো এসব?

আমি কথা বলি না।
কি হলো?
আমি এবারও চুপ।
কথা বলছো না কেন?
আমি আগের মতোই চুপ থাকি।
শ্যামা এবার ভেজা গলায় বলে, আমি কিন্তু কেঁদে ফেলবো।
সোজা চলে এসো।
কোথায়?
রমনা পার্কে।
অতোদূর যেতে আমার ভয় করবে। কাছে কোথাও বলো।
তাহলে ভিকটোরিয়া পার্কে আসো।
আসছি।
কতোক্ষণ লাগবে?
পনেরো বিশ মিনিট।
ঠিক আছে। আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখি।
অথচ শ্যামা এলো প্রায় ঘন্টাখানেক পর। দূর থেকেই আমাকে দেখে হাসলো। আমি কাছে গিয়ে বললাম, এই তোমার পনেরো বিশ মিনিট?
শ্যামা রিকশা থেকে নেমে বললো, একটু দেরি হয়ে গেলো।
আর আমি ভাবলাম, তুমি বুঝি এলে না।
তোমাকে কথা দিয়ে আমি আসবো না, ভাবতে পারলে?
কি জানি, মোটে তো একদিনের ব্যাপার!
তোমার কাছে একদিনের হলেও আমার কাছে অনেক দিনের।
আমি শ্যামার দিকে তাকাই। শ্যামা আমার দিকে। ও খুব মিষ্টি করে হাসে। আমি বলি, তোমাকে দারুণ লাগছে।
যা! শ্যামা কপালে হাতের রুমাল বুলায়।
চলো।
কোথায়?
যেখানে খুশি।
বেশিক্ষণ থাকা যাবে না কিন্তু। মাকে বলে এসেছি এক বান্ধবীর বাসায় যাচ্ছি।
শ্যামা যে রিকশা নিয়ে এসেছিলো তাতেই চড়ে বসি দুজনে। রিকশাঅলাকে বলি, রমনা পার্কে যাও।
তারপর শ্যামার দিকে তাকাই। ওকে যেনো কি বলবো! আমার কিছু কথা আছে, কিছু দুঃখ। পরিবর্তে আমি অন্য কথা বলি, একটা চুমু খাই?
শ্যামা আবাক হয়। তারপর হাসে। যা, প্রথম দিনেই!

কিচ্ছু হবে না।
কেউ দেখে ফেললে?
কি হবে! মুখ ঘুরাও।
শ্যামা মুখ ঘুরাতেই আমি চট করে চুমু খেয়ে বসি।
শ্যামা হাসে। তোমার মুখে সিগারেটের গন্ধ। তারপর রুমাল এগিয়ে দেয়। লিপস্টিক লেগে গেছে। মুছে ফেলো।
আমি ঠোঁট মুছে বলি, শ্যামা, তুমি কি সেন্ট ইউজ করো?
পেট্রা।
গুড! আমার খুব ফেবারিট সেন্ট।
আর কি কি ফেবারিট তোমার?
গরদের শাড়ি।
আমি তো তাই পরে এসেছি।
তুমি আমার অনেক কিছুই বুঝতে পারো দেখছি।
একদিন তুমি মাকে বলেছিলে, গরদের শাড়ি তোমার খুব ভালো লাগে। আমার তখন অসুখ। বাবাকে বললাম, আমার একটা গরদের শাড়ি চাই। বিকেলে নিয়ে এসো।
রিকশা তখন পার্কের গেটে এসে থেমেছে। আমরা নেমে পড়ি। তারপর পার্কে ঢুকে অবাক হয়ে যাই। আজকের দুপুর কী ভীষণ সুন্দর হয়ে ছড়িয়েছে। গাছপালা সব রোদের ভেতর নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে। তলায় জাফরি কাটা ছায়া। বাতাসে ছিলো ফুলের গন্ধ। কদিন আগে বছরের প্রথম বৃষ্টি হয়েছে। ফলে ঘাসের রং আশ্চর্য সবুজ।
পার্কে ঢুকে শ্যামা আমার হাত ধরলো। বাতাসে যে ফুলের গন্ধ ছিলো তা নাকে টেনে নিয়ে বললো, কি মিষ্টি গন্ধ!
হু।
আমার খুব ভালো লাগছে।
আমারও।
শ্যামা ঘাড় কাৎ করে আমাকে দেখে। হাসে। আমার হাতের ভেতরে ওর হাত। তাতে আমি একটু একটু চাপ দিচ্ছিলাম।
পার্কের মাঝামাঝি এলে শুনতে পাই কোথায় কোন ফুলের ঝোপে বসে ছোট্ট একটা পাখি শিস দিয়ে যাচ্ছে। শ্যামা আকুল হয়ে চারদিকে তাকায়। আমি বুঝতে পারি শ্যামা পাখিটা খুঁজছে। আমার হাসি পায়। শ্যামার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলি, ও পাখি তুমি খুঁজে পাবে না।
ভারি মিষ্টি ডাকে, না?
হু।

চলো বসি।

শ্যামা আমার হাত ধরে লেকের ধারে একটা ঘন ঝোপের কাছে চলে আসে। তারপর ঘাসের ওপর বসে আমাকেও হাত ধরে বসায়। বসেই আমি একটু আনমনা হয়ে যাই। চারদিক তাকিয়ে দেখি, এখন দুপুর বলে পার্কে দুএকজন মালি টালি ছাড়া অন্য কেউ নেই। আমার খুব ভালো লাগে। একরম নির্জনেই তো শ্যামাকে আজ চেয়েছিলাম। আমার কিছু দুঃখ, শ্যামাকে বলবো।

শ্যামা তখন আমার একটা হাত ধরে বললো, এই তুমি কিছু বলছো না কেন?

কি বলবো?

বারে, আমাকে ডেকে আনলে আর এখন কিছু বলবে না!

শ্যামা, কাল রাতে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি।

শ্যামা হাসে। কি দেখলে?

আমি ততোক্ষণে একটা গল্প তৈরি করে ফেলি। দেখি, তুমি খুব সুন্দর করে সেজেছো। সেজে এক নির্জন সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে আছো। বাতাসে তোমার চুল উড়ছে। তোমার খেয়াল নেই। দুহাত দুদিকে ছড়িয়ে দিয়ে তুমি আলতো করে নাচছো। দূরে কোথায় গান বাজছে, আই অনলি লিভ, বিকজ ইউ লাভ মি।

শ্যামা আমার দিকে অপলক তাকিয়েছিলো। আমিও তাকাই। শ্যামার চোখ দুটো ভীষণ সুন্দর। আর ওর চিবুকের নিচে ছোট্ট এক তিল। আমি সেখানে আঙুল ছোঁয়াই। শ্যামা দুহাতে আমার হাত চেপে রাখে। আলতো করে বলে, নীলুদা আমি কতোদিন তোমার কথা ভেবেছি। ভেবে ভেবে সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছি। আবার কখনো গভীর রাতে হু হু করে কেঁদে ফেলেছি। কেন যে এমন হতো! পরে ডাক্তার বলেছিলো, রাতজাগা এবং ভাবনা চিন্তা থেকেই আমার অসুখ।

সত্যি তুমি খুব রোগা হয়ে গেছো।

এবার ঠিক ভালো হয়ে যাবো। শ্যামা হাসে।

আমি আলতো করে ওর পিঠে হাত রাখি। বুলিয়ে দিই। কথা বলি না।

অথচ আমার কিছু কথা ছিলো, কিছু গোপন দুঃখ। শ্যামাকে বলতে চেয়েছিলাম। বলা হয় না। আমি আবার শ্যামার দিকে তাকাই। শ্যামা জলের দিকে তাকিয়ে ছিলো। ওর নাকের দুপাশে পাতলা ঘাম। আমি বলি, মেয়েদের নাক ঘামলে কি হয় জানো?

কি? শ্যামা হাসে।

স্বামী খুব ভালোবাসে।

জানি।
আমি শ্যামার দিকে তাকিয়ে থাকি। শ্যামাও তাকায়। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলে, কি দেখছো?
তোমাকে।
আমি আস্তে করে শ্যামার দিকে ঝুঁকে যাই। হঠাৎ করে শ্যামা দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, নীলু তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।
আমি দুহাতে শ্যামাকে জড়িয়ে রাখি। ওর ঘাড়ের কাছে ঠোঁট ঘষতে ঘষতে বলি, শ্যামা আমিও তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না।

১৯৭৪

না সজনী

ঘুমের ভেতর আমার কেবল মনে হতে থাকে, বাইরে দাঁড়িয়ে কে আমার নাম ধরে ডাকছে। জনী, উঠে এসো। বাইরে এসে দেখো কী সুন্দর দিন শুরু হয়েছে।
আমার ঘুম ভেঙে যায়। কদিন ধরে এরকম হচ্ছে। খুব সকাল-বেলা ঘুমের ভেতর মনে হয় কে আমার নাম ধরে ডেকে যাচ্ছে।
আমি উঠে পড়ি। উঠে প্রথমে মাথার সামনে যে বিশাল জানালা মৃদু শব্দে তার পর্দা সরিয়ে দিই। পরে সিটকিনী লাগানো কাচের পাল্লা দুটোও খুলি। জানালা খুললেই বাইরে বিশাল বাগান, দোতলা থেকে সাজানো বনভূমির মতো দেখায়। আমি বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখি, এখনো সূর্য উঠতে অনেক দেরি। চারিদিকে বালি রঙের পাতলা কুয়াশা। ফুরফুরে বাতাস বাগান থেকে মিষ্টি সুবাস নিয়ে উড়ে আসে। আমার শরীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। আমার তখন হঠাৎ করে খেয়াল হয় ঘরের ভেতর সবুজ ডিমলাইট এখনো জ্বলছে। আমি সুইচ টিপে ডিমলাইট অফ করি। তারপর আবার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াই।
বাগানের দিকে কি একটা পাখি শিস দিচ্ছে। কি পাখি ওটা! দোয়েল না টুনটুনি! আমি ভাবতে থাকি।
আমাদের বাড়ির কেউ এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। আরো বেলা করে উঠবে। আমারও আগে ওরকম অভ্যেস ছিলো। কদিন থেকে সেই পুরনো অভ্যেসটা আস্তে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে।

বাবা আগে মর্নিং ওয়াকে বেরুতেন। আজকাল বোধহয় আড় বেরোন না। তাহলে নিশ্চয় আমার চোখে পড়তো।

এসব যখন ভাবছি তখন দূরের রেল লাইন দিয়ে ভোর সাড়ে পাঁচটার ট্রেন হুঁইসেল বাজিয়ে চলে গেলো। আর তাতে ভেতরে ভেতরে আমি বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়ি। কি ব্যাপার! আজ এতো দেরি করছে কেন! কদিন থেকে তো তার পায়ের শব্দেই আমি জেগে উঠছি। আজ কি হলো!

আমি আনমনে জানালার পাল্লায় হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকি। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে এক সময় দেখি সে আসছে। পরনে সেই ছোট্ট কালো হাফপ্যান্ট, অনেকটা সুইমিং কস্টিউমের মতো। গায়ে সেই গেঞ্জি। হলুদের ওপর কালো ডোরাকাটা। পায়ের কেডস তালে তালে ফেলে কি সুন্দর দৌড়ে যাচ্ছে। দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে আমি মুগ্ধ চোখে দেখি। দেখি আর বুকের ভেতর কি এক অনুভূতিকে টের পাই। দুদিন আগে এক সকাল বেলা আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়েছিলো, ওহে খেলোয়াড়, একবার এদিকে তাকাও। দ্যাখো একজন তোমার জন্য রোজ সকালে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে।

বলা হয়নি। পরে ভেবেছি, কি লাভ বলে! সে নাই বা জানুক তার এই দৌড়ে যাওয়া একজন মানুষের সকালের ঘুম কেড়ে নিয়েছে। সে জার্সি পরে সকালের নির্জন রাস্তা দিয়ে দৌড়ে যায়। শুধু এটুকুই আমার ভালো লাগে। এই ভালো লাগা সে নাই বা জানলো।

খেলোয়াড় আবার এ রাস্তা দিয়েই ফিরবে। আমি জানি। জানি বলেই জানালা থেকে সরি না। আগের মতোই স্থির দাঁড়িয়ে থাকি। তখন দরোজায় টুকটুক করে শব্দ হয়। একবার দুবার তিনবার। আমি আশ্চর্য হই। এতো সকালে কে আমার দরোজায় শব্দ করবে! তাছাড়া আমাদের বাড়ির কেউ তো এখনো ঘুম থেকেই ওঠেনি!

তবুও আমি জানালা থেকে সরে গিয়ে দরোজা খুলে দিই।

হ্যাণ্ডস আপ।

আমার বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডের শব্দটা পাল্টে যেতে থাকলে টের পাই আমার বুক বরাবর পিস্তল তাক করা।

আমি পিস্তল ধরা হাতটির দিকে তাকাই। পরে তার মুখের দিকে। বাপ্পা তখন হি হি করে হেসে ফেলে।

আপু ভয় পেয়েছে। দুয়ো দুয়ো।

আমি বিরক্ত হয়ে বাপ্পাকে ধমক লাগাই। তুমি এতো সকালে উঠেছো কেন বাপ্পা?

বাপ্পা খেলনা পিস্তলটা ঘুরাতে ঘুরাতে বলে, বাথরুম পেয়েছিলো।

বিনীকে ডেকেছিলে?

হ্যাঁ বিনী আমাকে বাথরুম করিয়ে আবার গিয়ে শুয়েছে।
যাও তুমিও গিয়ে শুয়ে পড়ো। মার সাথে উঠবে।
আমার শুতে ভাল্লাগে না। আমি একটু বাগানে যাই?
যাও।
কিন্তু বাপ্পা তবুও দাঁড়িয়ে থাকে। তাতে আমার খুব বিরক্ত ধরে যায়।
কি হলো তুমি যাচ্ছো না?
বাপ্পা এবার হি হি করে হেসে ফেলে। আপু তুমি ন্যাংটো।
বাপ্পা তারপর দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। আমি তখন নিজের দিকে তাকাই। ছি ছি আমি এখনো নাইটি পরে আছি!

দরোজা বন্ধ করে আবার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াই। নিচে বাগানে এখন বাপ্পা ছুটোছুটি করছে। বুড়ো মালি পাইপ দিয়ে গাছে গাছে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। বাগানে প্রজাপতিগুলো এতো সকাল বেলাই দল বেঁধে ওড়াউড়ি শুরু করেছে। বাপ্পা সেই প্রজাপতিদের পিছু পিছু ছুটছে। জিম্মি কুকুরটাও আছে। বাপ্পার আগে আগে দৌড়াচ্ছে। লাফ দিয়ে কখনো প্রজোপতি ধরতে চাইছে। বাপ্পা জিম্মিকে তাক করে গুলি ছোঁড়ে। আর জিম্মি কুকুরটাও, কি আশ্চর্য, গুলি খেয়ে যেনো সত্যি সত্যি মারা যাচ্ছে এমন ভঙ্গিতে বাগানের ঘাসে লুটিয়ে পড়ে। বাপ্পা কাছে গেলেই আবার লাফিয়ে ওঠে। তাদের এই খেলা দেখে জানালায় দাঁড়িয়ে আমি হেসে কুটি কুটি।

কিন্তু খেলোয়াড় এখনো ফিরছে না কেন! রোদ উঠে গেলো!
আমি জানালা থেকে সরে এসে ডেকে ক্যাসেট চালিয়ে দিই। ক্যাসেটে ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁর সানাই। গমগম করে সানাই বাজতে থাকে। আর সানাইয়ের শব্দ, কি যে দুঃখ দুঃখ ভাব। সানাই বাজতে থাকলেই লোলোর সেই গানটি মনে পড়ে। 'আই ওনলি লিভ, বিকজ ইউ লাভ মি।' লোলোর রেকর্ডটা আমি অনেক খুঁজেছি। পাইনি। আহা কি আনন্দ আর বিষাদ বিষাদ সুর লোলোর গানে।

প্রিন্স আমাকে বলেছিলো রেকর্ডটা আনিয়ে দেবে। কই আর দিলো!
বাপ্পা আবার গুলি ছুঁড়লো। জিম্মি তার গাঢ় খয়েরী রং শরীরে একটু লাফিয়ে উঠেই গোলাপ ঝাড়টার কাছে লুটিয়ে পড়লো। জিম্মির লুটিয়ে পড়া দেখে আমার মনে হলো দুটো গোলাপের পাপড়ি হাসতে হাসতে খসে পড়লো। বুড়ো মালীও বাপ্পাদের এই খেলা দেখে ফোকলা মুখে হাসছে। বাপ্পাটা যা হচ্ছে না দিন দিন!
কখন যে বাগানে ঝুপ করে রোদ লাফিয়ে পড়ছে আমি খেয়াল করিনি। আর সকালের রোদ, কি যে রং তার! গোলাপের পাপড়ির মতো। নরোম যেনো বেড়ালের গা। এখন বাগানের ঝোপ ঝাড়ে এবং ঘাসবনে চকচকে রোদের খেলা। ফুরফুরে হাওয়াটা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।

আমি বাগানে রোদের খেলা দেখতে দেখতে আবিষ্কার করে ফেলি খেলোয়াড় ফিরে আসছে। মুহূর্তে আমি সব কিছু ভুলে যাই। অপলক দেখতে থাকি সে দৌড়ে ফিরছে। আকাশ থেকে সূর্য টর্চ লাইটের মতো ফোকাস ফেলেছে তার চেহারায়। তামাটে মুখ এখন ঘামে চিকচিক করছে।

হায় খেলোয়াড়! তুমি কোনোদিকে তাকাও না কেন! পৃথিবীতে তো আরো কতো রকমের খেলা রয়ে গেছে! তুমি তার কিছুই জানলে না! খেলোয়াড় চলে গেলে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। ক্যাসেটে এখনো সানাই বাজছে। খাঁ সাহেব ভৈরোঁ রাগে আলাপ করছেন। আমার সারা শরীর কেমন অবশ লাগে। নড়তে পারি না। ভৈরোঁ রাগে মায়াবী এক বিষাদ। কি এক দুঃখে পৃথিবী কেবল নরম হয়ে ওঠে। আমি ভেতরে ভেতরে টের পাই।

তখন বিনী দরোজায় টোকা দিয়ে আমাকে ডাকে। জনীবু তোমার চা।

ঘুম ভাঙার পর আমার এক কাপ চা না হলে চলে না। শরীর হাত পা ম্যাজ ম্যাজ করে, ঘুমঘুম আবেশটাও কাটতে চায় না। আমি দরোজা খুলে বিনীর হাত থেকে চায়ের কাপ নিই। তারপর কুশনে বসে ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় আরো তিনজন জনীকে তিন এংগেলে চা খেতে দেখি।

বিনী আমার বিছানা ঝেড়ে অন্য চাদর বিছিয়ে দিচ্ছে। মাথার কাছে হ্যারল্ড রবিন্সের একটা বই ছিলো সেটা সেলফে সাজিয়ে রাখে। এবং ঘরের অরেকটা জানালা খুলে দেয়।

আমি চা খেতে খেতে জিজ্ঞেস করি, বাবা উঠেছে?

হ্যাঁ চা খাচ্ছে।

মা?

বাথরুমে।

আমি আবার আয়নার ভেতর তিনজন জনীকে দেখতে থাকি। বিনীকে জিজ্ঞেস করি, কটা বাজেরে?

সোয়া আটটা।

বলিস কি! আমি লাফিয়ে উঠি।

বিনী একটা ফুলের ঝাড়ু দিয়ে কার্পেটের ধুলো ঝাড়ছিলো। সে অবস্থায়ই আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। আগে তো তুমি নটার আগে উঠতেই না। সকালে ক্লাশ থাকলেও করতে না।

আমি কোনো কথা বলি না। বিনীর সামনেই নাইটিটা খুলে একটা লুঙ্গি পরি। গায়ে বিরাট তোয়ালে জড়িয়ে সোজা বাথরুমে চলে যাই। যেতে যেতে পেছন থেকে বাবাকে দেখি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছে। নিচের

ঘরে বোধহয় মক্‌কেলরা এসে ভিড় করেছে। আ মক্‌কেলদের যা চেহারা সুরত!

বাথরুমে পুরো বিশ মিনিট লেগে যায়। শরীর মুছতে মুছতে আমার খেয়াল হয়, যা জামা কাপড় আনা হয়নি। বাথরুম থেকেই চিৎকার করে বিনীকে ডাকি। বিনী আমার জামা কাপড় নিয়ে আয়।

আমি কোনদিন কি পরবো তা আগের রাতে বিনী বের করে রাখে। আমার যে আরো কতো রকমের অভ্যেস ছিলো! বাথরুমে এসেও গান অথবা মিউজিক শোনা চাই। বাবা এজন্য বাথরুমেও ছাট্ট একটা সাউণ্ড-বক্স লাগিয়ে দিয়েছে। আমি ক্যাসেট চালিয়ে দিয়ে বাথরুমে আসতাম। পপ মিউজিক শুনতে শুনতে শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে কতোদিন নেচেছি। লা লা লা প্পা প্পা প্পা গান গেয়েছি।

আজ আমার ড্রেস হচ্ছে শাদা বত্রিশ ইঞ্চি চওড়া বেলবটম আর লাল টুকটুকে ইউনিয়ন শার্ট। শার্টের তলায় আমি স্পঞ্জ লাগানো ব্রা পরি। খুব ভলো লাগে।

জামা কাপড় পরে আমি বাথরুমের আয়নায় নিজেকে দুতিন পোজে দেখে বেরিয়ে আসি। মা ডাইনিং রুম থেকে ডাকে। সজনী!

মা সব সময় আমার পুরো নাম ধরে ডাকে। আর মার গলা অনেকটা তৃপ্তি মিত্রের মতো। কি যে মিষ্টি!

আমি ডাইনিং হলে উঁকি মেরে দেখি মা আর বাপ্পা বাটার টোস্ট খাচ্ছে। সামনে এককাঁদি কলা, এক প্লেট মিষ্টি। অবিকল সিনেমায় দেখা খাওয়ার দৃশ্য।

আমি মাকে বললাম, পরে আসছি মা।

এক্ষুণি খেয়ে যাও। টোস্ট ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। বাপ্পা কলা খেতে খেতে আমার দিকে তাকায়। ফিক করে একটু হাসে।

আমি চেয়ারে বসে খেতে শুরু করি। সকালবেলা আমি খুব লাইট কিছু খেতে ভালোবাসি। এক গ্লাস হরলিকস আর দুটো ড্রাইকেক হলেই চলে।

একটা বাটার টোস্ট আর অর্ধেকটা কলা খেয়ে আমি বেরিয়ে আসি। মা বেশ অবাক হয়। খাওয়া হয়ে গেলো?

হুঁ ভাল্লাগছে না।

তারপর একছুটে নিজের ঘরে। নটা প্রায় বাজে। এক্ষুণি প্রিন্স চলে আসবে। আর এসে যদি দেখে আমি এখনো রেডি হইনি, তাহলেই হয়েছে। ও যা রাগী।

সোজা ড্রেসিং টেবিলে গিয়ে বসি। এখন আর নিজেকে খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই। আমি দ্রুত মাথা আঁচড়াই। আমার চুল ববছাট বলে আঁচড়াতে অসুবিধা হয় না। তার ওপর আজ আবার শ্যাম্পু করেছি।

দুমিনিটে অ াচড়ানো হয়ে যায়। এবার গালে গলায় এবং ঘাড়ের কাছটায় হালকা গোলাপী পাউডার মাখি। টুকটুকে লাল, আমার গায়ের শার্টটির রঙ ম্যাচ করে লিপষ্টিক লাগাই, টিপ পরি। তারপর স্প্রে করে সারা গায়ে ইনটিমেট ছড়াতে ছড়াতে নিজেকে সম্পূর্ণ করে দেখি। একটু হাসি। তখন খুঁতটা ধরা পড়ে। আজকের ড্রেসের সাথে চুলটা ঠিক মানাচ্ছে না। একেবারে প্লেন চুল। র‍্যাকুয়েল ওয়েলসের মতো দেখাচ্ছে। চুলটা কোকড়ানো হতে হবে। হলিউডের কে একজন নায়িকা আছে না, কোন দেশের রানী ছিলো যেনো, বেশ কোকড়ানো চুল। ছবিতে শার্ট প্যান্ট পরলে দারুণ লাগতো দেখতে।
এই সব ভেবে আমি উইগ লাগাই। ঘন কালো কোকড়ানো চুলে এবার নিজেকে পূর্ণাঙ্গ মনে হয়। একটু হাসি। আ কি লাগছে দেখতে। আমি আয়নায় তাকিয়ে কে জানে কার উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে বলে ফেলি, আমায় কে নেবে গো, কে?

পর পর তিনবার সিটির শব্দ। এটা প্রিন্সের সাইন। আমি পুব দিকের জানালার পর্দা ফাঁক করে দেখি গাড়ি বারন্দায় প্রিন্সের হোণ্ডা নাইনটি থেমে আছে। এক পা মাটিতে রেখে প্রিন্স তার ওপর বসা। ও পরেছে বাটিক প্রিন্টের পাঞ্জাবী আর কালো প্যান্ট। আমি ঠিক উল্টো ড্রেস। যাকগে। আমি কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে নেমে আসি।
বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে বাবার চেম্বারের পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতর উঁকি মারি। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের চারদিকে মক্কেলেরা বসে আছে। ওপাশের রিভলবিং চেয়ারে বাবা। পুরু লেন্সের চশমা পরে মক্কেলদের সঙ্গে কথা বলছে। ব্যাকগ্রাউণ্ডে সার সার বইয়ের আলমারি।
বাবা আমাকে দেখে বললো, জনী মা কি ব্যাপার?
বাবা আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। আমার ভয়েস অনেকটা ববিতার মতো আদুরে শোনায়।
কখন ফিরছো?
সন্ধ্যে হবে।
এসো। রাত করো না।
আমি দুধাপ সিঁড়ি ভেঙে গাড়ি বারান্দায় নামি। আমাদের লাল ডাটসান, সেভেনটি ফাইভ মডেলটা ছুঁয়ে প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে হাসি।
গোসাই কি রাগ করেছেন?
ও ইউ আর টু লেট। এসো।
আমি প্রিন্সের হোণ্ডায় চড়ে এক হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরি। ও বাঁ পায়ে সাইকেলে প্যাডেল মারার মতো করে হোণ্ডা স্টার্ট দেয়। জিম্মি

কুকুরটা দৌড়ে এসে একটু কাইকুই করে। আমি জিম্মির দিকে তাকিয়ে বলি, বাই জিম্মি।

জিম্মি আনন্দে লেজ নাড়ে। তখন মা আর বাপ্পাকে দেখি দোতলার রেলিংয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি ওপরের দিকে হাত নাড়াতে থাকলে প্রিন্সের হোণ্ডা ভোঁ করে রাস্তায় এসে পড়ে।

ইস পুরোনো টাউনেই প্রিন্স কি জোরে হোণ্ডা চালাচ্ছে। ও খুব রাফ ড্রাইভ করে। আমার বেশ ভয় হয়। অ্যাকসিডেন্ট না করে বসে। আবার ভালোও লাগে। প্রিন্স খুব ডেয়ারিং টাইপের। ট্র্যাফিক সিগ-ন্যাল পর্যন্ত মানতে চায় না। ওর এই ডেয়ারিংনেসটাই আমার খুব প্রিয়।

যাত্রাবাড়ি ছাড়াতেই প্রিন্সের হোণ্ডার স্পিড কেবল বাড়তে থাকে। দুপাশে খোলামাঠ জলাভূমি আর বাড়িঘর ছবির মতো সরিয়ে দিয়ে আমরা ছুটে চলি। আমার এখন কি যে ভালো লাগছে। বাতাসে আমা-দের দুজনেরই চুল উড়ছে। আমি আগেই সান গ্লাস পরে নিয়েছি। নয়তো চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়তো। দুটো মাল বোঝাই ট্রাক আমাদের পাশ দিয়ে উল্টো দিকে চলে গেলে আমি প্রিন্সকে জিজ্ঞেস করি, কোনদিকে যাবে?

বাতাস আমার কথা দ্রুত পেছন দিকে ঠেলে নেয়। প্রিন্স শুনতে পায় না। আবার বলি, কোনদিকে যাবে?

সোনার গাঁ। প্রিন্স আমার দিকে না তাকিয়েই বলে। আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করি না। প্রিন্সের কাঁধের ওপর দিয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকি।

ডেমরা ঘাটে এসে দেখি ওপার থেকে মাত্র ফেরি ছেড়েছে। আসতে অবশ্য বেশিক্ষণ লাগবে না। কিন্তু এপারে যে ভীষণ ভিড়! বাস ট্রাক প্রাইভেট কার সব লাইন দিয়ে আছে। ও গড কতোক্ষণ যে লাগবে! আমার এই এক দোষ। কোথাও যাওয়ার পথে লেট হলে ভীষণ রাগ ধরে যায়। পথ তো কেবল চলার জন্য। থেমে থাকলে রাগ ধরবে না! রাস্তার পাশে প্রিন্স হোণ্ডা দাঁড় করায়। আমি লাফিয়ে নেমে শাটটা টেনে টুনে পরি। চারদিকে তাকিয়ে দেখি এ মা কতো লোক! সবাই যেনো আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। আমার একটু একটু লজ্জা হয়। আফটার অল মেয়ে তো!

একটা বুড়ো ভিক্ষুক আমাকে ফিরিঙ্গি ভেবে দুতিনবার হাংরি শব্দটা ব্যবহার করে। প্রিন্স তাকে এক ধমক লাগায়। আমার খুব হাসি পেয়েছিলো। কষ্টে চেপে রাখি। একটা আধুলি ফেলে দিই তার থালায়।

প্রিন্সের হোণ্ডাটা এখন রাস্তার পাশে ফরটি ফাইভ এঙ্গেলে দাঁড়িয়ে রেস্ট নিচ্ছে। আমি হোণ্ডার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াই। প্রিন্স পাঞ্জা-

বীর পকেট থেকে ডানহিলের প্যাকেট আর লাইটার বের করে। সিগারেট ধরায়। প্রিন্সের গলায় শাদা নিকেল করা চেন। প্রিন্স মাথা নুইয়ে সিগারেট ধরালে চেনের লকেটটা আমার চোখে পড়ে। প্রিন্সের বুকে কালো লোম, তার উপর লকেটটা ঝুলছে। প্রিন্স গেঞ্জি পরে না। এ সব্ কিছুই প্রিন্সকে বেশ মানায়।

প্রিন্স সিগারেট ধরিয়ে আমার দিকে তাকায়। খাবে?

পরে।

প্রিন্স হো হো করে হেসে ওঠে। লজ্জা পাচ্ছো? ধেৎ, নাও নাও।

না এখন না।

প্রিন্স আর বাড়াবাড়ি করে না। সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে বলে, বাসায় বলে এসেছো?

এসেছি। কিন্তু কোথায় যাবো বলিনি। বাবা বলেছে সন্ধ্যের আগে ফিরে যেতে। আর যদি না ফিরি? প্রিন্স হাসে।

কি হবে!

গুড।

ততোক্ষণে ফেরি এসে গেছে। আমাদের সিরিয়াল অনেক পেছনে। এই ট্রিপে যাওয়া যাবে না। আমি হতাশ হয়ে প্রিন্সের দিকে তাকাই। এখানেই তো বারোটা বেজে যাবে।

দাঁড়াও না। তারপর একটু থেমে বলে, তুমি সোজা গিয়ে ফেরিতে উঠে পড়ো।

আর তুমি?

হবে। তুমি যাও। ডোন্ট লেট।

প্রিন্স এই রকমই। ও কি করবে না করবে কাউকে বলবে না। আমি ওর চালাকিটা বুঝতে পারি। তবুও একটু দ্বিধা থেকে যায়। যদি না পারে!

আমি বাস ট্রাকের ফাঁক ফোঁকর দিয়ে ফেরিতে গিয়ে উঠি। বেজায় লোকজন উঠছে, বাস ট্রাক উঠছে। দুচারটি প্রাইভেট কারও। ফেরিটা স্টার্ট নিয়েই আছে। যে কোনো মুহূর্তে ছেড়ে যাবে। দোতলার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আমার একটু একটু ভাবনা হয়, যদি প্রিন্স না উঠতে পারে! অথচ ঠিক তখুনি কোথায় কোন ফাঁক দিয়ে প্রিন্স তার হোণ্ডা নিয়ে ফেরিতে উঠে আসে। ওর বাটিক প্রিন্ট পাঞ্জাবী দেখতে পেয়েই আমি দোতলা থেকে নেমে আসি। প্রিন্স আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। কেমন দেখালাম?

আমিও হাসি।

ওপারে গিয়ে প্রিন্স আবার যেই কে সেই। ফেরিঘাট থেকেই আমাকে পেছনে বসিয়ে ভোঁ। দু মিনিটে সব ভিড় কাটিয়ে খা খা

নির্জন রাস্তায়। ওর হোণ্ডা এখন কমপক্ষে পঞ্চাশ মাইল স্পীডে চলছে। কানের কাছ দিয়ে শো শো বাতাস বয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে হোণ্ডার একটানা শব্দ। আমি দুহাতে প্রিন্সের কোমর ধরে আছি। সেই মুহূর্তে আশ্চর্য এক অনুভূতি টের পাই আমি। প্রিন্সকে রূপকথার রাজপুত্র মনে হয়। ডালিম কুমার, পেছনে তার রাজকন্যা রূপবতী। সেই রাজকন্যাকে নিয়ে পক্ষিরাজে চড়ে ডালিম কুমার চলেছে। সাত-সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে, তেপান্তরের মাঠ ছাড়িয়ে কোথায় কোন অজানা দেশে যে চলে যাচ্ছে!

প্রিন্সের হোণ্ডা এখন ইট বিছানো রাস্তায় পড়েছে। গাছপালা বাড়িঘরের ভেতর দিয়ে অপ্রশস্ত রাস্তা। ভাঙা ব্রিজ, পুরনো মন্দির, কখনো দুপাশে ফসলের জমি, জলাশয় এবং খোলা মাঠ ফেলে আমরা এগুচ্ছি। কি যে ভালো লাগছে! হাততালি বাজিয়ে গান গাইতে ইচ্ছে করছে। এ মুহূর্তে ঠাকুরদার গান বেশ মানাবে। 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা'। পরের লাইনটা অবশ্য চলবে না। ওটা আবার অন্য অর্থে।

সোনার গাঁ ঈসা খাঁর বাড়ির সামনে আসতেই মৃদু কোলাহল এবং মাইকের শব্দ পাওয়া যায়। পিকনিক পার্টি। মাঠের পাশে গাছতলায় দুটো পাঁচ টনী ট্রাক, প্যাণ্ডেল বাঁধা, দাঁড়িয়ে আছে। তার একটায় বসে কয়েকজন যুবক মাইক বাজাচ্ছে। কিশোর কুমারের 'চল চল চল মেরে সাথী'। এক পাশে রান্নাবান্না চলছে। খাঁ সাহেবের বাড়িতে কয়েকজন ফরেনার ঢুকেছে। ছবি তুলছে। প্রিন্স হোণ্ডা থামিয়ে বললো, প্রথমে এ বাড়িটাই দেখি।

চলো। প্রিন্স হোণ্ডার চাবি ঘুরিয়ে দুহাতে মাথার চুল ঠিকঠাক করে। আমি তখন দেখি ওর প্যান্টের বাঁ উরুর মাঝামাঝি লাল ছোট্ট এক স্টিকরো। তাতে ইংরেজিতে লেখা 'লাভ'। ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে না। প্রিন্সের এসব সাজে না। ও পাগলের মতো হোণ্ডা চালাবে, শুধু এটুকুই ওকে মানায়। লাভ টাভ কি!

ফরেনারগুলোর পাশাপাশি আমরা পুরো বাড়িটা চক্কর খাই। অলি-গলি ঘুরে দেখি। ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠি। বহুদিনের পুরনো বাড়িতে এক ধরনের গন্ধ পাওয়া যায়, আর নির্জনে বাতাস বয়ে গেলে মনে হয় ইট পাথররা সব ফিসফিস করে কথা বলছে। দোতলায় উঠে আমার এই সব মনে হয়। তখন দেখি চারদিকের দেয়ালে এমনকি মেঝেতেও কতো কি হিজিবিজি লেখা। ম্যাক্সিমামই অশ্লীল কথা। কিছু আছে প্রেমিক প্রেমিকার নাম। শহীদ প্লাস লাকী। এই রকম, প্রিন্স ওসব খেয়াল করছে না। আমি সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। একটা লেখা আমার খুব ভালো লেগে যায়। গোটা গোটা অক্ষরে একটা নির্জন

কক্ষে কে লিখে রেখেছে, 'সেই তুমি কেন এসেছিলে'। পুরনো প্রেমিকার সাথে হয়তো কোনো ব্যর্থ প্রেমিকের এখানে দেখা হয়ে গিয়েছিলো। লেখাটা তারই স্মৃতি। কথাটা ভেবে আমার একটু একটু দুঃখ হয়। পৃথিবী সত্যি খুব দুঃখময়।

ফরেনারগুলো কি কথা নিয়ে নিজেদের মধ্যে ভীষণ হাসাহাসি শুরু করেছে। সিঁড়ির একেবারে নিচে। আমি ওদের পাশ দিয়ে নামতে নামতে ওদের মধ্যে সবচে সুন্দরী মেয়েটির পাশাপাশি এক মুহূর্ত দাঁড়াই। তারপর দ্রুত সরে আসি। প্রিন্স দূর থেকে ব্যাপারটা খেয়াল করে হাসে। কি হলো?

কি?

ওদের পাশে দাঁড়ালে যে?

এমনি। আমি কথাটা কাটাতে চাই। ব্যাপারটা পুরোপুরি মেয়েলি। ফরেনার মেয়েটির সাথে নিজেকে মিলিয়ে দেখলাম, কে বেশি সুন্দর। আমিই। এটা প্রিন্সকে বলা যাবে না। ও তাহলে লাফিয়ে উঠবে। ওটি তো আমাদের 'মিস জিউগ্রাফী'।

আমাদের কলেজের জিউগ্রাফী ম্যাডাম অবিকল এই রকম দেখতে। গায়ের রং ফর্সা, টকটকে। কিন্তু ফেস, ও সে এক জিউগ্রাফী!

আমি নিজের ভাবনায় নিজেই হেসে উঠবো কিনা ভাবি। তখন প্রিন্স বললো, চলো সামনে বাজার আছে। খেয়ে আসা যাক।

সত্যি খুব খিদে পেয়েছে। আমি বলি। তারপর পুকুর পাড় দিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকলে বাঁধানো ঘাটলায় দেখি একাকী একজন লোক বসে। পরনে শাদা পাঞ্জাবী পাজামা, চোখে চশমা, কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ। উদাস চোখে জলের দিকে তাকিয়ে আছে। পেছনে দুপুরের কলাপাতা ছায়া ফেলেছে।

আমি প্রিন্সকে বললাম, এক মিনিট, আমি একটু হাত ধুয়ে আসি। তারপর লোকটির পাশ দিয়ে তরতর করে জলের কাছে নেমে যাই। আড়চোখে দেখি সে আগের মতোই। অপলক জলের দিকে তাকিয়ে আছে। কবি নাকি?

আমি পুকুরের জলে হাত নাড়ি। সরাসরি লোকটির দিকে তাকাই। না কোনোদিকে খেয়াল নেই তার। আর লোকটিকে যা ভেবেছিলাম তা নয়। প্রিন্সদের বয়সী। মুখে পনেরো বিশ দিনের দাড়ি গোঁফ। বসার ভঙিটি বিষণ্ণ। এই বিষণ্ণ ভঙিটি আমার খুব প্রিয়। আমি তাকে দেখতে থাকি।

প্রিন্স দূর থেকে ডাকে, জনী তাড়াতাড়ি।

আমি আস্তে আস্তে উঠে আসি। না সে তাকাচ্ছে না। আমার তখন বলতে ইচ্ছে করে, যুবক, তুমি কি!

প্রিন্স হোণ্ডায় বসে ছিলো। আমি গিয়ে পেছনে বসতেই স্টার্ট দেয়। গাছতলায় এখন পিকনিক পার্টির খাওয়াদাওয়া চলছে। সেখান থেকে আমার উদ্দেশ্যে দুতিনটি সিটির শব্দ আসে। এসব আমার খারাপ লাগে না। কিন্তু প্রিন্স একবার ঘাড় বেঁকিয়ে সেদিকে তাকায়। আমি বুঝতে পারি ও বেশ রেগে গেছে। ওরা দলে ভারি না হলে নির্ঘাৎ হোণ্ডা ঘুরিয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াতো। চেংড়ামী পেয়েছো শালারা। এসব প্রিন্সকে মানায়।

কিন্তু প্রিন্স খুব আস্তে আস্তে হোণ্ডা চালাচ্ছে। রাস্তা ভালো না। ইট বিছানো, দাদরা খাদরা। বেশ ঝাকুনি লাগছে। আমি জিজ্ঞেস করি, বাজার কদ্দূর?

আধ মাইল হবে।

বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এলে হতো। এখানে কি পাওয়া যাবে? কলা টলা। একদিন অনিয়ম হলে কি যায় আসে! বাড়ি থেকেই যদি খাবার নিয়ে আসবে তাহলে ঘুরতে বেরুনো কেন!

আমি রা করি না। প্রিন্স ঠিকই বলেছে। মাঝে মাধ্যে নিয়ম ভেঙে ফেলা ভালো।

একটা ছোট্ট ব্রিজ পেরিয়ে আমরা যেনো হঠাৎ করে অচেনা এক শহরে এসে পৌঁছি। জায়গাটা শহরের মতোই। দুপাশে সার সার এ জি বি টাইপের কলোনী। সবই পুরনো, ভাঙাচোরা। মাঝ দিয়ে রাস্তা। প্রিন্স বললো, জায়গাটার নাম পানাম। এখানে ঈসা খাঁর সৈন্যরা থাকতো।

আমি দুপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি। হরপ্পা মহেনজোদারো শহরের কথা মনে হয়। হিস্ট্রিতে পড়েছি 'নগর দুইটি ছিল সুপরিকল্পিত। সৈনিকদের জন্য ছিল শ্রেণীবদ্ধ আবাসগৃহ!' আসলে পৃথিবীর প্রতিটি শহর একই টেকনিকে গড়ে ওঠে। সময়ে শুধু চেঞ্জ হয়, এই যা।

কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি বেশ আশ্চর্য হই। প্রতিটি বিল্ডিংয়েই বসত বাড়ির চিহ্ন। কোনোটায় রেলিংয়ের সাথে কাপড় ঝুলছে, কোনোটার ছাদে বাচ্চা ছেলে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে আবার কোনোটার ভাঙা জানালায় রমণীর মুখ। প্রিন্সকে জিজ্ঞেস করি, এগুলোতে লোক থাকে নাকি?

দেখছো না! সব উদ্বাস্তু।

তাই বলে ঐতিহাসিক জায়গায়ও?

বাজারে পৌঁছে অবাক ব্যাপার। খাওয়ার কিছুই নেই। আর সারা বাজারে মাত্র একটি চায়ের দোকান। চা বিসকিট ছাড়া আর কিছু নেই। বয়ামে রাখা বিসকিটের চেহারা দেখেই বোঝা গেলো খাঁটি আটার তৈরি। খেলে পেটের বারোটা বেজে যাবে।

প্রিন্স সারা বাজার ঘুরে এক প্যাকেট গ্লুকোজ বিসকিট ম্যানেজ করে। আমি পারলে তখন লাফিয়ে উঠি। প্রিন্সকে বলি, বাঁচিয়েছেন স্যার। প্রিন্স হাসে। 'বান্দা যখন আছে বেঁচে, ভয় ভাবনা যাবে ঘুচে।' আমি তখন আর হাসতে পারি না। খিদেয় পেটের ভেতর মোচড়াচ্ছে। তাড়াতাড়ি প্যাকেট খুলে শুরু করি। প্রিন্স দুকাপ দুধের অর্ডার দিয়েছে। এখানকার দুধ খুব ভালো। খাঁটি।

ফেরার পথে প্রিন্স বললো, সামনের দিকে একটা বাড়ি আছে। খাঁ সাহেবের আমলেরই। পিকিউলিয়ার বাড়ি। এক ভদ্রলোক কিনে নিয়েছেন। কাউকে ঢুকতে দেন না। আমি একবার খুব রিকোয়েস্ট করেছিলাম। প্ল্যান ছিলো পায়েও ধরবো। শালা বাড়ি থেকেই বেরুতে চায় না। পরে যাও বেরুলো তার চেহারা দেখে কিছু বলার সাহসই পেলাম না।

আমি বললাম, চলো একবার এ্যাটেমপ্ট নিই।

মাথা খারাপ!

প্রিন্স খুব আস্তে ধীরে হোণ্ডা চালাচ্ছে। সিনেমায় মাঝেমধ্যে স্লো মোশান ইউজ করে না, অনেকটা ঐ রকম। আমি বিরক্ত হয়ে প্রিন্সকে বলি, তাহলে কি দেখাতে নিয়ে এলে?

ব্যাড লাক। আজ রোববার, কথাটা আমার একেবারেই মনে ছিলো না।

রোববার তো কি হয়েছে?

এখানে একটা মিউজিয়াম আছে, দেখার মতো। রোববার ওটা বন্ধ থাকে।

তাহলে চলো ফিরি।

মাত্র তো সাড়ে তিনটা বাজে। চলো এদিক ওদিক ঘুরি। পাঁচটার দিকে ফিরবো।

ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা বনভূমির মতো নির্জন জায়গায় চলে আসি। চারদিকে ছড়ানো ছিটানো লিচু গাছ আর মাঠ। মাঠের মাঝামাঝি খুব পুরনো একটা মন্দির। তীরের ফলার মতো মাথাটা ভেঙে ভোঁতা হয়ে গেছে। অরিজিন্যাল রংটাও আর নেই। পুরনো গাছের মতো ময়লা শরীর, কেউ যেনো জোর করে বেঁধে রেখেছে এমন ভঙিতে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনে বিরাট এক দীঘি। জলের ওপর রোদ পড়ে কাচের মতো জ্বলছে। মন্দির ফেলে আমরা আরো একটু দূরে চলে আসি। একটা চারা মতো লিচু গাছের সামনে প্রিন্স তার হোণ্ডা দাঁড় করায়। লিচু গাছটার ডালপালা মাটির সাথে কথা কয়, এমন। আমি গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসি। জায়গাটা আশ্চর্য নির্জন। একটা পাখি পর্যন্ত ডাকছে না। মাঠের মধ্যে কেবল রোদ ঝিমঝিম করছে। আর হাওয়া, তা প্রায় নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। এখন দুপুর ফুরিয়ে আসছে বলে গাছপালার ছায়া দীর্ঘ হতে শুরু করেছে।

প্রিন্স হোণ্ডার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরালো। আমি প্রিন্সকে দেখছিলাম। কালোর ওপর লাল বড়ো বড়ো ছোপের পাঞ্জাবী পরা। ওকে এখন বেশ অন্যরকম দেখাচ্ছে।

হঠাৎ ওর পায়ের দিকে তাকিয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠি। সাপ, সাপ।

প্রিন্স প্রথমে একটু থতমত খেয়ে যায়। তারপর পায়ের কাছে ফণা তোলা সাপ দেখে ফুটবল কিক করার মতো লাথি মেরে বসে। ওর পায়ে জুতো নেই, স্যাণ্ডেল শু। লাথিটা বেশ জোরে হলেও সাপটা খুব দূরে গিয়ে পড়ে না। অল্পদূরে পড়েই ফনা তুলে দৌড়ে আসে। আমি স্বপ্ন দেখার মতো দেখি সাপটা ঝিম কালো। গাটা বেশ তেলতেলে। রোদ পড়লেও পিছলে যাবে, এমন।

সাপটা এগিয়ে এলে প্রিন্স অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসে। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় সাপটার লেজ ধরে মাথার ওপর দুতিন পাক ঘুরায়। তারপর দূরে ঝোপঝাড়ের দিকে ছুড়ে ফেলে। সাপটা আর দেখা যায় না।

আমার কেমন এক ঘোর লেগে গিয়েছিলো। স্বপ্ন না সত্যি। ঘোর কাটতেই গাছ থেকে লাফিয়ে নামি। প্রিন্সকে এসে জড়িয়ে ধরি। আমি না দেখলেই হয়েছিলো।

প্রিন্স হাসে।

এই তুমি হাতটা ধুয়ে নাও।

চলো।

তারপর হোণ্ডা চেপে মন্দিরের কাছে দীঘির পাড়ে চলে আসি। পুরনো ঘাটলা বেয়ে প্রিন্স হাত ধুতে নেমে যায়। আমি মন্দিরের ঠাণ্ডা সিঁড়িতে গিয়ে বসি।

রোদ এখন মন্দিরের চূড়ায়। আমার পায়ের কাছে ছায়া হামাগুড়ি দিয়ে এগুচ্ছে। বেলা যে ফুরায়।

আমি প্রিন্সের কথা ভাবছিলাম। কি আশ্চর্য, একটা বিষাক্ত সাপ হাত দিয়ে ধরে অবলীলায় ছুড়ে ফেললো! ওর সবকিছুতে একটা বুনো ব্যাপার আছে। যাকে বলে আদিমতা। পুরুষ মানুষের এটা থাকতে হয়। নয়তো মানায় না।

প্রিন্স রুমালে হাত মুছতে মুছতে আমার পাশে এসে বসলো। আমি অবাক হয়ে ওকে দেখছিলাম। প্রিন্স হেসে বললো, কি দেখছো?

তুমি রুমাল ইউজ করো?

মাঝে মধ্যে।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস চাপি। প্রিন্স খেয়াল করে না। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরায়। আমি হাত বাড়িয়ে একটা নিই। প্রিন্স লাইটার জ্বেলে আমার মুখের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, একটা ধন্যবাদ দিলে না? আমি সিগারেটে পর পর দুটো টান দিয়ে বলি, জমা রইলো। কিছু অন্তত জমুক।

প্রিন্স মুগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আর আমি তখন অন্যকথা ভাবছি। প্রিন্স কখনো রুমাল ইউজ করতো না। জামা কাপড়েই হাতটাত মুছে নিতো। আজকাল বেশ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে।

প্রিন্স বললো, কি ভাবছো?

কিছু না। আমি প্রিন্সের দিকে তাকিয়ে দেখি ও অপলক আমাকে দেখছে। ওর দৃষ্টি খুব কোমল, কাপুরুষের মতো। আমি অবাক হই। ভেতরে ভেতরে চমকে উঠি। বুকের মধ্যে একটা কষ্টবোধ দ্রুত ছড়িয়ে যেতে থাকে। প্রিন্স, মেয়েমানুষের দিকে ওরকম তাকিয়ে থাকা তোমাকে মানায় না।

আমি প্রিন্সের দিকে তাকাই না। ওর হাতের সিগারেটটা দেখি অবিরাম পুড়ে যাচ্ছে। চিকন নীলাভ ধোঁয়া আঁকাবাঁকা উড়ে যাচ্ছে। প্রিন্স তখন গাঢ় করে ডাকলো, সজনী।

আমি চমকে চোখ তুলি। আবার নামিয়ে নিই। প্রিন্সের ভয়েস অমন মেকি হয়ে যাচ্ছে কেন! রাগে দুঃখে আমার কান্না পেতে থাকে।

সজনী আমি তোমাকে ভালোবাসি। কথাটা সম্পূর্ণ করে প্রিন্স খুব দুর্বল ভঙিতে সিগারেট ফেলে দেয়। তারপর ডান হাত দিয়ে আমার চিবুক তুলে ধরে। আমি প্রিন্সের দিকে তাকাতে পারছি না। হায় আমার সব স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে। আমার কি হবে গো! প্রিন্স আমি তোমার কাছে এসব চাইনি। তুমি আমাকে হোণ্ডার পেছনে বসিয়ে সারা শহর চক্কর দিয়ে ফিরবে। যখন যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে চলে যাবে। হাতে সাপ ধরে মাথার ওপর বোঁ বোঁ করে ঘোরাবে। শুধু সেই সব মুহূর্তে আমি তোমাকে ভালোবাসবো।

প্রিন্সের ঠোঁট এখন আস্তে আস্তে আমার ঠোঁটের দিকে নেমে আসছে। এইসব মুহূর্তে মেয়েরা সাধারণতঃ চোখ বুজে ফেলে। আমি বুজি না। আমার ভেতর সেই এক দুঃখ। আমার প্রিন্স, স্বপ্নের রাজ-পুত্র এখন কাপুরুষ কোটালপুত্র হয়ে যাচ্ছে! হায়! আমি আর নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না। ডান হাতে প্রচণ্ড এক চড় বসিয়ে দিই প্রিন্সের গালে। আমার চোখ দিয়ে জলও বেরিয়ে আসে।

চড় খেয়ে প্রিন্স অবাক হয়ে যায়। এবং পর মুহূর্তে নিজেকে সামলে নেয়। বুঝতে পারি, ওর দৃষ্টি ক্রমশঃ আদিম হয়ে উঠছে। চোয়াল আটো হয়ে বসেছে। নাক দিয়ে গরম নিঃশ্বাস বেরুচ্ছে। বাক আপ প্রিন্স। এই তো তুমি অরিজিন্যাল প্রিন্স হয়ে উঠছো। এই মুহূর্তে আমি তোমাকে ভালোবাসবো। তুমি কাপুরুষ হয়ে গেলে, কোটালপুত্র হয়ে গেলে আমি তোমাকে কেমন করে ভালোবাসি!

প্রিন্স নির্বাক মিনিটখানেক বসে রইলো। তারপর উঠে দ্রুত এগিয়ে

গেলো হোণ্ডার কাছে। আমি মুগ্ধ চোখে ওর হেঁটে যাওয়া দেখি। ওকে এখন সত্যি খুব ভালো লাগছে।

কিন্তু প্রিন্স হোণ্ডায় স্টার্ট দিচ্ছে কেন? আমি লাফিয়ে উঠি। এই, এই কি হলো?

প্রিন্স আমার কথা গ্রাহ্যই করলো না। নির্জন বনভূমি কাঁপিয়ে বিকট শব্দে হোণ্ডা চালিয়ে দিলো। আমার দিকে একবার ফিরেও তাকালো না।

প্রিন্স, তুমি রাগ করে চলে গেলে! এই নির্জন বনভূমিতে আমি একা কি করি! তবুও আমার খারাপ লাগছে না, দুঃখ হচ্ছে না। শুধু একটু একটু ভয় হচ্ছে। কোনো বিপদে না পড়ে যাই। তবুও এই মুহূর্তে আমি তোমাকে ভালোবাসি। এই রাগ করে চলে যাওয়া কেবল তোমা-কেই মানায়।

প্রিন্স কি সত্যি চলে গেলো!

কথাটা ভেবে আমি এবার পুরোপুরি ভয় পেয়ে যাই। প্রিন্স আমাকে একা এই নির্জন বনভূমিতে ফেলে চলে যাবে! ভাবতে অবাক লাগে। একাকী এই নির্জন বনভূমিতে, আঠারো বছর সাত মাসের যুবতী, জনী, সজনী যে যাই বলুক, একটু একটু ভয় পেতে থাকি। হায়। যদি কোনো অঘটন! আমি আর ভাবতে পারি না।

কিন্তু প্রিন্স ওরকম কাপুরুষের মতো ব্যবহার করলো কেন? ও জানে না, ওর আদিমতাই আমি ভালোবাসি!

এসব ভেবে রাগে দুঃখে আমার কান্না পেতে থাকে। পুরুষ মানুষরা আসলেই বড়ো বোকা, চিরকালের ছেলেমানুষ। মেয়েদের অরিজিন্যাল ব্যাপারটাই বোঝে না। আর নিজেদের এই অরিজিন্যালিটি বোঝানোর ক্ষমতাও কোনো মেয়ের থাকে না। নারীপুরুষের এমন কতোগুলো প্রোবলেম রয়ে গেছে যার সল্‌ভ অসম্ভব। আমি নিজেই কি বুঝি আমার সম্পূর্ণতা কোথায়?

হাঁটতে হাঁটতে এইসব ফিলসফি চলে আসে। আমি বিশ্বাসই করতে পারি না প্রিন্স আমাকে এইভাবে একা ফেলে চলে গেছে। অবশ্য ওর ক্যারেকটারে এটা মানায়। আমার ভালোও লাগে। কিন্তু এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে প্রিন্স কাছে কোথাও কোনো ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে। আমি ওকে দেখতে পাচ্ছি না, ও আমাকে ঠিকই দেখছে। যে কোনো মুহূর্তে আমাকে চমকে দেয়ার জন্য লাল হোণ্ডা চালিয়ে ভোঁ করে সামনে এসে দাঁড়াবে। হ্যালো জনী, হাউ আর য়ু?

বিকেল এখন দ্রুত পড়ে যাচ্ছে। গাছপালার ছায়া দীর্ঘ হতে হতে বনভূমি কাভার করে ফেলছে। দুএকটা পাখি ডাকছে, ওড়াউড়ি করছে। আমি পা চালিয়ে ভাঙা মন্দির, দীঘি আর লিচুবন পেরিয়ে আসি। তখন

একটা ব্যাপার খেয়াল করে বেশ অবাক হয়ে যাই। গাছপালার ভেতর মৃদু একটা চিনচিনে শব্দ। ঝিঝি পোকার মতো অবিরাম ডেকে যাচ্ছে যেনো! মনে হয় গাছপালারা সব নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করেছে। আমার ভয় বেড়ে যায়।

ইট রাস্তায় উঠে সিওর হয়ে যাই, প্রিন্স সত্যি সত্যি চলে গেছে। আমি এখন কি করবো? এদিকে আমি এই প্রথম। রাস্তাঘাট চেনা নেই। তাছাড়া বাসরাস্তা এখান থেকে অনেকদূর এটা আজ সকাল বেলাই জেনেছি। ইস কি যে বোকামি করে বসলাম।

বটগাছটার সামনে এসে পশ্চিম আকাশে তাকাই। প্রাচীন সূর্য খানিকটা রোদ ছিটিয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখতে পাই। তখন বুকের ভেতর একটু আশা জাগে। লাকিলি যদি পিকনিক পার্টিটা পেয়ে যাই তাহলে একটা ব্যবস্থা হবে। ওরা নির্ঘাৎ ঢাকার পার্টি। চাপাটাপা মারতে হবে। তাছাড়া একটা কোয়লিফিকেশান তো রয়েছেই। সুন্দরী মেয়ে।

স্পটে এসে দেখি, হায়, কেউ নেই। পার্টিটা চলে গেছে। আমার বুকের ভেতর দিয়ে আবার হু হু করে ভয় দুঃখ গড়িয়ে নামে। সামনে কয়েকটা লম্বা ঝাপড়ানো গাছ, তারপর বাঁয়ে প্রাচীন বাড়ি, পুকুর তার-পর খোলা ধুধু উদাস মাঠ। সেই মাঠ দিয়ে ম্যারাথন রেস করে অন্ধকার আসছে। আর বাতাস, মাতাল করা।

আমার কিচ্ছু ভাল্লাগে না। পুরোপুরি নার্ভাস হয়ে যাই। একটা দুর্ভেদ্য ট্র্যাপে পড়ে গেলাম যেনো। কি করবো, আমি এখন কি করবো! বাসরাস্তা এখান থেকে মাইলখানেক হবে। এ রাস্তাই। হাঁটতে থাকলে বিশ পঁচিশ মিনিটে পৌছে যাবো। আমি হাঁটতে শুরু করি।

একটা দুটো স্থানীয় লোক চোখে পড়ে। কৃষকশ্রেণীর। গরুটরু নিয়ে বাড়ি ফিরছে। কেউ আবার গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে ফিরছে। কিন্তু আমাকে দেখেই থেমে যাচ্ছে সব। তারপর হা করে আমার মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে সাইড দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমার ড্রেসটাই আজ আমাকে অনেকটা সেভ করছে। সহজে কেউ বুঝতেই পারবে না আমি মেয়ে। ব্যাপারটা ভেবে আমি একটু সাহসী হয়ে উঠি। তখন দূরের মাঠ থেকে গ্রামীণ গলার গান ভেসে আসে। কোনো উদাসী রাখাল বুঝি গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরছে। 'দিন ফুরাইলো সন্দা হইলো।' আমি চট করে চোখের ওপর আমাদের বাড়ির পেছন দিকের খালপাড় এবং জোপঝাড়ে ঢাকা নির্জন মাজারটা দেখতে পাই। রাতের বেলা সেখানে কয়েকটা ছেলে এসে বসে। একজন খুব ভালো গান গায়। আমার ঘর থেকে জায়গাটা দেখা যায়। কারো চেহারা দেখা যায় না। জায়গাটা কেমন ভূতুড়ে। আলো নেই। নিরেট অন্ধকার দেখায় দূর থেকে। ছেলেটা ঐ মাজারে বসে, কি যে আবেগে

গলা ছেড়ে গান গায়। আর আমি ঘরের ভেতর বসে ওর গান শুনতে শুনতে পাগল হয়ে যাই। এ রকম গান পৃথিবীর আর কেউ কি গাইতে পারে! এসব ভাবতে ভাবতে হাঁটছি। একটু দ্রুতই। তখন দূর থেকে দেখি সেই ভাঙা ব্রিজটার উপর একজন দাঁড়িয়ে আছে। পশ্চিম দিকে মুখ করা। ভঙিটা বড়ো উদাসীন। কাঁধে ওটা কি, ব্যাগ? লোকটি ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন? আমি হেঁটে হেঁটে এগুই। ভদ্রলোক হলে প্রোবলেমটা বলা যাবে। চাইকি বাসরাস্তা অবধি পৌঁছেও দিতে পারে। আমি মনে মনে একটু রিহার্সেল দিয়ে নিই। কথাটা বলতে হবে এইভাবে, দেখুন আমি ভীষণ বিপদে পড়েছি। এই এই ব্যাপার। কি ব্যাপার? একটা গল্প বানাতে হয়। ইয়েস। বলবো, আমি একটু ভেতরের দিকে চলে গিয়েছিলাম। স্রেফ একা। ফিরতে লেট হয়ে গেছে। দেখি ওরা আমাকে ফেলেই। দরকার হলে ইংরেজিতে বলবো।

কাছাকাছি এসে লাফিয়ে উঠি আমি। প্রিন্সের বয়সী সেই যুবক। কবি টাইপের। দুপুর বেলা পুকুর ঘাটে যাকে দেখেছিলাম জলের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। পেছনে কলাপাতার ছায়া। কোনো দিকে তার খেয়াল ছিলো না। এই জাতীয় লোকগুলি কেমন?

আমি পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেও সে টের পায় না। আমরা কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে স্ট্যাচু স্ট্যাচু খেলতাম। দৌড়ে কেউ কারো সামনে চলে এলে আঙুল তুলে বলা হতো, স্ট্যাচু। অমনি সে স্ট্যাচু হয়ে যেতো। যুবকের ভঙিটি ঐ রকম। যেনো কেউ, কোনো প্রতিপক্ষ খেলোয়াড় তাকে স্ট্যাচু করে রেখেছে। তার বাঁ হাতে ধরা সিগারেট, আমি দেখতে পাই অবিরাম পুড়ে যাচ্ছে।

যুবক আলতো আমার দিকে মুখ ঘোরায়। আবছা অন্ধকারেও তার সম্পূর্ণ অবয়ব আমার চোখে পড়ে। উ কি তীক্ষ্ণ চোখ তার, নিষ্পলক। যেনো এক মুহূর্তে আমার ভেতর পর্যন্ত দেখে ফেললো। আমি একটু কেঁপে উঠি। তারপর সামলে নিয়ে বলি, দেখুন আমি

জানি।

বয়সের তুলনায় ভয়েসটা একটু মোটা, গম্ভীর এবং পুরুষালী। তার ঠোঁটে কি হাসি!

আমি অবাক গলায় বলি, আপনি জানলেন কি করে?

জেনে যাই।

তাহলে চলুন। আমি হেসে বলি।

কোথায়?

পৌঁছে দেবেন না?

কোথায়?

এটা জানেন না?

আমি হাসি। সেও একটু হাসে। তারপর লম্বা পাঞ্জাবীর পকেট থেকে স্টার সিগারেটের প্যাকেট আর ম্যাচ বের করে সিগারেট ধরায়।

ভদ্রলোক চলে গেলেন কেন?

রাগ করে।

এটা কেমন রাগ! একটি মেয়েকে অচেনা জায়গায় ফেলে

ও খুব সেন্টিমেন্টাল।

বুঝতে পারছি। চলুন।

আমরা হাঁটতে শুরু করি। এখন আমার আর কোনো ভয় ভাবনা নেই। বাসে চড়লেই তো ঢাকা। একটু যা রাত হবে। ওটা ম্যানেজ করা যাবে।

যুবক খুব নির্বিকার হাঁটছে। আমার দিকে তাকিয়েও দেখছে না। বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। মাঝেমধ্যে ক্লান্ত বিষণ্ণ ভঙিতে ছোট টান দিচ্ছে। আমি আড়চোখে তাকে দেখি আর হাঁটি। ব্যাপারটা স্বপ্নের মতো লাগে। ঘোর সন্ধ্যায় কোনো অচেনা বিষণ্ণ যুবকের সঙ্গে নির্জন পথে হেঁটে যেতে কার না ভালো লাগে! কিন্তু একটা মেয়েলি দুঃখ আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো। সে আমার দিকে তাকাচ্ছে না কেন? কথাও বলছে না অনেকক্ষণ। তখন আমি একটা চালাকী করি। জাস্ট তাকে একটু গ্যাস করা। আপনি কি কবিতা লেখেন?

কেন বলুন তো?

এমনিতেই মনে হলো। আপনাকে চেনা চেনা লাগছে।

বিপদে পড়লে সব মেয়েরাই এরকম কথা বলে।

আমি বেশ অবাক হয়ে যাই। ইডিয়েট একটা। কি স্ট্রেট কাট কথা বলে। রাগ হতে হতে সামলে নিই। যুবক তোমাকে এ সবে মানায় বেশ। আমার একটু একটু কিউরিসিটি জাগে। আর দুএকটা খোঁচা মেরে দেখা যাক। বলি, আপনি কবি হলে বেশ মানাতো।

তাই নাকি?

সত্যি। আপনি আসলে লুকোচ্ছেন।

সে হো হো করে হেসে ওঠে। আর তাতে আমি সিওর হয়ে যাই। আছে, একটা কিছু নিশ্চয় আছে।

ততোক্ষণে আমরা পাকা রাস্তায় উঠে গেছি। এখন বেশ আলো-টালো দেখা যাচ্ছে। গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে একচোখা ভূতের মতো স্ট্রিট লাইট। পূব আকাশে একলা চাঁদ দেখা দিয়েছে। দুচার-জন লোক কথা বলতে বলতে হেঁটে যাচ্ছে। দূরে বড়ো রাস্তা আর বাস ট্রাকের শব্দ। আমার ভেতর রেফের মতো যে কাঁটাটা বিঁধে ছিলো তা হঠাৎ করে খুলে গেলো। আমি উচ্ছ্বসিত গলায় বলি, আপনি যাবেন কোথায়?

আমার কোনো ঠিক নেই।

মানে? আমি বেশ অবাক হই।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তারপর বলে, বাড়ি থাকতে আমার ভালো লাগে না। মাঝে মধ্যে হুটহাট বেরিয়ে পড়ি, যেদিকে ইচ্ছে চলে যাই। অর্থাৎ যেখানে রাত সেখানেই কাৎ।

শেষ কথাটা বলে সে একটু হাসে। আর আমি তাতে বুঝে যাই নিশ্চয় এ লোক কবি। শুনেছি কবিরা এরকম বোহেমিয়ান হয়। হঠাৎ করে আমার বড়ো সাধ হয়, আহা যদি এরকম জীবন কাটানো যেতো! একটা ছোট চায়ের দোকানের সামনে এসে সে বললো, আসুন চা খাই। আমি কথা না বলে তার পিছু পিছু দোকানে ঢুকে যাই। চা খাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। বাড়ি ফেরার তাড়া আছে ভুলে গেছি। সে বললে আমি হয়তো এক্ষুণি তার মতো বোহেমিয়ান হয়ে যেতে পারি। তার সাথে যেখানে খুশি চলে যেতে পারি।

চায়ের অর্ডার দিয়ে সে বললো, ঢাকায় ফিরতে আপানার বেশ রাত হয়ে যাবে।

হোক না।

সে আমার দিকে তাকায়। আমিও একপলক। দোকানে আর কোনো খদ্দের নেই বলে চা তাড়াতাড়ি চলে আসে। গ্লাসের চা। এই পরিবেশে গ্লাসের চা ই মানায়।

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বলি, বাড়ি ফেরেন না কদিন?

দিন দশেক হবে।

আশ্চর্য! আপানার নামটাই জানা হয়নি এতোক্ষণ।

ওটা না জানলেও চলবে। উল্লেখযোগ্য কিছু না।

তবুও।

থাক। আপানার কথা বলুন। আপনি কি পড়েন?

আর্টস। থার্ড ইয়ার।

চা শেষ করে সে সিগারেট ধরায়। আমার বড়ো ইচ্ছে করে একটা স্টার চেয়ে খাই। না থাক। বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

দোকান থেকে বেরিয়ে পুরো পাঁচ মিনিট লাগে বাসস্টপে আসতে। সে বললো, এখানে বাস বেশিক্ষণ দাঁড়ায় না। এলেই চট করে উঠে পড়বেন।

আপনি যাবেন না?

না। আমি এখানে আরো দুএকদিন থাকবো।

ঢাকা গেলে আপনি কোথায় থাকেন?

গেণ্ডারিয়া। ওখানে ভাই ভাবী আছে।

তখন দূরে একটা বাসের আলো দেখা যায়। সে বললো, বাস এসে গেছে। আমি কথা বলি না। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। সে তার কাঁধে

ঝোলানো ব্যাগ হাতরে কি একটা বই বের করে। স্ট্রিট লাইটের ছিটকে আসা আলোয় দেখি বইটির কভার লাল রংয়ের। তার উপর শাদা হরফে লেখা 'দাঁড়াও সুন্দর'। আর একটু উপরে লেখকের নাম 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়'। বাস এসে পড়লে সে তাড়াতাড়ি পকেট হাতড়ে নীল বল পয়েন্ট বের করে। খস খস করে বইয়ের পাতা উল্টে একটা লাইনের নিচে দাগ দিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়, এটা আপনি নিয়ে যান।
আমি কথা বলি না। হাত বাড়িয়ে বইটা নিই। তারপর বাসের পাদানিতে পা রেখে আস্তে করে বলি, আসি।

সে মাথা নাড়ে। বাস ছেড়ে দেয়। আমি জানালার পাশে বসে দেখি সে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করেছে। আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। তারপর বাসের ম্লান আলোয় বইটির পাতা উল্টে দেখি চক-চকে শাদা কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা, ওমর শরীফ। আমি একটু হাসি। তারপর সোফিয়া লরেনের মতো বলি, ইউ আর মাই হিরো।
আবার 'দাঁড়াও সুন্দরে'র পাতা উল্টাই। প্রথম কবিতাটিরই একটা লাইনের নিচে সে নীল কালিতে দাগ দিয়ে দিয়েছে। পড়ে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। 'হঠাৎ বনের পাশে সে আমাকে একটুখানি চমকে দেয়।'
বাড়ি ঢুকতেই জিম্মি ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। তারপর আমাকে দেখে থেমে গেলো। আমি জিম্মির মাথায় একটু হাত বুলিয়ে বারান্দায় উঠে আসি। চেম্বারে উঁকি মেরে দেখি বাবা গভীর মনোযোগে মোটা একটা বই পড়ছে। বাঁকা করা স্প্রিংয়ের টেবিল ল্যাম্প মুখের সামনে জ্বলছে। আমি বাবাকে ডিসটার্ব না করে দুটো করে সিঁড়ি একত্রে ভেঙে উপরে উঠে আসি।

উপরে উঠতেই মার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো মা। আমাকে দেখে মুখ ঘোরায়।
এখন সাড়ে দশটা বাজে। বাপ্পা ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবা নিচে চেম্বারে। বারোটা একটার আগে ফিরবে না। আমরা সবাই বড়ো বিচ্ছিন্ন। মার সাথে বাবার সম্পর্কটা বোধহয় খুব গভীর নয়। মাকে এজন্য মাঝে মধ্যে খুব অন্য রকম লাগে। বিষণ্ণ বিষণ্ণ। আমি একদিন গোপনে কাঁদতেও দেখেছিলাম মাকে।
মা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, এতো রাত করলে কেন?
সোনারগাঁ গিয়েছিলাম।
মা আর কিছু বলে না। আমি আমার ঘরে আসতে আসতে ভাবি, মা কি আমার ওপর রাগ করেছে।
ঘরে ঢুকে 'দাঁড়াও সুন্দর' বিছানার ওপর রাখি। তারপর মাথা থেকে প্রথমে উইগটা খুলি। তখন বিনী আসে। বিনীকে দেখে আমি একটু হাসি। শার্ট প্যান্ট সব খুলে ফেলি।

এখন বাথরুমে যাবো। গোসল না করলে হবে না। বিনীকে বললাম, খাবার সাজাগে। আসছি।

বিনী গেলে আমি বাথরুমে যাই। শাওয়ার ছেড়ে চার মিনিট; মাথা মুছতে মুছতে ডাইনিং টেবিলে আসি। আমি বাথরুমেই নাইটি পরে নিয়েছি। এখন আর অসুবিধা কি। শুধু তো মা আর বিনী। বাপ্পা ঘুমিয়ে পড়েছে। বাবা নিচে তার চেম্বারে। অপজিট নেই, ভাবনা কি!

খেতে বেশিক্ষণ লাগে না। বিনী বলে, আমার খাওয়া নাকি কুচো পাখির খাওয়া। আমি হাসি। কুচো পাখি কি?

ঘরে এসে গা ছেড়ে দিই। এখন বুঝতে পারছি আমি খুব টায়ার্ড। লাইট টাইট অফ না করেই একটু গড়িয়ে নিই। বিনী হরলিকস নিয়ে আসে। খেতে ভাল্লাগে না। বিনী ঘরের সব পর্দা টর্দা টেনে দেয়। আমি শুয়ে শুয়ে 'দাঁড়াও সুন্দরে'র পাতা উল্টাই। একটা লাইন ভীষণ ভালো লেগে যায়। 'ভালোবাসার পাশেই একটা অসুখ শুয়ে আছে।'

বিনী চলে গেলে আমি উঠে ড্রেসিং টেবিলে গিয়ে বসি। সারা গায়ে পাউডার ছড়িয়ে দিতে থাকি। একটু হাসি। হঠাৎ করে আয়নার জনীকে দেখে আমার মাথার ভেতর কি যে হয়ে যায়! অজান্তে উঠে দাঁড়াই। তারপর বলি, আমাকে নাও। আমাকে নাও।

কিন্তু আমায় নেবে কে? সেই পূর্ণতা কার আছে? একথা ভেবে আমার একটু একটু দুঃখ হতে থাকে। তারপর বিছানায় স্প্রে করে সেন্ট ছড়িয়ে দিতে থাকলে আমার মনে হয় পৃথিবীতে কি এমন এক-জনও নেই যার সেই পূর্ণতা আছে। আমার জন্য যে সকালবেলা জার্সি পরে দৌড়ে যাবে, আমাকে হোণ্ডার পেছনে বসিয়ে ঝড়ের মতো উড়ে যাবে কবিদের মতন স্ট্রেট কাট কথা বলবে, রাত্রে ঘুমুনোর আগে গান গেয়ে শোনাবে।

আমার মন খারাপ হয়ে যায়। রাগে, দুঃখে সেন্টের শিশিটা ছুঁড়ে ফেলি। তখন, ঠিক তখুনি অন্ধকার খালপাড় থেকে আমার সেই গায়ক, আমার জন্য, শুধু আমার জন্যই গেয়ে ওঠে। 'না সজনী না, আমি জানি জানি সে আসবে না'।

আমি ছুটে জানালার কাছে যাই। পর্দা সরিয়ে চীৎকার করে বলে উঠি, না না সে আসবে। সে ঠিক আসবে।

কিন্তু আমার গলায় শব্দ ওঠে না কেন? হায়, আমি কি করবো! আমার কি হবে!

জানালার গ্রীলে মাথা রেখে আমি তারপর হু হু করে কেঁদে ফেলি।

১৯৭৭

৩

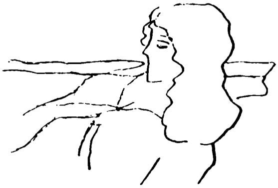

তুমি অতো রোগা হয়ে গেছো কেন?
কদিন খুব শরীর খারাপ ছিলো। তাছাড়া কাল রাতে একটুও ঘুমোইনি।
ঘুমোওনি কেন?
ঘুম আসে না।
আমারও। সারারাত জেগে থাকি আজকাল।
সুখীর এ কথায় আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। বিষণ্ণ চোখে সুখীর দিকে তাকাই। সুখীও খুব রোগা হয়ে গেছে। গায়ের রং আরো ফর্সা হয়ে গেছে। চোখের কোলে কালি! চোখ দুটো আগের মতো নেই। বসে গেছে। খেয়াল করে দেখলে বোঝা যায় সুখীর ভেতর কোথায় যেনো কি একটা ঘটে গেছে। দেখে আমার ভাল্লাগে না।
বলি, সুখী তুমি কখন এসেছো?
ঠিক ছটায়। জানি তুমি এখানে আসবে।
আমার জন্যেই এসেছো?
হ্যাঁ। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।
চলো কোথাও তাহলে বসি।
অনুষ্ঠান দেখবে না!
বটমূলের অনুষ্ঠানে দেখার কিছু নেই। শোনার। শুনেছি। পহেলা বৈশাখের সকালটা আজ ভালো কাটবে।
কেন?
অনেকক্ষণ রবীন্দ্র সঙ্গীত শোনা, তারপর তোমার সঙ্গে দেখা।
তুমি তো আর ছটায় আসোনি! তুমি এলে এইমাত্র।
কে বললো! আমি আধঘন্টা আগে এসছি।
একই কথা। ছটা থেকে আমি তোমাকে খুঁজছি। চারদিক তোলপাড় করে ফেলেছি খুঁজে।
এতোকাল পর তুমি আমাকে খুঁজতে এলে!
হ্যাঁ। আমি বড়ো দুঃখে আছি। দুঃখে থাকলেই তোমাকে আমার মনে পড়ে। আমি দেখেছি, যখন খুব সুখে থাকি, আনন্দে থাকি তখন তোমার কথা আমার একটুও মনে পড়ে না।
সুখীর একথা আমার ভালো লাগে না। ওর সঙ্গে দেখা বহুকাল পর। এক বছর হবে। বিয়ের পর সুখীর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। বিয়ের

দিন সকাল থেকে রাত অব্দি আমি সুখীর সঙ্গে ছিলাম। ওকে সবুজ পাথরের একটা আংটি দিয়েছিলাম। আংটিটা এখনো সুখীর হাতে।

'৭৭ এ, বিয়ের দুদিন আগে সুখী এসে বললো, বিয়ের দিন সকাল থেকে রাত অব্দি তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

শুনে আমি থ। বলি, একি সম্ভব! তোমার সঙ্গে তোমার বান্ধবীরা থাকবে, বোনরা থাকবে।

থাক না। তুমি আমার ডানপাশে বসে থাকবে। আর কারো সঙ্গে মিশতে পারবে না।

শুনে আমি হেসেছি। সুখী এরকমই।

বিয়ের দিন আমি সুখীর সঙ্গে ছিলাম। সারাক্ষণ। সুখী সবার কাছে আমার পরিচয় দিয়েছে, আমি ওর বন্ধু। কিন্তু কারো সঙ্গে আমাকে খুব বেশি কথা বলতে দেয়নি। আমি সুখীকে খুশি রাখার জন্যে কারো সঙ্গে কথাটথা বলিনি। মাঝে মধ্যে সিগারেট খেতে বাইরে গেলে সুখীর পারমিশান নিয়ে গেছি। সময় ছিলো দশ মিনিট। এক দশ মিনিটে সুন্দর একটা মেয়ের দিকে আমার চোখ পড়ে। মেয়েটিরও আমার দিকে। সুখীর বরপক্ষের কেউ। ইচ্ছে করলেই জমানো যেতো। ইচ্ছে করেনি। ভয়। বিয়ের দিন সুখীকে আমি দুঃখ দিতে চাইনি।

সন্ধেবেলা বরের পাশে গাড়িতে বসে জানালা দিয়ে সুখী আমাকে ডাকে। ওসময় মেয়েরা সাধারণতঃ কাঁদে। সুখী কাঁদছিলো না। আমি যেতেই বরের কোলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে সুখী আমার একটা হাত ধরে। বলে, তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো।

আমি বোকার মতো মাথা নাড়ি। সত্যি বলতে কি আমার তখন ভারি লজ্জা লাগছিলো। সুখীর মা বাবা ভাই বোন সব গাড়ির চারদিকে। আরো ম্যালা লোকজন। সবাই আমাকে যে কি ভাবে! তবুও সুখী আমার হাত ধরেছে, আমি কি করবো! আমি যে সুখীর হাতের পুতুল! বরের সঙ্গে চলে যাওয়ার পর সুখীর জন্যে সেদিন আমার একটু কষ্ট হয়েছিলো। বুকের ভেতর রিনরিনে একটা ব্যথা। সিগারেট টানতে টানতে উদাসভাবে নিজেকে সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, সুখীর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

এসব এক বছর আগের কথা। সুখীর সঙ্গে তারপর আমার আর দেখা হয়নি। সুখীর কথা মনেও পড়েছে খুব কম। জানি সুখী খুব সুখে আছে। ওর বর থাকে ওয়েস্ট জার্মানীতে। ভালো চাকরি করে। বিয়ের পর সুখীরও চলে যাওয়ার কথা। সুখী যায়নি কেন?

আনমনে এসব ভাবছি, সুখী জিজ্ঞেস করলো, কি ভাবছো?

আমি চমকে সুখীর দিকে তাকাই। তাকিয়ে থাকি। ও আজ গরদের পাটভাঙা শাড়ি পরেছে। বাদামী রঙের ওপর গাঢ় লাল পাড়। লাল

ব্লাউজ সুখীর গায়ে। আমি ছাড়া পৃথিবীর কেউ বুঝতেই পারবে না সুখী ভালো নেই। সুখীকে দেখে পাবলিক জমে যাবে। সুখী ভারি সুন্দর।

সুখী বললো, এক বছরে একবারও তুমি আমার খোঁজ নিলে না?

আমি চুপ করে থাকি। সুখী আবার বলে, আমি ভালো আছি কি খারাপ, তোমার কখনো জানতে ইচ্ছে করেনি?

আমি হেসে বলি, তুমি খারাপ থাকবে কেন! আমি তো শুনেছি তুমি বেশ আছো।

হুঁ বেশ আছি! সুখী একটু মুখ গোমড়া করে। দেখে আমি বলি, তোমার কি হয়েছে?

কিছু হয়নি। তারপর ম্লান হেসে বলে, তুমি কেমন আছো?

ভালোই তো! সুখী তারপর আমার হাত ধরে, চলো আমরা পার্কের ভেতর বসি।

যাই। তখনো বটমূলের অনুষ্ঠান চলছে। সুখীকে পেয়ে আমি গান শোনার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।

নির্জনে এসে সুখী বললো, তুমি আমার খোঁজ নাওনি কেন?

আমি আমতা আমতা করে বলি, তোমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন ভুল বুঝতে পারে। তাতে তোমার ক্ষতি হবে। আমার জন্য তুমি কষ্ট পাও এ আমি চাই না সুখী।

ও বাড়ির সবাই খুব ভালো। আমাকে ভারি আদর করে।

তুমিও তো আমার খোঁজ নিতে পারতে!

সুখী একটু চুপ করে থাকে। সেই ফাঁকে আমি আবার একটা সিগারেট ধরাই। দেখে সুখী বলে, তুমি অতো সিগারেট খাও কেন?

ভাল্লাগে।

সিগারেট খেলে আয়ু কমে যায়।

যাক। আমি বেশিকাল বাঁচতে চাই না।

আমিও। সুখীর একথায় এক ধরনের বিষণ্ণতা। মুখটা দুঃখি মানুষের মতো দেখায়। দেখে আমার বুকের ভেতরটা আবার একটু কাঁপে। সুখীর কি হয়েছে! সুখী কি ভালো নেই! জিজ্ঞেস করবো তার আগেই ও বললো, বহুকাল তোমার কথা আমার মনে পড়েনি। তুমি তো জানো আনন্দে থাকলে তোমার কথা আমি ভুলে যাই। কদিন ধরে খুব মনে পড়ছিলো। বাসায় যেতাম। তার আগেই আজকের দিনটার কথা মনে পড়লো। চলে এলাম।

আমি কথা বলি না। সিগারেট টেনে যাই।

সুখী বললো, আমি এখন কি করবো?

কি করবে মানে! আমি অবাক হয়ে সুখীর মুখের দিকে তাকাই। সুখী ম্লান হাসে। আমার কিচ্ছু ভাল্লাগে না।

ভাল্লাগে না কেন? বর তোমাকে চিঠি লেখে না?
লেখে তো! প্রতি সপ্তাহে ওর একটা করে চিঠি পাই। কতো কথা যে লেখে।
তুমি লেখো না?
খুব কম। তিন মাস পর সেদিন একটা লিখলাম। ওর খুব দুঃখ আমি বড়ো করে কেন চিঠি লিখি না! কি লিখবো বলো তো, আমি ভালো আছি, তুমি ভালো থেকো এরচে বেশি কি লেখার আছে!
বিয়ের পর তোমারও না চলে যাওয়ার কথা ছিলো! গেলে না কেন?
ভাল্লাগলো না। গিয়ে কি হবে! ও দুতিনটে চিঠিতে লিখেছিলো আমি না গেলে ও নিজেই চাকরি বাকরি ছেড়ে চলে আসবে। আমি মানা করেছি। তাতে ওর খানিকটা রাগও হয়েছিলো। বেশ কিছুদিন আমাকে চিঠি লেখেনি।
তোমার খারাপ লাগেনি?
না।
সত্যি?
তোমার সঙ্গে আমি মিথ্যে বলবো! আমার যে বিয়ে হয়েছে, মাঝে মধ্যে একথটাই ভুলে যাই।
আমি খানিক থেমে থেকে বলি, সুখী তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?
করো।
বরকে তুমি ভালোবাসো না?
ঠিক বুঝতে পারি না। ভালোবাসলে কি করতে হয় কিংবা কেমন লাগে আমি বুঝি না।
বরের জন্যে তোমার কখনো মন কেমন করে না? কখনো কষ্ট হয় না, কান্না পায় না?
একটুও না। সুখী এই কথাটা বলে একেবারে নির্বিকারভাবে। আমি জানি ওর ভেতর কোনো চালাকি নেই, ঘোরপ্যাঁচ নেই। সুখী যা বলে সরাসরি বলে। সরাসরি কথা বলা কি মেয়েদের একটা খুঁত! আমি ঠিক জানি না। সুখীকে আমার ভালো লাগে ওর এই সরাসরি কথা বলার জন্যেই। কিন্তু বরের সঙ্গে সুখীর সম্পর্কটা কি একটু ছাড়া ছাড়া! নয়তো মানুষটার জন্যে সুখীর কোনো ফিলিংস নেই কেন! সুখী কি তাহলে অন্য কাউকে?
আমার মাথার ভেতরটা গুলিয়ে যায়। পুরনো শহরে, আগে ওরা যেখানে থাকতো, সেখানে সুখীর ম্যালা প্রেমিক ছিলো। সুখী কাউকে ভালোবাসতো না, ওকে সবাই ভালোবাসতো। সুখী যখন কলেজে যেতো তখন রাস্তার মোড়ে মোড়ে প্রেমিকরা দাঁড়িয়ে থাকতো। ও ছাদে উঠলে চারদিকের ছাদে সুন্দর আর লেটেস্ট জামা কাপড় পরে

উঠতো উঠতি সব মাস্তানরা। একটা ছেলে তো পুরো তিনটে বছর ব্যয় করলো সুখীর পেছনে। সুখীকে ছায়ার মতো ফলো করতো, সুখী কখন কলেজে যায়, কখন ফিরে আসে, কখন ছাদে ওঠে।
এসব ব্যাপারে সুখী খুব নির্বিকার ছিলো। কাউকে ওর ভালো লাগতো না। ম্যালা প্রেমপত্র পেতো, আমাকে পড়াতো আর হাসতো। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছাদের ওপর থেকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতো।
সুখী এ রকম। এই রকম মেয়েদের তো খুব স্বামীভক্ত হওয়ার কথা। স্বামীকে খুব ভালোবাসার কথা সুখীর। এতোকাল আমি তাই জানতাম। আজ সুখীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে টের পাচ্ছি আমার সব ধারণা টারণা মিথ্যে।
সুখী বললো, ওর এক বোন তোমার ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টেড।
যা।
সত্যি। বিয়েতে নাকি তোমাকে দেখেছিলো। আমাকে তোমার সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করেছে। আমি সব বলেছি।
কি সব বলেছো!
তুমি কি করো না করো এই সব।
তারপর?
সুখী আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। আমি খেয়াল করি ওর হাসিটিও আর আগের মতো নেই। সুখীর ভেতর কোথায় যেনো সত্যি সত্যি কি একটা ঘটে গেছে!
সুখী বললো তোমাদের বাসায় যেতে চেয়েছে, নিয়ে যাবো একদিন।
আমি কোনো কথা বলি না। বুঝতে পারি সুখীর বিয়ের দিন সেই যে সুন্দর একটা মেয়ে দেখেছিলাম এবং মেয়েটিও আমাকে, এই সেই মেয়ে, ওর কথা আমার ভুলেও কখনো মনে পড়েনি। এখন সুখীর মুখে শুনে বেশ লাগছে। চেপে রেখে আবার একটা সিগারেট ধরাই। টান দিয়ে বলি, সত্যি করে বলো তো সুখী তোমার কি হয়েছে?
কি যে হয়েছে বুঝতে পারি না। কিচ্ছু ভাল্লাগে না। ঘুম আসে না, সারারাত জেগে থাকি। বুকের ভেতর খুব কষ্ট হয়।
জেগে থেকে কি ভাবো?
কিছু কিন্তু ভাবিও না। কোনো কিছু তেমন মনেও পড়ে না।
তাহলে?
আমি বোধহয় বেশিদিন বাঁচবো না।
এমন করে বলো না। বেঁচে থাকা খুব আনন্দের। ভালো ডাক্তার টাক্তার দেখাও। দূর্বলতা থেকেও এরকম হয়। সেরে যাবে।
ডাক্তার দেখাইনি বলছো। প্রায়ই ডাক্তার আসে বাসায়। ভ্যালিয়াম দিয়েছে টু মিলিগ্রাম। তিনটে চারটে খাই তবুও ঘুম আসে না। ডাক্তারকে এসব বলি না।

ভুল করছো।
সুখী আর কোনো কথা বলে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।
সিগারেটে শেষ টান দিয়েছি, সুখী বললো, আমি মরে গেলে তোমার খুব কষ্ট হবে?
একথায় আমার ভেতরটা কেঁপে ওঠে। সুখী এরকম করে বলছে কেন? সুখী কি তাহলে সত্যি সত্যি! ডাক্তার ওকে শেষ কথা বলে দিয়েছে! ও আমার কাছে সব লুকিয়ে রেখে এসব জানতে চাইছে? ভেবে আমার ভেতর কিছু একটা ভাঙচুর হয়। গলা শুকিয়ে আসে, চেহারা মলিন হয়ে যায়। সুখী মরে গেলে আমার আসলেই খুব কষ্ট হবে। কেন? নিজেকে আবার এক বছর পর জিজ্ঞেস করি, ওর সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?
ভেতর থেকে কোনো জবাব আসে না। আমি চুপ করে সুখীর পাশে বসে থাকি। কথা বলি না। সুখী কি আমাকে খেয়াল করে! সুখীর মরার কথা শুনে আমি চেঞ্জ হয়ে গেছি তা কি বুঝতে পারে!
খানিক পর সুখী আমার হাত ধরে নাড়া দেয়। কি হলো, চুপ করে আছো কেন?
আমি সুখীর দিকে তাকাই। বুঝতে পারি আমার তাকানোর ভেতর এক ধরনের বিষণ্ণতা। সুখী মরে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে। কথাটা আমি ওকে বলতে চাই। পারি না। সুখী বলে, জানি আমার মরে যাওয়ার কথা শুনলে তুমি খুব দুঃখ পাবে। আমার জন্যে তুমি এরকম দুঃখ পাও বলেই অসময়ে তোমার কথা আমার খুব মনে পড়ে। আমি কথা বলি না। কি বলবো, আমার বুকের ভেতর কেমন করে।
সুখী বলে, কিছু বলো।
কি বলবো, আজ থেকে আমি বড়ো দুঃখি হয়ে গেলাম সুখী।
সে আমি জানি। কিন্তু দুঃখ পেয়ে কি লাভ!
জানি না। তোমার জন্যে হয়তো চিরকালই আমি দুঃখ পাবো।

একথায় সুখী একটু হাসে। তারপর আমার ডান হাতটা ধরে আস্তে আস্তে আঙুল নিয়ে খেলা করে। নরম ভঙিতে হাত বুলিয়ে দেয় আমার হাতে। তখন আমার বুকের ভেতর কোমল একটা আবেশ খেলা করে। এরকম কিছু আদর স্নেহের নামই কি! অথবা সুখীর জন্যে আমি যে দুঃখ পাচ্ছি এর নামই কি!
জানি না, জানি না।

সুখী বললো, বুকের ভেতর দারুণ একটা ব্যথা হয় আমার। কিরকম ব্যথা কাউকে বোঝানো যায় না। আমি মরে যাবো, সত্যি মরে যাবো। আমি সুখীর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। সুখী এমন বিষণ্ণ হয়ে গেলো কেন! এখনো কি সুখীর বুকে ব্যথাটা হচ্ছে! জিজ্ঞেস করবো, তার

আগেই টের পাই আমার বুকের ভেতর অচেনা রিনরিনে একটা ব্যথা। ব্যথায় আমি কুঁকড়ে যাই। সুখীকে বুঝতে দিই না কিছু। চেপে থাকি। সুখীর বুকের ব্যথাটা কি এই রকম! আমার তো কখনো এমন ব্যথা হতো না। তাহলে! মুহূর্তে বুঝতে পারি এটা আসলে সুখীর বুকের ব্যথাই। ভাগাভাগি করে আমার বুকে খানিকটা চলে এসেছে। এর মানে কি? এই ব্যথার নামই বা কি?

জানি না, জানি না।

ফেরার পথে, রিকশা চড়ে সুখী বললো, তুমি আমাকে চিঠি লিখো। আমি রিকশার সামনে দাঁড়িয়ে। হাওয়ায় আমার চুল উড়ছিলো, পাতলা পাঞ্জাবী উড়ছিলো। বললাম, চিঠি লিখে কি হবে?

ভালো লাগবে। তোমাকে নিয়ে খানিকটা ভাবা যাবে। হয়তো বা বুকের ব্যথাটাও একটু কমবে।

সুখী চলে যায়। ফাঁকা রাস্তায় দাঁড়িয়ে টের পাই বুকের ব্যথাটা হচ্ছেই আমার। ব্যথাটা তীব্র হলে আমিও কি সুখীর মতন মরার কথা ভাববো! আজ থেকে আমারও কি রাতের বেলা ঘুম আসবে না! দুটো করে ভ্যালিয়াম খাবো!

জানি না, জানি না।

১৯৭৮

মনের অসুখ

দূর থেকে বর্ষা ডাকে, এই তুমি অতো তাড়াতাড়ি হাঁটছো কেন?

আমি চমকে পেছনে তাকাই। বর্ষাকে ফেলে কখন খানিকটা দূরে চলে এসেছি বুঝতে পারিনি। বর্ষার সঙ্গে থেকেও কি আমি এতোক্ষণ একলা ছিলাম! অতো তাড়াতাড়ি হাঁটছি কেন! আমার কি কোথাও যাওয়ার কথা। দূরে, বহুদূরে!

রাস্তার ওপর ঝুঁকে আছে গাছপালা। নিবিড় ছায়া পড়ে আছে সরু রাস্তার ওপর। বহুকালের পুরনো বাগান বাড়ি। কতো যে গাছপালা! বনভূমির মতো। দুপুরের রোদ ডালপালার ফাঁক ফোঁকর দিয়ে এসে পড়েছে মাটিতে। হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপে রোদ, টুকরো কাগজের মতো। কাছে পিঠে কোনো লোক নেই। তীব্র নির্জনতা বয়ে যায় চরাচরে। দূরে গাছপালার আড়ালে গোপনে ডেকে যায় কি একটা পাখি। সেই নির্জন-

তায় দাঁড়িয়ে আমি একটা সিগারেট ধরাই। তারপর উদাস বিষন্ন ভঙিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি বর্ষা হেঁটে আসছে।

বর্ষা পরেছে শাদা শাড়ি। লাল পাড়। গায়ে তীব্র লাল ব্লাউজ। ঠোঁটে হালকা লাল লিপস্টিক। আর কপালে সুন্দর লাল টিপ।

কাঁধে বাটিক প্রিন্টের সুন্দর ব্যাগ বর্ষার। ইউনিভার্সিটি থেকে এসেছে। পায়ে উঁচু হিলের স্যাণ্ডেল। হাঁটলে বর্ষাকে দেখায় বাচ্চা মেয়ের মতো। সদ্য হাঁটতে শিখছে, এমন বাচ্চা মেয়ের মতো টলমল পায়ে হাঁটছিলো বর্ষা। কাছে এসে বর্ষা বললো, আমি তোমার সঙ্গে হেঁটে পারি না। তারপর হাসলো।

বর্ষা হাসলে মুহূর্তে সুন্দর হয়ে যায় পৃথিবী। কেন যে মনে হয় এইমাত্র মেঘ কেটে উজ্জ্বল হয়ে গেলো চারদিক। এই রকম সুন্দর দৃশ্যের কাছে বহুকাল নতজানু হয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে বর্ষাকে দেখি। হাঁটার ক্লান্তিতে বর্ষা এখন মৃদু হাঁপাচ্ছে। নাকের তলায় মুক্তোবিন্দুর মতন জমেছে ঘাম। আমার ইচ্ছে করে আলতো করে একবার ছুঁয়ে দিই বর্ষাকে। আমার ইচ্ছের কথা কখনো বর্ষাকে বলা হয় না।

বর্ষা বললো, চলো কোথাও বসি।

কেন পুরোটা ঘুরে দেখবে না?

কি দেখবো, সবই তো গাছপালা।

তবুও বিখ্যাত জায়গায় এলে সবকিছু ঘুরে দেখতে হয়।

আমি আর পারবো না।

আমি হাসি। তুমিই তো আমাকে নিয়ে এলে।

বেশ করেছি। আমি নিয়ে এসেছি এখন আমার কথা তোমাকে শুনতে হবে।

কি কথা?

আমি এখন বসবো।

আমি বর্ষার ইচ্ছের কাছে হেরে যাই। হেরে যাওয়ার যে কি আনন্দ! সামনে একটা বাঁধানো বেদী। চারদিকের গাছপালা জড়াজড়ি করে ছায়া ফেলে রেখেছে বেদীর ওপর। বর্ষা আর আমি পাশাপাশি হেঁটে বেদীটায় গিয়ে উঠি। উঠেই বর্ষা খুশিতে হাততালি দিয়ে ওঠে। বা কি সুন্দর জায়গা।

আমি অবাক হয়ে দেখি বেদীটা আসলে একটা ঘাটলা। দুপাশে পুরনো কালের বাঁধানো কারুকাজ করা চওড়া বেঞ্চ। তারপর দীর্ঘ সিঁড়ি থাক থাক নেমে গেছে ছোট্ট পুকুরে। পুকুরে এক ফোঁটা জল নেই। একটা ভাঙা ড্রাম পড়ে আছে পুকুরের মাঝখানে। তার ছিদ্র দিয়ে হু হু করে বাতাস গড়িয়ে যায়।

বর্ষা কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রাখে। তারপর দুসিঁড়ি নিচে গিয়ে বসে। আমি বসি বর্ষার পাশে। তারপর উদাস চোখে চারদিকটা দেখি।
বর্ষার পায়ের কাছ থেকে পাতা বাহারের টব সার ধরে নেমে গেছে নিচে। শেষ টবটার ওপর কোথা থেকে এসে পড়েছে এক চিলতে রোদ। পুকুরের ওপাশে ছোট্ট একটা সিঁড়ি। শাদা রংয়ের। ভারি সুন্দর হয়ে উঠে গেছে উপরে। উপরে চারদিক রেলিং দেয়া একটা ব্যালকনী ঝুঁকে পড়েছে পুকুরের ওপরে। ঝকঝকে শাদা রং করা গ্রিল। কোথাও কেউ নেই। শব্দ নেই। নির্জনতায় পুরো দৃশ্যটা আমার কাছে স্বপ্ন হয়ে যায়। দেখি টলটলে জলের একটা পুকুর। পুকুরে ফুটেছে অজস্র লাল পদ্ম। ওপাশের ব্যালকনী থেকে পুকুরের ওপর এসে পড়েছে শাদা জ্যোৎস্না।
বর্ষা বলে, কথা বলছো না কেন ?
কি বলবো ?
বা এই রকম চমৎকার পরিবেশে বসে তুমি কোনো কথা বলবে না!
আমি বর্ষার মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, তুমি বলো।
আমি কি বলবো ?
মানুষের তো কতো কথা থাকে !
শুনে বর্ষা হাসে। আমি তোমার কথা শুনতে চাই। তুমি কখনো তোমার কোনো কথা আমাকে বলো নি।
তুমি শুনতে চেয়েছো ?
বর্ষা হাসে। এই তো চাইছি।
বর্ষার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার আবার সেই ইচ্ছেটা হয়। বর্ষাকে একটু ছুঁয়ে দেবো! কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাই, বর্ষাকে আমার অনেক কথা বলার ছিলো। বলা হয়নি। এরকম নির্জনতায় বর্ষাকে আমি অনেককাল ধরে চেয়ে আসছি। আজ সুযোগটা পেয়ে আমার সব গুলিয়ে যায়। বর্ষাকে আমি কি বলবো, কি কথা!
আমি আবার সিগারেট ধরাই।
বর্ষা বললো, তুমি অতো সিগারেট খাও কেন ?
ভাল্লাগে।
সিগারেট খেলে ফুসফুস নষ্ট হয়ে যায়। ক্যান্সার হয়।
হোক। ক্যান্সার আমার ফেবরিট অসুখ।
বর্ষা দুঃখি মানুষের মতো আমার দিকে তাকায়। তুমি অমন করে কথা বলো কেন ?
দুঃখ পেলে ?
বর্ষার মুখে হঠাৎ করে চলে আসে এক ধরনের অভিমান। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলে, আমি কারো জন্যে দুঃখ পাই না।
ঠিক তখুনি চারদিকের পৃথিবীতে এসে পড়ে মেঘের ছায়া। গাছপালা

থেকে নিবিড় হয়ে নামে অন্ধকার। মুহূর্তে পাল্টে যায় ঝকঝকে দিনটা। ম্লান বিষন্ন হয়ে যায় ওপারের ব্যালকনী। স্বর্গের বারান্দা।

বর্ষা বলে, বৃষ্টি হবে নাকি!

আমি হাসি। ও কিছু না।

কিছু না মানে?

তুমি অভিমান করলে পৃথিবী বিষন্ন হয়ে যায়। সূর্যের তলায় এসে জমে মেঘ। গাছপালা ম্লান হয়ে অন্ধকার ছড়ায়।

ইস তুমি কি সুন্দর করে কথা বলো।

তাই নাকি!

হ্যাঁ। আমার ইচ্ছে করে চিরকাল তোমার পাশে বসে এইসব কথা শুনি। তখন আমার আবার সেই ইচ্ছেটা হয়। হঠাৎ করে বলে ফেলি, বর্ষা, তোমার হাত ধরি?

ধরো। তারপর ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। আমি তাকিয়ে হাতটা দেখি। ধবধবে শাদা, মসৃন সুডৌল হাত বর্ষার। লম্বা নখে লাল নেইলপলিশ। হাতটা একটু ভেজা ভেজা বর্ষার। সেই হাতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে আমি একটা গন্ধ পাই। শৈশব শৈশব গন্ধ। এই রকম একটা গন্ধ কতোকাল আগে ফেলে এসেছি।

দুহাতে বর্ষার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরতে যাই। তখুনি বর্ষা খিলখিল করে হেসে হাতটা সরিয়ে নেয়। তারপর স্যাণ্ডেল খুলে রেখে মুহূর্তে বাচ্চা মেয়ের মতো সিঁড়ি ভেঙে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যায়। আমি অবাক চোখে বর্ষার নেমে যাওয়া দেখি। বর্ষাকে আমার ছোঁয়া হলো না। নিচে নেমে বর্ষা আমায় হাত ইশারায় ডাকে।

আমি বসে থাকি। বসে বসে বর্ষাকে দেখি।

ততোক্ষণে মেঘ কেটে আবার ঝলমল করে উঠেছে পৃথিবী। আমার মনে হয় বর্ষা যে মুহূর্তে হেসেছে ঠিক তখুনি মেঘ কেটে গেছে। হেসে উঠেছে পৃথিবীও।

পুকুরে নেমে বর্ষা আস্তে ধীরে হাঁটে। ভাঙা ড্রামটার কাছে গিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়ায়। তারপর ওপাশের ছোট্ট সিঁড়িতে পা দেয়।

সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে বর্ষা আবার আমায় হাত ইশারায় ডাকে। এসো, হাত ধরো।

আমি বসে থাকি।

বর্ষা খুব সুন্দর ভঙিতে ওপরে উঠে যায়। ওপরে ব্যালকনীতে গিয়ে আমার মুখোমুখি দাঁড়ায়। বর্ষাকে যে কি সুন্দর লাগে। ছবির মতো। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে সুন্দর একটা ছবি দেখি। স্বর্গের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে নারী। সে আমার অচেনা।

ব্যালকনীতে দাঁড়িয়ে বর্ষা আবার আমায় হাত ইশারায় ডাকে। এসো, হাত ধরো।

আমার যাওয়া হয় না। কেন যে মনে হয় ওই সুন্দর দৃশ্যের ভেতর দাঁড়িয়ে যে নারী সে আমার অচেনা। জীবনের ওপারে দাঁড়িয়ে আছে। এর সঙ্গে আমার কখনো কোথাও দেখা হয়নি। কখনো বলা হয়নি, ভালো আছো ?

আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছা করে, বর্ষা স্বর্গের কোনো মানুষ আমি চিনি না।

আমি কি বর্ষাকে ভালোবাসি ! অথবা বর্ষা আমাকে !

আমি কখনো বর্ষাকে বলিনি, বর্ষা তোমাকে ভালোবাসি। বর্ষা কখনো আমাকে বলেনি, চন্দন, তোমাকে ভালোবাসি। তবুও বর্ষার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়ে যায়। কখনো আমি বর্ষার কাছে ছুটে যাই । কখনো বর্ষা ছুটে আসে আমার কাছে। কেন যে এই আকর্ষণ !

বর্ষার সঙ্গে দেখা হলে, খুব নির্জনে আমার কতোবার যে ইচ্ছে হয়েছে, বলি, বর্ষা তোমাকে ভালোবাসি। কতোবার যে ইচ্ছে হয়েছে বর্ষাকে ছুঁয়ে দিতে।

কিন্তু আমার ইচ্ছের কথা বর্ষাকে কখনো বলা হয় না। কেন যে মনে হয় ওসব কথা শোনার পর বর্ষা খুব রাগ করবে। আমার সঙ্গে কখনো আর দেখা করবে না। সে বড়ো কষ্টের। সে বড়ো দুঃখের।

সেদিন পুরনো জমিদারের বাগান বাড়ি বেড়াতে গিয়ে বর্ষাকে বলেছিলাম, তোমার হাত ধরি।

বর্ষা বলেছে, ধরো।

তারপরই একটা ছেলেখেলা। বর্ষার হাত আমার ছোঁয়া হয়নি। রাতেরবেলা সেই নিয়ে কি যে কষ্ট! একটা লজ্জা, একটা সংকোচ বারবার আমাকে নুইয়ে দিয়ে গেছে।

তারপর দশ দিন কেটে গেছে, বর্ষার সঙ্গে আমার দেখা নেই। প্রতিদিনই ইচ্ছে হয়েছে বর্ষার সঙ্গে দেখা করি। কিন্তু ইচ্ছেটাকে জোর করে দমিয়ে রেখেছি। বর্ষার হাত ধরতে চেয়েছি এই নিয়ে বর্ষা যদি কিছু মনে করে থাকে! বর্ষা যদি আগের মতো উচ্ছল গলায় আমার সঙ্গে কথা না বলে! তাহলে লজ্জায় আমি মরে যাবো।

দশ দিন পর এক সকালে বর্ষা এসে হাজির। সঙ্গে আরো দুটো মেয়ে। মেয়ে দুটোকে আমি চিনি। পান্না আর রানু। বর্ষার সঙ্গে পড়ে। আর আছেন আমাদের রবিদা! রবিদা একটা কলেজে বাংলা পড়ান। পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ বছর বয়স। এখনো বিয়ে করেন নি। ভারি

আমুদে মানুষ। বর্ষাই আমাকে, বহুকাল আগে একদিন রবিদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো।

আমি তখনো শুয়ে আছি। চারজন মানুষ সরাসরি আমার ঘরে ঢুকলো। ঢুকে একেবারে আমার খাটের কাছে। আমি শুয়ে শুয়ে কিছু একটা ভাবছিলাম। এই আমার এক অভ্যেস। ঘুম ভাঙার পর ছেলেবেলা থেকেই আমি আরো বেশ কিছুটা সময় বিছানায় শুয়ে থাকি। শুয়ে শুয়ে কতো কি যে ভাবি!

আমার চোখের ওপর আড়াআড়ি পড়েছিলো ডান হাত। চারজন মানুষের পায়ের শব্দে হাতটা সরাই। তারপর বর্ষার সঙ্গে রানু পান্না আর রবিদাকে দেখে লাফিয়ে উঠি। আরে রবিদা।

রবিদা হাসেন। ওঠো চন্দন কুমার। নটা বাজে।

কথাটা বলেন এমন স্বরে, শুনে মনে হয় আমার মৃত বাবা কথা বলছেন। হাসি পায়।

আমি বর্ষার দিকে এক পলক তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। তারপর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শার্ট প্যান্ট পরে মাথাটাথা আচড়ে ভদ্রলোক হয়ে ঘরে আসি। বর্ষা রানু পান্না আর রবিদা তখন কি এক কথায় খুব হাসছে। আমি আসায় বর্ষার হাসিটা আরো বেড়ে যায়।

রবিদা বলেন, বা একেবারে ফুলবাবুটি যে!

আমি কথা বলি না। মৃদু হেসে রবিদার পাশে বসি। চাকর ছেলেটা তখন ট্রেতে করে পাঁচজনের নাস্তা, মডার্ণ ব্রেড মাখন ডিম আর চা দিয়ে যায়। দেখে বর্ষা বলে, খেয়ে এসছি।

তাতে কি! আবার খাও।

তারপর রবিদা আর রানু পান্নার দিকে তাকিয়ে বলি, খাও।

নাস্তাটাস্তায় হাত না দিয়ে চায়ের কাপে হাত দেয় সবাই। কেবল আমি এক টুকরো রুটি খাই। তারপর চা। চা খেতে খেতে আড়চোখে বর্ষাকে দেখি। বর্ষা আজ পরেছে কলাপাতা রংয়ের শাড়ি। কি যে সুন্দর লাগছে বর্ষাকে! আর একটা ব্যাপার এই প্রথম আমার চোখে পড়ে, বর্ষার চোখে একধরনের চঞ্চলতা আর উদাসীনতা এক সঙ্গে খেলা করে। দেখে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

রবিদা বললেন, চলো হে বেরুই।

আমি অবাক হয়ে বলি, কোথায়?

বর্ষা বললো, আমরা আজ সারাদিন ঘুরবো।

আমি আবার বলি, কোথায়?

যেখানে ইচ্ছে।

রানু বললো, আপনার অসুবিধা আছে?

শুনে আমি হাসি। এই মেয়েটাকে আমি দিদি বলে ডাকি। ওর চেহারায়

সব সময় আপাত গম্ভীর একটা ভাব। কথা বলে গার্জিয়ান গার্জিয়ান সুরে। আমি রানুর দিকে তাকিয়ে বলি, কিন্তু দিদি

কথাটা শেষ হয় না। পান্না বলে, ওসব পোজপাজ ছাড়েন তো! চলুন। পোজপাজ কথাটা শুনে বর্ষা খুব হাসে। তারপর হঠাৎ উদাস হয়ে এমন চোখে আমার দিকে তাকায়, দেখে আমি নিঃশব্দে জেনে যাই, আমি না গেলে বর্ষার সব ভ্রমণ বিস্বাদ হয়ে যাবে। আর কি আশ্চর্য রবিদা ঠিক তখুনি বলেন, আমরা কি আর তোমার কথা ভেবেছি। ভেবেছেন তো বর্ষা দেবী। তিনি বললেন তোমাকে না নিলে ওঁর খুব কষ্ট হবে। শুনে বর্ষার মুখে হালকা এক ধরনের রাগ খেলে যায়। রবিদা, আমি কিন্তু অমন করে বলিনি!

ওই হলো। চলো তো, নাটকটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে।

আমরা বেরুই। বেরুনোর আগে আমি একবার, মাত্র একবার আমার পকেটের কথা ভাবি। পকেটে পঞ্চাশ ষাট টাকা আছে। চলবে! এখন শুধু সুলতানের দোকান থেকে বাকিতে এক প্যাকেট ফাইভ ফাইভ নেবো। ব্যাস।

বারোটা বাজার কয়েক মিনিট আগে আমরা নয়ারহাট বাজারের সামনে এসে নামি। প্ল্যানটা এসেছিলো রবিদার মাথায়। এদিকটা তার ভালো চেনা। একটু উদাসীন মানুষ। কবি প্রকৃতির। প্রায়ই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ান রবিদা। যখন যেখানে খুশি চলে যান। গুলিস্তান বাস টার্মিনালে এসে রবিদাই প্রথম বলেন, চলো নয়ারহাটের দিকে চলে যাই।

আমার কোনো মতামত ছিলো না। ওরা যেখানে নিয়ে যায় যাবো। শুধু বর্ষার কাছাকাছি থাকতে পারলেই হলো।

মেয়েরা সবাই এক কথায় রাজি। শহরের বাইরে বহুকাল ওদের যাওয়া হয় না। আমারও। অথচ এই আমি গ্রামের ছেলে। গায়ে এখনো বিক্রমপুরের সোঁদা গন্ধ লেগে আছে। কতোকাল গ্রামে যাওয়া হয় না, কোনো নির্জন নদী তীরে দাঁড়ানো হয় না।

রবিদা বললেন, চন্দন কুমার, তোমার কি অভিমত?

রবিদা এমন করেই কথা বলেন। মজা করে। শুনে মনে হয় চল্লিশের দশকের বাংলা উপন্যাসের নায়ক কথা বলছে।

আমি বলি, যাওয়া যায়।

বাস থেকে নেমে বর্ষা বললো, ইস কি রোদ।

সত্যি আজ ভীষণ রোদ উঠেছে। বোশেখের শুরু। রোদ তো থাকবেই। পান্না বললো, রোদে কি যায় আসে। বেড়াতে বেরিয়েছি, গায়ে তো রোদ লাগবেই।

পান্না পরেছে কারুকাজ করা বোম্বের পাতলা পাঞ্জাবী। গোলাপী রংয়ের। আর জিনসের প্যান্ট। ওর আচার আচরণে কিছু যায় আসে না ভাব। রানু পরেছিলো আধুনিক ফ্রক। কলসি হাতা। আকাশ নীল, তার ওপর ছোট ছোট খোপ কাটা। রানুর কাঁধে ছিলো ধূসর ব্যাগ। সে কোনো কথা বলছিলো না।

রবিদা বললেন, খিদে পেয়েছে। চলো আগে কিছু খেয়ে নিই।

বর্ষা বললো, এখানে খাওয়ার কি পাওয়া যাবে?

রবিদা বললেন, ভাত আর তাজা সরপুঁটি মাছ। সামনের নদী থেকে ধরে এনেই চুলোয় বসিয়ে দেয়।

শুনে বর্ষা রানু আর পান্না তিনজনেই একত্রে লাফিয়ে ওঠে। কিন্তু মাছের কথা শুনে আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আমি মাছ খাই না। কাঁটা বাছতে কষ্ট হয়।

আমি বিষন্ন গলায় বলি, আমি মাছ খেতে পারবো না।

বর্ষা বললো, খেতেই হবে। একসঙ্গে বেড়াতে এসে পোজপাজ চলবে না।

পান্না বললো, আমি আপনার মাছের কাঁটা বেছে দেবো।

রানু গম্ভীর গলায় বললো, এর মধ্যেই কাঁটা বাছার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছিস?

শুনে আমি লজ্জায় মরে যাই। সবাই খুব হাসে। কেবল বর্ষা আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকায়। আমি বর্ষার দিকে। মনে মনে বলি, বর্ষা তুমি ছাড়া অন্য কারো হাতে আমি কখনো কিছু খাবো না। বর্ষা কি কথাটা শুনতে পায়!

কিন্তু হোটেলে ঢুকে সরপুঁটি মাছ পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় বোয়াল মাছ। সবাই মাছ খায়, আমি নিই মাংস। কি যে বাজে রান্না। ঝালে মুখ পুড়ে যায়। উ আ করে খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়। তখন একটা বেজে গেছে।

বাইরে বেরিয়ে দেখি বাংলাদেশী সূর্য এখন মধ্য আকাশে। রোদের তেজ কি খানিকটা বেড়ে গেছে!

কি জানি! কেউ রোদটোদ খেয়াল করছে না।

বাজারের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি চারদিকটা দেখি। বাজারে অনেক চালাঘর, দোকানপাট। খোলা জায়াগায় রোদে পিঠ দিয়ে আনাজপাতি নিয়ে বসে আছে লোকজন। একটা দোকানের সামনে কোমল ছায়ায় শুয়ে আরামসে ঘুমুচ্ছে একটা নেড়ী কুকুর। সারা গায়ে দগদগে ঘা। মাছি ভ্যানভ্যান করছে। একটা বুড়ো ছাগল, দাড়িঅলা, জাবর কাটতে কাটতে চরে বেড়াচ্ছে বাজারময়। চায়ের দোকানে বাজছে রেডিও। তাতে সাবিনা ইয়াসমিনের সুপার হিট গান, গুন গুন গুন গান গাহিয়া নীল ভ্রমরা যায়। এসব ছাপিয়ে দূরে, বহুদূরে উদাস সুরে ডাকছে একটা কোকিল। ডাকছে না কাঁদছে! সুরটা অতো বিষন্ন কেন?

মাটির তৈরি থালা বাসন, ঠিলা মালসা স্তুপ করে রাখা হয়েছে এক জায়গায়। তার পাশ দিয়ে যেতে যেতে আমি বলি, প্রতিটি বাজারেই বোধহয় একটা করে বটগাছ থাকে, না?

রবিদা বললেন, একটা কোথায়, এখানে তো তিনটে!

তারপর বর্ষার দিকে তাকিয়ে বলেন, এসো একটা মজা করি।

শুনে তিনজন একত্রে বলে, কি?

ওরা শহরে যেভাবে চলাফেরা করে সেভাবেই হাঁটছিলো। যেনো জায়গাটা ওদের কতোকালের চেনা। কতোবার এসেছে এখানে। লোকজন যে ওদের অবাক চোখে দেখছে, কেউ খেয়াল করে না। কেবল আমি খেয়াল করছি। সম্ভবতঃ এই কারণে আমি একটু গম্ভীর হয়ে আছি।

রবিদা বর্ষার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি ববিতা। আমার নেকস্‌ট ছবিতে তুমি হিরোইন।

শুনে লজ্জায় বর্ষার মুখ লাল হয়ে যায়। কি বলছেন!

রবিদা বর্ষার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেন, মজাটাই তো এখানে। দেখবে এক্ষুণি লোকজন কেমন করে তোমাদের দিকে তাকায়।

তারপরই একেক জনের একেকটা নাম পড়ে যায়। পান্না হলো নার্গিস। রানু হলো আনোয়ারা। আর আমার নাম হলো জাফর ইকবাল। আর রবিদা হলেন পরিচালক। আমি তাঁর নাম দিই আমজাদ হোসেন। তারপর আমাদের হাঁটাচলা একটু চেঞ্জ হয়ে যায়। একেবারে সিনেমার নায়ক নায়িকাদের মতো। বাজারের দোকানপাট থেকে, খোলা জায়গা থেকে লোকজন হা করে আমাদের দেখছিলো।

একসময় বাজারের পাশে যে নদী, চিরল, রূপোলী ফিতের মতো, দুপুরের রোদে ভেসে যাচ্ছিলো, পাড় ভেঙে আমরা সেই নদীর দিকে নেমে যাই।

রবিদা বললেন, এখানে ছইঅলা নৌকো পাওয়া যায়। চলো নৌকো নিয়ে ঘুরি।

বর্ষা বললো, আমার ছটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে। একটা বিয়েতে যাবো।

শুনে আমি বলি, তোমার বিয়েতে যাওয়া হবে না।

বর্ষা রেগে যায়। আমি যাবোই।

রবিদা ধমকে ওঠেন। বাদ দাও তো ওসব। দেখা যাবে।

রানু বললো, যাবে যাও। এক্ষুণি চলে যাও। আমরা যাবো না।

পান্না তখন একা একা হেঁটে নৌকোর কাছে গেছে। ওর মাথার ওপর নয়ার হাটের দীর্ঘ ব্রিজ। চারদিক কাঁপিয়ে সেই ব্রিজের ওপর দিয়ে বাস যায়, ট্রাক যায়।

খানিকপর বাজারের লোকজন দেখে সেই চিরল সুন্দর নদীতে ছইঅলা ছোট্ট সুন্দর একটা নৌকো ভাসছে। তাতে সেই পাঁচজন তরুণ তরুণী।

এক বুড়ো মাঝি আর তার বারো তেরো বছরের ছেলে আস্তে ধীরে নৌকো বাইছে। দূরে, বহুদূরে কোকিলটা তখনো ডেকে যাচ্ছে।

নৌকোয় চড়ে সবাই একটু চুপচাপ। রবিদা আড়াআড়ি শুয়ে আছেন নৌকোর অর্ধেকটা জুড়ে।

এক সময় পান্না জিজ্ঞেস করলো, মাঝি ভাই, নদীর নাম কি ?

বুড়ো মাঝি বললো, বংশী।

বা ভারি সুন্দর নাম তো! পান্না তারপরই গান শুরু করে, ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা

এরপর গান গাওয়ার একটা খেলা শুরু হয়ে যায়। রানু গায় শচীন দেবের গান, মধু বৃন্দাবনে দোলে রাধা

রবিদা হেড়ে গলায় গুনগুন করেন রানুর সঙ্গে।

তারপর গান গায় বর্ষা। বর্ষার গলা অদ্ভুত মিষ্টি আর সুরেলা। নদীর দিকে তাকিয়ে বর্ষা গাইছিলো, এতোদিন যে ছিলেম বসে পথ চেয়ে আর কালগুনে দেখা পেলেম ফালগুনে

রবিদা বলেন, ফালগুন কোথায়, এতো বোশেখ মাস।

শুনে সবাই হাসে। বর্ষা তরল গলায় বলে, দেখা আসলে ফালগুনেই হয়েছিলো।

তারপর আমার দিকে তাকায়। বর্ষার চোখ আমাকে কি কথা বলে যায়! আমার সঙ্গেই কি বর্ষার ফালগুন মাসে দেখা হয়েছিলো?

আমি তারপর উদাস হয়ে যাই। নদীর দিকে তাকিয়ে থাকি। সুন্দর দৃশ্যের কাছে এলে কেন যে মনে হয়, এখানে কি আমার আসার কথা ছিলো!

আমি একটু সরে গিয়ে নদীর জলে হাত দিই। তখন মনে হয়, নদীর কাছে আমার একটা গোপন বিহার পাওনা ছিলো। নদী আজ তা পুরণ করছে।

নৌকো তখন দক্ষিণে যায়।

হঠাৎ আমার মাথায় কি আসে, আমি রবিদাকে বলি, রবিদা বাংলাদেশে ঘুমনদী নামে কোনো নদী নেই?

রবিদা বললেন, জানি না। বাংলাদেশে তো নদীর অভাব নেই। থাকতেও পারে!

পান্না বললো, কবি হয়ে গেছেন নাকি ?

আমি কথা বলি না। হাসি।

তখন বর্ষা বলে, এই তুমি গান গাও।

শুনে আমি যেনো আকাশ থেকে পড়ি। আমি গান জানি নাকি!

জানো আর না জানো, গাইতে হবে।

রানু বললো হ্যাঁ সবাই গেয়েছে। আপনাকেও গাইতে হবে!

পান্না বললো, গান।

রবিদা বললেন, ধরে ফেলো হে চন্দন কুমার।

আমি গান জানি না।

যা জানো।

ইচ্ছে করলে গাওয়া যায়। এক সময় বুলবুল একাডেমীতে মাস ছয়েক রবীন্দ্রসংগীত শিখেছিলাম। স্যার ছিলেন আতিকুল ইসলাম। খুব আদর করতেন। বলতেন, চর্চা করলে তোমার হবে।

আতিক স্যার মারা গেলেন। আমার গান শেখা হলো না।

তখন নৌকো চলে এসেছে বাজার থেকে অনেক দূরে। তাই দেখে রবিদা বললেন, মাঝি ভাই নৌকো ভেড়ান।

সঙ্গে সঙ্গে নৌকোর মুখ ঘুরে যায় পাড়ের দিকে। মাটির কাছাকাছি যেতেই রবিদা হাঁটুজলে লাফিয়ে নামেন। তার দেখাদেখি রানু পান্নাও। কেবল আমি আর বর্ষা নৌকোর ভেতর।

বর্ষা বললো, নামো।

আমি সাঁতার জানি না।

আমিও তো জানি না।

রবিদা বললেন, এসো হে চন্দন কুমার, সাঁতার কাটি।

আমি বলি, আপনাকে হারাবো! কতো বাজি?

বর্ষা বললো, রবিদা বাজি ধরুন চন্দন কিন্তু সাঁতার জানে না।

বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি। তারপর জল তোলপাড় করে সাঁতরাতে থাকি। আমার পরনে জিনসের মোটা প্যান্ট, ফুল হাতা শার্ট। হাতে ঘড়ি ছিলো, পকেটে টাকা ছিলো। ওসব নিয়েই সাঁতরাতে থাকি। রবিদা শার্ট খুলে নিয়েছিলেন। শুধু প্যান্ট পরা। তবুও সাঁতারে আমার কাছে হেরে যান। ছেলেবেলায় আমি চমৎকার সাঁতরাতে পারতাম। কতোবার যে সাঁতারে প্রাইজ পেয়েছি!

আজ জলে নামলাম ছসাত বছর পর। কিন্তু সাঁতারে জিতে যাওয়াটা আমার কাছে কোনো ব্যাপার ছিলো না। জলে ডুব দিয়ে বার বার আমি জলের কানে কানে বলেছি, মনে রেখো।

খানিক পর নৌকোয় উঠে দেখি বর্ষা স্নিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বললো, শার্টটা খুলে ফেলো।

আমি তখন সাঁতার কাটার ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছি। মৃদু হেসে বলি, না।

ঠাণ্ডা লেগে যাবে। খোলো।

না।

মেয়েদের সামনে খালি গা হতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। আমার বুকের তুলনায় পিঠে লোম বেশি! জিনিশটা আমার পছন্দ নয়। বর্ষা ওরকম লোমশ পিঠ দেখে যদি ঘৃণা করে!

তখন রবিদা রানু পান্না তিনজন ছইয়ের ওপর উঠে বসেছে। বর্ষা আর আমি নিচে। বর্ষার ছইয়ে উঠতে ভয়। সাঁতার জানে না। যদি পড়ে যায়। বর্ষা বললো, রবিদা তো খালিগা হয়েছেন। তোমার অসুবিধা কি!
আমার ভাল্লাগে না।
তখন বর্ষা হঠাৎ করে রেগে যায়। খোলো বলছি।
বর্ষার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পেয়ে যাই! এরপর শার্ট না খুললে বর্ষা ভীষণ রাগ করবে। রাগে আমার সঙ্গে আর কথাই বলবে না। আমি বাধ্য হয়ে শার্ট খুলি। বর্ষা শার্টটা নিয়ে গুলুইয়ের সামনে, বুড়ো মাঝির পায়ের কাছে রোদে মেলে দেয়। খালি গায়ে আমার তখন অস্বস্তি হচ্ছে। বর্ষা সেসব খেয়াল না করে আমার পিঠের দিকে তাকায়। তারপর মুগ্ধ গলায় বলে, বাঃ তোমার পিঠে কি সুন্দর লোম!
শুনে আমার বুকের ভেতর থেকে একসঙ্গে উড়ে যায় একশোটা শাদা পায়রা। ছইয়ে হেলান দিয়ে বসে বলি, তোমার ভালো লাগে?
হ্যাঁ। খুব।
ছইয়ের ওপর তখন রবিদা কি একটা বিদেশী উপন্যাসের গল্প করছে। রানু পান্না নিঃশব্দে তা শুনছে। আমি হঠাৎ করে রবিদার উদ্দেশ্যে বলি, সাবাস রবিদা।
রবিদা ধমকে ওঠেন। আ বাড়া ভাতে বাঁ হাত দিও না তো।
আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলি, চালিয়ে যাও।
তুমিও চালাও না। বর্ষাদেবীকে তো দিয়েই দিয়েছি।
বর্ষা হাসে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, এই তোমার পকেট থেকে কাগজ পত্রগুলো বের করো না!
কেন?
ভিজে গেছে না!
তাইতো! আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে খানিক আগে নদীতে নেমে সাঁতার কেটেছি। জামা কাপড় পরেই। সব ভিজে গেছে।
আমি পকেট থেকে টাকাগুলো বের করি। ভিজে চুপসে গেছে। বর্ষা সেগুলো আমার চারপাশে মেলে দেয়। বাতাসে শুকাবে।
আমি বলি, অনেককাল পর জলে নামলাম।
তুমি এতো ভালো সাঁতার জানো, তাহলে মিথ্যে বলছিলে কেন?
মজা করতে।
তাহলে তুমি গানও জানো।
না। সত্যি না।
জানো। গাইতেই হবে।
নৌকোর মুখ তখন ঘুরে গেছে। বিকেল হয়ে আসছিলো বলে নৌকো এখন উত্তরমুখী। ঠিক এসময় নদীর ওপর দিয়ে সুন্দর একজোড়া পাখি

উড়ে যায়! দেখে আমার ভেতর কি যেনো কি ঘটে যায়। নদীর দিকে তাকিয়ে অনেক অনেক দিন পর আমি গলা ছেড়ে গান গাই। এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না

আমার গলা শুনে আমি নিজেই মুগ্ধ হয়ে যাই। একদম সাগর সেনের মতো হচ্ছে। এতোকাল পর কি করে আমি এতো ভালো গাইছি!

ততোক্ষণে ছইয়ের ওপর রবিদার গল্প থেমে গেছে। রানু পান্নার মুখে কোনো শব্দ নেই। আর আমার সামনে বসে বর্ষা কি যে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে! সেই চোখের দিকে তাকিয়ে মন বলে, তোমাকে ভালো গাইতেই হবে চন্দন।

গানের শেষ লাইনটা আমি দুবার গাই। এখন কেহ হাসে কেহ বসে ফেলে অশ্রু জল

তারপর নদীর দিকে তাকিয়ে থাকি।

বর্ষা কিছু বলার আগেই ছইয়ের ওপর থেকে রানু পান্না হাততালি দিয়ে উঠলো। সেই শব্দ ছাপিয়ে রবিদার গলা শোনা গেলো, তুমি তো পাগল করে ছাড়বে হে। এতো ভালো গান গাইতে তোমায় কে বললো!

আমি কথা বলি না। বর্ষার মুখের দিকে তাকাই। বর্ষা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। চোখে মুখে কি যে মুগ্ধতা ছড়ানো! দেখে আমার মনে হয় আহা, রবীন্দ্রনাথের পুরো আড়াই হাজার গান যদি জানতাম! তাহলে সবগুলোই এখন গেয়ে ফেলতাম।

বর্ষা কিছু একটা বলতে যাবে, ছইয়ের ওপর থেকে পান্না বললো, আর একটা শোনান।

বর্ষা বললো, গাও। প্লিজ।

প্লিজ শব্দটার উচ্চারণে নিজেকে গানের কাছে সপে দেয়ার একটা ব্যাপার ছিলো। আমি পাগলের মতো আবার গান শুরু করি। কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে

এই গানটা শেষ হলে বর্ষা ফিসফিস করে বলে, তুমি অমন করে গাও কেন! আমার ভেতরটা কেমন করে।

আমি কথা বলতে পারি না। কি যে একটা সুখ! এতো সুখ সইতে পারি না।

শার্টটা টেনে নিয়ে গায়ে দেবো, বর্ষা বললো, থাক না। খালি গায়ে বসে গান গাইছো, তোমাকে প্রেমিক সন্ন্যাসীর মতো লাগে।

শুনে আমি আর শার্টটা নিই না। আবার গান গাই। কোলাহল তো বারণ হলো, এবার কথা কানে কানে

এই গানটা সত্যি সত্যি ভালো হয়। ছইয়ে বসে রবিদা বলে, কাল থেকে হারমোনিয়াম নিয়ে বসবে হে। তোমার কোনো কাজ নেই।

আমি কথা বলি না। মৃদু হাসি।

বর্ষা বলে, তুমি নিজেকে অতো লুকিয়ে রাখো কেন?
আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, বর্ষা আমি আমার নিজেকে ঠিক বুঝি না।
বিকেলের প্রসন্ন আলোয় নৌকো যখন ঘাটের দিকে যায়, তখন নদী গেছে অন্য রকম হয়ে। জলের ওপর খেলা করছে মায়াবী আলো। সাড়ে পাঁচটা বাজে। ছটার সময় বর্ষার এক বিয়েতে যাওয়ার কথা। এখন কি বর্ষার সে কথা মনে আছে!
ঠিক ছটার সময় আমরা নৌকো থেকে নামি। যে পাড় থেকে উঠে-ছিলাম তার অন্য পাড়ে।
মাটিতে পা দিয়েই বর্ষা বললো, আমার বিয়েতে যাওয়া হলো না।
আমি বলি, তাতে যে আমার কি খুশি লাগছে।
বর্ষা চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকায়। তারপর কি রকম ঘোর-লাগা গলায় বলে, তুমি সব জায়গায় জিতে যাও।
শুনে আমি মনে মনে বলি, কেবল এক জায়গায় হেরে গেছি। এ হারার যে কি আনন্দ, পৃথিবীর কাউকে কখনো তা বোঝানো যাবে না। বর্ষা, প্রিয়তমা বর্ষা, তোমাকেও না।

সামনের চালাঘরে ছিলো একটা চায়ের দোকান। দোকানের সামনে লম্বা বেঞ্চ পাতা। তাতে বসে লোকেরা চা খাচ্ছে, গল্প করছে। যুবক দোকানীটা বসে হ্যাজাকে পাম্প করছে।

সেই দোকানের সামনে একটা ঝাপড়ানো আমগাছ। তলায় বাঁধানো বেদী। আমগাছের পেছন দিকটায় স্তূপাকার হয়ে পড়ে আছে কন্ট্রাকটর-দের রোড কনস্ট্রাকসনের নুড়ি পাথর। পান্না দৌড়ে গিয়ে নুড়ি পাথর কুড়াতে বসে। ভ্যানিটি ব্যাগে ভরে বাড়ি নিয়ে যাবে। পাথর দিয়ে খেলবে। পান্নাকে বাচ্চা মেয়ের মতো পাথর কুড়াতে দেখে চায়ের দোকান থেকে, সামনের রাস্তা থেকে লোকজন খুব তাকাচ্ছিলো। পান্না কেয়ার করে না। আমরাও না। রবিদা আমাদের নিয়ে বসেন আমগাছ তলায়। বাঁধানো বেদীতে। তারপর চেঁচিয়ে পাঁচ কাপ চায়ের কথা বলেন।

আমি একটা সিগারেট ধরাই। বর্ষা বসে ছিলো আমার পাশে। সিগারেট ধরিয়ে একটু বুঝি অন্যমনস্ক হয়েছিলাম। হঠাৎ বর্ষা উ করে ওঠে। আমি চমকে বর্ষার দিকে তাকাই। দেখি বর্ষা ওর ডান হাতের কনুয়ের কাছটা ধরে আছে। পেরেকের মাথার মতো একবিন্দু নুনছাল উঠে গেছে ওখানকার। আমার সিগারেটে পুড়েছে। দেখে আমি দুঃখিত চোখে তাকাই। বর্ষা বলে, তুমি আমাকে পুড়িয়ে দিলে!
শুনে আমার বুকের ভেতরটা দুঃখে ভরে যায়।
চা খেতে খেতে আমি বলি, আর এক কাপ চা খাবো। এখানকার চা টা খুব ভালো।
বর্ষা রেগে বললো, হবে না। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে!

পান্না বললো, হ্যাঁ হলের গেট বন্ধ হয়ে যাবে।
রানু বললো, গেট এমনিতেই বন্ধ হয়ে গেছে। আজ বর্ষাদের বাসায় থাকতে হবে।
রবিদা বললেন, আবার আগামী শনিবার ঘুরতে বেরুবো। সকাল দশটায় সবাই টি এস সির সামনের বারান্দায় থাকবে।
আমরা কেউ কোনো কথা বলি না। আস্তে ধীরে ব্রিজের দিকে হাঁটি। দীর্ঘ ব্রিজ পেরিয়ে ওপারে গিয়ে ঢাকার বাসে চড়বো।
তখন চারদিকের পৃথিবী অদ্ভুত শান্ত। সন্ধ্যার মায়াবী আলোয় ভরে গেছে চারদিক। পৃথিবীর কোথাও কোনো দুঃখ আছে, এ মুহূর্তে মনে হয় না। ব্রিজের ওপর এসে উত্তরের ব্যালকনী ধরে দাঁড়াই। অনেক উপর থেকে নদী যে কি সুন্দর দেখায়! শান্ত স্থির ছবির মতো। দূরে নদীর বাঁকে পাতলা ধোঁয়ার মতো কুয়াশা জমেছে। কি যে অদ্ভুত দৃশ্য। এই সুন্দর দৃশ্যটির সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য কি আমার মনে হয়, প্রকৃতির সৌন্দর্যের কাছে মানুষের দুঃখবোধ সূঁচের ডগার মতো ছোট!

ডেমরা ঘাটে এসে রবিদা বললেন, চলো নৌকো নিয়ে নারায়ণগঞ্জের দিকে চলে যাই।
রানু বললো, চলুন।
ঘাটে ছইঅলা অনেক নৌকো ছিলো। আমাদের দেখে মাঝিরা সব চেঁচামেচি করছিলো। আইয়েন সাব, আইয়েন। আমার নায়ে আইয়েন।
পান্না এগিয়ে গিয়ে এক মাঝিকে জিজ্ঞেস করে, নারায়ণগঞ্জ কতো নেবে?
মাঝি এক মিনিট ভেবে বললো, চল্লিশ টেকা।
শুনে আমরা সবাই থ! রবিদার কাঁধে ছিলো কাপড়ের সুন্দর ব্যাগ। তাতে বিসকিট আর রবিদার চুরুট। ব্যাগটা অন্য কাঁধে এনে রবিদা বললেন, কি হে চন্দন কুমার, যাবে?
আপনার ইচ্ছে!
বর্ষা বললো, কতোক্ষণ লাগবে যেতে?
রবিদা কিছু বলার আগে সেই মাঝি বললো, চাইর ঘন্টার বেশি লাগবো।
বর্ষা বললো, অতো সময় নৌকোয় বসে থাকতে ভাল্লাগবে না। চলুন অন্য কোনো দিকে যাই।
আমি তাকিয়ে বর্ষাকে দেখছিলাম। বর্ষা আজ পরেছে লাল টুকটুকে পাঞ্জাবী আর শাদা সালোয়ার। এই ড্রেসে ওকে ক্লাশ টেনের ছাত্রীর মতো লাগে। আর শাড়ি পরা রানু পান্নাকে যথার্থ ইউনিভার্সিটির ছাত্রী।
রবিদা বললেন, তাহলে কোথায় যাওয়া যায়?
রবিদার পায়ের কাছে একটা নৌকো। তার যুবক মাঝি বললো, মুড়াপাড়া চলেন সার।

মুড়াপাড়ার কথা শুনে আমি হঠাৎ করে খুব উৎসাহি হয়ে উঠি। মুড়াপাড়ার জমিদার বাড়ির কথা অনেক শুনেছি। জমিদারের কথা পড়েছি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে' উপন্যাসে। ঢাকার এতো কাছে মুড়াপাড়া আমার জানাই ছিলো না। মাঝিকে জিজ্ঞেস করি, এখান থেকে মুড়াপাড়া কতো দূর।

পাঁচ মাইল।

নৌকোয় যেতে কতোক্ষণ লাগবে?

দুই ঘন্টা সার।

আমি বর্ষার দিকে তাকিয়ে বলি, যাবে ?

বর্ষা মুখ গোমড়া করে বলে, ওখানে দেখার কি আছে ?

একটা জমিদার বাড়ি আছে।

রানু বললো, চলেন যাই রবিদা।

রবিদা বললেন, যাওয়া যায়। জায়গাটা সুন্দর।

ত্রিশ টাকা ভাড়া ঠিক হয়। মাঝি আমাদের এখন নিয়ে যাবে। বিকেল বেলা আবার নিয়ে আসবে।

রবিদা মাঝিকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার বাড়ি কি ওখানেই ?

জ্বি।

আর কোনো কথা হয় না। আমরা নৌকোয় চড়ি।

এই নদীটা বংশী নদীর মতো সুন্দর নয়। চারদিকে অজস্র নৌকো স্পিডবোট লঞ্চ।

বর্ষা বললো, এই নদীটা ভাল্লাগছে না।

রবিদা বললেন, মুড়াপাড়া গিয়ে ভালোই লাগবে।

পান্না তখন গুনগুন করে গান গাইছে। বর্ষা একটু উদাস। রানু রবিদার সঙ্গে কথা বলছে। রবিদার মুখে লম্বা চুরুট।

আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বলি, এরকম ঘুরে বেড়াতে বেশ লাগে, না!

রবিদা বললেন, তোমার তো লাগবেই হে। বয়স কম।

বয়স কম হলে কি হয় !

এই বয়সে মনের ভেতর অনেক গণ্ডগোল থাকে। অচেনা জায়গায় বেড়াতে গেলে গণ্ডগোলটা চাপা পড়ে যায়।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, হবে হয়তো।

রবিদা বললেন, তার মানে আমি শুধু তোমার কথাই বলছি না। তোমার বয়সী সবারই এই প্রোবলেমটা থাকে।

পান্না বললো, তাহলে আপনি আমাদের সঙ্গে ঘুরছেন কেন ?

রবিদা বললেন, এই বয়সী ছেলেমেয়েদের আমি খুব পছন্দ করি। দুঃখ হয় এই বয়সটা আমি অনেককাল আগে পেরিয়ে এসেছি। তবুও তোমাদের সঙ্গে থাকলে নিজেকে তোমাদের বয়সীই ভাবি। হাল্কা কথাটথা বলি। সময়টা খুব ভালো কাটে।

রবিদা তারপর চুরুটে টান দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে যান। আমি ভাবি রবিদারও বোধহয় মনের ভেতর কোনো গণ্ডগোল আছে। কি, সেটা কি! তারপর ভাবি, মানুষের মনের ভেতরটা কি মানুষ নিজে দেখতে পায়, না সঠিক বুঝতে পারে!

ঠিক তখুনি বর্ষা ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে সিগারেটটা টেনে নেয়। তারপর আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমার ডানহাতে নির্মমভাবে দুটো ছ্যাঁকা লাগিয়ে দেয়। যন্ত্রণায় আমি উ করে উঠি। চোখে জল এসে যায়।

রবিদা বললেন, আহা কি করছো?

বর্ষা সিগারেটটা জলে ফেলে দিয়ে বললো, ও আমাকে সেদিন পুড়িয়েছে। তার প্রতিশোধ নিলাম।

পান্না বললো, পুড়িয়ে টুড়িয়ে নাকি নিতে হয়! বর্ষা সব জানে।

আমার কানে তখন কথা যাচ্ছিলো না। আমি আমার ডানহাতের দিকে তাকিয়ে আছি। ফোস্কা পড়ে গেছে। ভীষণ জ্বালা করছে এখন।

রবিদা বললেন, মেয়েদের ভেতর সবসময়ই এক ধরনের নির্মমতা থাকে।

রানু বললো, বর্ষার আছে। বর্ষাকে আজ কেউ একটু ব্যথা দিলে পাঁচ বছর পর হলেও বর্ষা ঠিক সেইটুকু ব্যথা ফিরিয়ে দেবে।

রবিদা বললেন, বর্ষা খুব জেদী।

আমি কোনো কথা বলি না। বর্ষাও না। সেদিন তো আমি ইচ্ছে করে বর্ষাকে পুড়িয়ে দিইনি। হঠাৎ সিগারেটটা লেগে গিয়েছিলো। বর্ষা তা বুঝলো না। বর্ষাকে পুড়িয়ে আমি যে কি দুঃখ পেয়েছি! হায়, মানুষ মানুষের গোপন দুঃখ একদম বুঝতে পারে না।

খানিকপর ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা মলমের কৌটা বের করে বর্ষা। তারপর আঙুলের ডগায় মলম নিয়ে আমার দিকে তাকায়। এসো, মলম লাগিয়ে দিই।

আমি অন্যদিকে তাকিয়ে বলি, লাগবে না।

রানু বললো, এখন আবার আহ্লাদ দেখানো হচ্ছে।

শুনে বর্ষা কোনো কথা বলে না। হাতটা শাদা সালোয়ারে মুছে মলমের কৌটাটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় নদীতে। দেখে রবিদা বলেন, হয়েছে। আজ আর জমবে না।

হঠাৎ করে আমাদের মধ্যে এক ধরনের নিরবতা নেমে আসে। কেউ কোনো কথা বলি না।

মুড়াপাড়া ঘাটে নেমে জায়গাটা আমার বেশ পছন্দ হয়ে যায়। নদীতীরে শাদা বালি, তারপর উঁচু পথ। পথের দুপাশে সার বাঁধা গাছ, কিছু দোকানপাট। আধা গ্রাম, আধা মফস্বলের মতন নিরব চারদিক।

রবিদা বললেন, মাঝিভাই আমরা পাঁচটার দিকে আসবো।
মাঝি তখন নৌকা বাঁধছে ভালো করে। বললো, ঠিক আছে সার।
আমরা আস্তে ধীরে হেঁটে রাস্তায় উঠি। নিরবতা এখনও থমথম করছে আমাদের মধ্যে।
রাস্তায় উঠে হঠাৎ করে আমার খুব মন ভালো হয়ে যায়। হাতে সিগারেটের দুটো ছ্যাকা, ভুলে যাই। রাস্তার দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের গান মনে আসে। বর্ষা'র দিকে একপলক তাকিয়ে গুনগুন করে গাই,
এপথ গেছে কোনখানে গো কোনখানে তা কে জানে
রাস্তার পাশে চার পাঁচটা চায়ের দোকান। একটায় ঢুকে রবিদা বললেন, ভাত খাবো।
দোকানের ভেতর চওড়া একটা চৌকি পাতা। আমি আসন পিঁড়ি করে চৌকির ওপর বসি। বর্ষা আর পান্নাও বসে। রানু একটা গ্লাস থেকে জল নিয়ে হাত ধুচ্ছিলো। কি মনে হতে খেলার ছলে আমাকে একটু জল ছুঁড়ে দেয়। আর আমি কিছু না ভেবে পুরো গ্লাসের জল ছুঁড়ে দিই রানুর দিকে। একেবারে রানুর মুখে। তাই দেখে বর্ষা সামনের পুরো জগটাই হঠাৎ করে আমার একেবারে মাথায়। রবিদা হা হা করে ছুটে আসেন। কি হচ্ছে এসব?
রবিদার কথা গ্রাহ্য না করে সবাই হাত তালি দিয়ে হাসে। আমার তখন অবস্থা খারাপ। শার্টফার্ট সব ভিজে গেছে। আর আমাদের এরকম জল ছোঁড়াছুঁড়ি দেখে রাস্তায় জমে গেছে দুচারজন লোক। খুব মজা পাচ্ছে তারা।
ততোক্ষণে খাবার এসে গেছে। ভাত আর ছোট মাছ। মাছ দেখে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমি মাছের কাঁটা বাছতে পারি না।
পান্না অবলীলায় আমার থালা থেকে মাছ নিয়ে যত্ন করে কাঁটা বেছে দেয়।
খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা জমিদার বাড়ির দিকে হাঁটি।
জমিদার বাড়ি ঢোকার মুখে দীর্ঘ একটা আম বাগান। তিন লাইনে পরিপাটি করে কতোকাল আগে যে বোনা হয়েছিলো গাছ! ভারি সুন্দর বাগান। তলায় গাঢ় সবুজ ঘাস। ঘাসের ওপর পড়ে আছে মোলায়েম ছায়া। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অভাজন মানুষ আছে বাগানময়। আমরা দল বেঁধে সেই বাগানের ভেতর দিয়ে হাঁটি।
রবিদা বললেন, আগে বাড়িটা দেখে আসি। তারপর এই বাগানে বসবো। বলেই সামনের একটা উঁচু আমের ডাল ছেলেমানুষি কায়দায় ছোঁয়ার চেষ্টা করেন রবিদা। পারেন না। আমি ছিলাম ঠিক তার পেছনে। রবিদাকে লাফিয়ে উঠতে দেখে আমিও লাফাই। এবং দুহাতে ডালটা ধরে বার দুয়েক দোল খাই। এই গাছ আমাকে কতোকাল মনে রাখবে?

বাড়িটার সামনে খোলা একটা মাঠ। মাঠের পাশে টলটলে কালো জলের একটা পুকুর। পুকুর পাড়ে বাঁধানো ঘাটলার পাশে ছড়ানো ছিটানো কিছু হলুদ ফুলের ঝোপ। রবিদা বাড়ির দিকে হাঁটেন। আমরা যাই ঘাটলায়।
আ পুকুরের জলটা কি স্বচ্ছ। এই জলে একবার মুখ ধুয়ে যাবো।
আমি ঘাটলার শেষ ধাপে নেমে ধনুকের মত বেঁকে জলে হাত দিই। হঠাৎ পেছন থেকে আলতো করে ধাককা দেয় বর্ষা। সেই ধাককায় হাঁটু অব্দি জলে নেমে যাই আমি। তারপর রাগ করে অঁাজলা ভরে জল তুলি। বর্ষাকে ছিটিয়ে দেবো। বর্ষা ভয়ে দৌড়ায়।
মুখ ধুয়ে উঠে আমার কি খেয়াল চাপে, রানুকে বলি, দিদি তোমার অঁাচলে মুখ মুছি।
রানু কথা না বলে তার শাদা জরির পাড়ের শাড়ির অঁাচল মেলে দেয়। আমি যত্ন করে বাচ্চা ছেলের মতো মুখ মুছি।
জমিদার বাড়ি ঢোকার মুখে ভারি লোহার গেট। দুহাতে টেনে খুলতে হয়। গেটটা খোলেন রবিদা। আর আমরা জমিদারের পুত্র কন্যাদের মতো আহ্লাদি পায়ে বাড়ির ভেতর ঢুকি। ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো বাড়ির অদ্ভুত সোঁদা গন্ধ নাকে লাগে। আর শরীর জুড়িয়ে দেয় শীতল একটা হাওয়া। আমার কেন যে মনে হয় হাওয়াটা আসছে অনেক কালের দূরত্ব পেরিয়ে। সেই জমিদারের আমল থেকে। শরীরটা কেঁপে ওঠে।
বাড়ির ভেতর বিশাল উঠোন। একদিকে ঢোকার গেট। গেটের ঠিক উল্টো দিকে একটা দরদালানের উল্টো দিক। উত্তর দিকে একটা পূজোর ঘর। তার সঙ্গে অল্প কটি ধাপের একটা সিঁড়ি উঁচু বারান্দায় উঠে গেছে। দক্ষিণ দিকে ঠিক ওরকম আর একটি বারান্দা। সেখানে ওঠার সিঁড়ি।
বাঁধানো উঠোনে পা দিয়েই রানু বললো, কি রকম রানী রানী লাগছে।
সঙ্গে সঙ্গে রানুর কথা চারদিকের দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে। আমাদের জিন্দাবাহারের বাসার একটা ঘরে কথা বললে এরকম প্রতিধ্বনি হতো। মনে পড়ে সেই ঘরে বসে চেঁচিয়ে গান গাইতে আমার খুব ভাল্লাগতো।
আমি বলি, রানু এখানে যতোক্ষণ থাকি তোমাকে রানী মা বলে ডাকবো।
বর্ষা বললো, হ্যাঁ আমরা সবাই।
রানু বললো, ঠিক আছে আমি তাহলে রানীর মতন বসি। তোমরা সবাই দূরত্ব রেখে আমার মুখোমুখি বসবে।
রানু গিয়ে উত্তরের বারান্দায় ওঠার সিঁড়িতে বসে। আমরা বসি দক্ষিণের সিঁড়িতে। বসতে বসতে রবিদা বললেন, বাহবা রানী এখন সিঁড়িতে। শুনে আমরা সবাই হেসে উঠি।
বর্ষা বললো, এই চন্দন গান গাও।

গান গাওয়ার ইচ্ছে আমার আগেই হয়েছিলো। বহুকাল প্রতিধ্বনি হয় এরকম জায়গায় বসে গান গাই না। আমি রানীমার মুখের দিকে তাকিয়ে গলা খুলে গাই, কাহার গলায় পরাবি গানের রতন হার

বিকেল বেলা রবিদা বললেন, চলো ওপরটা ঘুরে বাগানে গিয়ে বসি।

আমরা সবাই লাফিয়ে উঠি। তারপর সিঁড়ি ভেঙে তিনতলায়।

দেখার মতো কিছুই নেই। তবুও ঘুরে ঘুরে আমরা সব দেখি। বর্ষা কি একটু উদাস হয়েছিলো! কথাটা ভেবে আমি একবার ছ্যাঁকা খাওয়া হাতটার দিকে তাকাই। তারপর একটা কথা ভেবে হেসে ফেলি। ছ্যাঁকা থেকে বেরিয়ে এসছে ছ্যাঁক শব্দটা। ছ্যাঁক মানে প্রেমে ব্যর্থতা। কেউ কেউ বলে হাফসোল খাওয়া।

আমাকে হাসতে দেখে বর্ষা বললো, হাসছো কেন?

আমি হাতটার দিকে তাকিয়ে বলি, ছ্যাঁক খেয়ে গেলাম।

বর্ষা গম্ভীর স্বরে বললো, তুমি ছ্যাঁকই খাবে।

তিনতলার লম্বা বারান্দা শেষে লোহার ছোট্ট বাঁধানো একটা সিঁড়ি। ছাদে ওঠার পথ। তারপাশে গভীর একটা খাদ। রবিদা গিয়ে সেই খাদে উঁকি দেন। তার দেখাদেখি আমিও। ইস কি অন্ধকার খাদ! কি গভীর! দেখে আমার মাথার ভেতরটা টাল খায়।

রানু বললো, রবিদা ছাদে যাবো।

চলো।

আমরা তারপর ছোট্ট সিঁড়ি ভেঙে কষ্টে কষ্টে ছাদে গিয়ে উঠি। শেওলা পড়া ছাদ। কি নির্জন! ছাদের ওপর থেকে চারদিকটা দেখা যায়। বিকেল বেলা গ্রামের পৃথিবী কি চমৎকার! আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

হঠাৎ রবিদা লাফিয়ে ওঠেন ছাদের সরু কার্নিশে। তারপর অবলীলায় হাঁটাহাঁটি শুরু করেন। দেখে আমি ভীষণ ভয় পেয়ে যাই। এখান থেকে পড়লে রবিদা কাচের গ্লাসের মতন ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবেন। রবিদার ভেতর কি আত্মহত্যার প্রবণতা আছে?

আমি চালাকী করে বলি, রবিদা চলুন বাগানে গিয়ে একটু বসবো না! বিকেল শেষ হয়ে এলো।

বাগানে এসে আমরা সবাই গোল হয়ে বসি। বিকেল বেলার আম-বাগান ভারি সুন্দর। দেখে আমি গুনগুন করি, কানন পরেছে শ্যামল দুকূল, আমের শাখাতে নূতন মুকুল, নবীনের মায়া করিল আকুল হিয়া তোমার

তারপর প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাই। দেখে বর্ষা বললো, দাও আমি একটু সিগারেট খাই।

আমি কখনো বর্ষার মতো কোনো যুবতী মেয়েকে সিগারেট খেতে দেখিনি। সিগারেট খেলে বর্ষাকে কেমন দেখাবে!

আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে। সিগারেটটা বাড়িয়ে দিই বর্ষার দিকে।
খাও।
বর্ষা সিগারেটটা হাতে নিয়ে একবারও ঠোঁটে ছোঁয়ায় না। আমার দিকে তাকিয়ে হাসে। তোমাকে আবার পোড়াই।
শুনে আমার বুকের ভেতরটা ধ্বক করে ওঠে। তারপর তীব্র একটা অভিমান খেলে যায়। আমাকে পোড়াতে বর্ষার খুব আনন্দ। ঠিক আছে বর্ষা আনন্দই পাক। আমি ছ্যাঁকা খাওয়া হাতটা বর্ষার দিকে বাড়িয়ে দিই।
পোড়াও।
বর্ষা অবলীলায় সিগারেটটা চেপে ধরে আমার হাতে। ধরেই থাকে। আমি চোখ বুজে, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করি। রবিদা রানু পান্না হা হা করে। আমি খেয়াল করি না। হাতের চামড়া ফুটো করে বর্ষার আগুন কতোদূর অব্দি পৌঁছুবে! কতোকাল চিহ্ন থাকবে! কতোকাল মনে থাকবে, বর্ষা আমাকে খুব যত্ন করে পুড়িয়েছিলো!
চোখে জল এসে যায়।

চন্দন, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো?
না।
তাহলে অতো গম্ভীর হয়ে আছো কেন?
কই?
তুমি আজ আগের মতো কথা বলছো না আমার সঙ্গে।
কি বলবো?
তুমি এখন কি করছিলে?
শুয়েছিলাম। সেদিনের পর দুদিন একটু একটু জ্বর গেলো।
এখন কেমন আছো?
ভালো।
তাহলে এই বিকেল বেলা শুয়েছিলে কেন?
হাতটা খুব ব্যথা করে।
এ কথায় বর্ষা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। টেলিফোনে বর্ষার দীর্ঘশ্বাস স্পষ্ট শোনা যায়। আমাকে পুড়িয়ে বর্ষা নিজেও কি খুব দুঃখ পেয়েছে!
আমি বলি, বর্ষা তুমি এ দুদিন কি করেছো?
কি করবো!
ইউনিভার্সিটি যাও নি?
গিয়েছি। কিন্তু ক্লাশ করতে আমার একদম ভাল্লাগে নি। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে সোজা বাড়ি চলে এসছি। পান্না রানুর সঙ্গে একটুও আড্ডা মারিনি।

বাড়ি বসে কি করেছো?
কিছু না। বিকেল বেলা ছাদে বসে থেকেছি। একবারও বই ছুঁয়ে দেখিনি।
কেন?
আমার কিছু ভাল্লাগে না।
আমারও। আমি এ দুদিন বাড়ি থেকে একদম বেরুইনি।
আমাকে টেলিফোন করলে পারতে।
ইচ্ছে হয়নি।
তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছো, না?
সত্যি না। তুমি আমাকে টেলিফোন করলে না কেন?
কি জানি। এ দুদিন আমি যে কি ভেবেছি!
কি ভাবলে?
তোমার কথা।
আমি হাসি। আমার কথা তুমি ভাবো?
বর্ষা আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তুমি বুঝতে পারো না?
না।
তুমি আসলে আমার কথা কখনো ভাবো না।
কি করে বোঝাবো বলো!
তুমি এখন কি করছো?
টেলিফোনে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।
চলে আসো না!
কোথায়?
আমাদের বাসায়। আমি এখন ছাদে যাবো।
এসে কি করবো?
এসো, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।
কি কথা?
টেলিফোনে বলা যাবে না। এসো।
বর্ষা আর কোনো কথা বলে না। টেলিফোন রেখে দেয়। আমি দুমিনিট টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে বর্ষার কথা ভাবি। বর্ষা আমাকে এমন করে ডাকছে কেন? কি অমন কথা!
একবার পোড়া হাতটার দিকে তাকাই। দগদগে ঘা হয়ে গেছে। ইচ্ছে করেই ওষুধ লাগাইনি। ঘা টা যেনো সহজে না শুকোয়। এহাত দেখে বর্ষা যেনো বারবার দুঃখ পায়। আমি বর্ষাকে দুঃখ দিতে চাই।
রিকশা থেকে যখন নামি তখন সন্ধে হয়ে গেছে। বর্ষাদের বিশাল বাড়ির আনাচে কানাচে অন্ধকার লুকোচুরি খেলছে। থমথমে নির্জনতা সারা বাড়িময়। এই বিশাল বাড়ির কোথায় বর্ষা লুকিয়ে আছে! বর্ষাকে আমি কোথায় খুঁজবো?

আমি আস্তে ধীরে হাঁটি। বর্ষাদের বাড়ি ঢুকি। ঢুকেই কেন যে ছাদের দিকে চোখ যায়। দেখি রাস্তার দিকে মুখ করে বর্ষা দাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যার মিষ্টি আলোয় কি যে সুন্দর লাগে বর্ষাকে! বর্ষা পরেছে গাঢ় নীল শাড়ি। ব্লাউজও নীল। বর্ষার ঠোঁটে টুকটুকে লাল লিপস্টিক আর কপালে উজ্জ্বল লাল টিপ। আমি এতোদূর থেকেও দেখতে পাই। বাড়ির ভেতর অতো সেজেগুজে বসে আছে কেন বর্ষা! অন্য কারো কি আসার কথা! আমার জন্য তো বর্ষা কখনো অতো সাজে না!

আমি কি দাঁড়িয়ে এসব ভাবছিলাম! বর্ষা ছাদ থেকে আমায় হাত ইশারায় ডাকে।

এ বাড়ির সব আমার চেনা। অনেকবার এসেছি। বর্ষাদের বাড়ির সবাই আমার চেনা। চাকর বাকর পর্যন্ত।

আমি মোলায়েম ভঙিতে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে যাই।

আমাকে দেখেই বর্ষা বিষন্ন হাসে। তুমি অতো দেরি করলে কেন?

দেরি কই! টেলিফোন ছেড়ে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় নিয়েছি। তারপর রিকশায় মিনিট পনেরো।

হবে হয়তো। কিন্তু আমার কেন যে মনে হচ্ছিলো অনেকটা সময় কেটে যাচ্ছে। কতোকাল ধরে আমি যেনো তোমার অপেক্ষায় আছি।

তোমার কি হয়েছে বর্ষা?

কই, কিছু না। বর্ষা ম্লান হাসে।

তুমি অতো সেজে আছো কেন?

এমনি।

কারো কি আসার কথা?

হ্যাঁ। কতোকাল ধরে যে একজনের আসার কথা। আমি অপেক্ষায় ছিলাম। আজ সে আসবে।

কখন?

কি জানি?

আমি বর্ষার কথা বুঝতে পারি না। অবাক হয়ে বর্ষার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। দেখে বর্ষা হাসে। দেখি, তোমার হাত দেখি।

দেখার কি আছে?

কতোটা পুড়েছে।

খুব বেশি না। বলে আমি ডান হাতটা পেছনে নিয়ে রাখি।

বর্ষা বলে, দেখি।

না।

আমাকে দেখাবে না?

কথাটা বলে এমন বিষন্ন ভঙিতে, শুনে আমার বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। আমি হাতটা বর্ষার চোখের সামনে মেলে ধরি। বর্ষা দুহাতে

আমার হাতটা জড়িয়ে ধরে। আ বর্ষার হাত কি নরম। এই বর্ষার প্রথম ছোঁয়া। আমারও। মুহূর্তে আমি সব ব্যথার কথা ভুলে যাই। বর্ষা আমাকে পুড়িয়েছিলো! সেই ব্যথায় আমার জ্বর এসে গিয়েছিলো। ভুলে যাই। সব ভুলে যাই।

বর্ষা বল্লে, ওষুধ লাগাও নি?

না।

কেন কেন, বলে বর্ষা দুহাতে আমার হাতটা জড়িয়ে রাখে। তারপর মাথা নিচু করে পোড়া হাতে মুখ ঘষতে থাকে। তুমি আমাকে অতো কষ্ট দাও কেন! আমি আর পারি নাগো

বর্ষার চোখের জল আমার হাত ভিজিয়ে দেয়। আমি বৃক্ষের মতো নির্বোধ দাঁড়িয়ে থাকি। আমার মাথায় কোনো শব্দ ঢোকে না। কেবল দূরে, বহুদূরে মৃদু একটা নদীর শব্দ পাই। ছলছল করে বয়ে যায়! তার ওপারে বসে ডাকে এক কোকিল। কি যে মিষ্টি আর বিষন্ন ডাক!

১৯৭৯

মৌ

কাল রাতে আমি স্লিপিং পিল খেয়েছি। সিডাকসিন ফাইভ। এই ট্যাবলেটটা খেলে বেশ অদ্ভুত ব্যাপার হয় আমার। খুব সকালবেলা ঘুম ভাঙে। ছটার মধ্যে। এমনিতে আটটার আগে আমি কখনো বিছানা ছাড়ি না। সকালবেলা চোখে ঘুম না থাকলেও বিছানায় শুয়ে থাকতে বেশ লাগে। আর এবছর যে কি হলো, মার্চ শেষ হয়ে এলো তবুও সকালবেলা লেপ গায়ে দিতে হয়। শীতটা যায়নি। শুয়ে থাকতে চমৎকার লাগে।

কাল সন্ধ্যায় মৌর সাথে আমার কথা হয়েছে আজ আমরা চিড়িয়াখানা দেখতে যাবো। ও কখনো চিড়িয়াখানা দেখেনি।

মৌকে চিড়িয়াখানা দেখার কথা প্রথম বলি আমি। শুনে মৌ খানিক চুপ করে থাকে। তারপর বলে, যাবো। সেই থেকে আমার টেনশান। আমি কখনো কোনো মেয়েকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যাইনি। খুব সুন্দর কোনো মেয়েকে কোনো নির্জন জায়গায়, যেখানে লেক আছে, লেকে হাজারো রকমের হাঁস গাছপালা ফুলবন হরিণ ময়ূর এসব

আছে সেখানে দুজনে ঘুরে বেড়ানো কিযে সুখের, কথাটা ভেবেই আমার টেনশান। রাতেরবেলা ঘুমই আসে না। কেবলই চোখে ভাসে মিরপুরের রোদে গাছপালার ছায়াপথে আমি আর মৌ দুজনে দুজনার হাত ধরে সিনেমার নায়ক নায়িকার মতো হেঁটে যাচ্ছি। ঘুম কি আসে! ট্যাবলেট খাই।

সকালবেলা বিছানা ছেড়েই শেভ করি। বাথরুম সারি, গোসল করি। সাতটা বেজে যায়। এখন কি করবো! মৌর সঙ্গে কথা হয়েছে নটায় আমাদের দেখা হবে রমনা রেস্টুরেন্ট। গেণ্ডারিয়া থেকে সাড়ে আটটায় রিকশায় চড়লেই হবে। নটার দুপাঁচ মিনিট আগেই পৌঁছোনো যাবে। মৌ বলেছে আমি যেনো একটু আগে গিয়ে গেটে দাঁড়িয়ে থাকি। ও আগে আসবে না। কারো জন্যে অপেক্ষা করতে ওর খুব খারাপ লাগে।

কিন্তু এখন বাজে সাতটা। এই দেড় ঘন্টা আমি কি করি! সামনে পরীক্ষা। একটু পড়বো! বই নিয়ে বসি। পড়া কি হয়! কেবল মৌর কথা মনে পড়ে। কাল সন্ধ্যায় মৌ আর আমি অনেকক্ষণ এক রিকশায়। মৌ কি খানিকটা মোটা হয়েছে! রিকশায় একথাটা আমার মনে হয়! মৌকে বলায় ও খুব রেগে গিয়েছিলো। আমি ডিম মাংস খাই না কতোকাল, মা বলেছে মরে যাবো, তুমি বলছো মোটা হয়ে গেছি।

পড়তে বসে কথাগুলো মনে হয়। খুব হাসি পায়। ইকনমিক্স মাথার ভেতর থেকে উড়ে পালায়!

নটার ঠিক পাঁচ মিনিট আগে আমি রমনা রেস্টুরেন্টে চলে আসি। নাস্তা খাইনি। খিদের কথা মনেই ছিলো না।
রিকশা থেকে নেমে একটা সিগারেট ধরাই। ট্রিপল ফাইভ। আমার ফেবারিট সিগারেট ডানহিল। কিন্তু আজ কিনেছি ট্রিপল ফাইভ। ডানহিলের বড়ো প্যাকেট পকেটে রাখতে অসুবিধা। ট্রিপল ফাইভ সাইজ মতো।

সিগারেট খেতে খেতে 'আমি' নিজেকে দেখি। আমি আজ পরেছি বিসকিট কালারের প্যান্ট, বিসকিট কালারের শার্ট। ইন করা। পায়ে জুতো হাতে সিকো ফাইভ ঘড়ি। নিজেকে খুব স্মার্ট লাগে। সিগারেট খেতে খেতে ঘড়ি দেখি, নটা পাঁচ দশ পনেরো। মৌ আসছে না কেন! কারো জন্যে অপেক্ষা করতে যে আমারও খারাপ লাগে মৌ কি জানে না!
কাল মৌকে আমি বলেছিলাম আমার ফেবারিট কালার নীল। মৌ বলেছে ওরও। মৌ কি আজ তাহলে নীল শাড়ি পরে আসবে! নীল শাড়ি পরলে মৌকে আজ খুব সুন্দর লাগবে। এমনিতেই মৌ খুব সুন্দর। ধবধবে ফর্শা রং সুন্দর চোখ। মৌকে দেখলে আমার মনে হয় অন্ধকার রাতে বনভূমির ভেতর দিয়ে মৌ হেঁটে গেলে জ্যোৎস্নার মতন

আলোকিত হয়ে যাবে চারদিক। আর মনে পড়ে মান্নাদের একটা গানের লাইন। ও চাঁদ সামলে রাখো জোছনাকে

আজ সকাল থেকে আকাশ খুব মন খারাপ করে আছে। রোদ ওঠেনি। ছেঁড়াখোড়া মেঘ ভাসছে। পাতলা একটা হাওয়া আছে। পার্কের গাছ-পালায় বাতাসের শব্দ শ্বাসপ্রশ্বাসের মতন। মৌর কথা ভেবে আমার খুব ভালো লাগে। ওয়েদারটা চমৎকার। মৌ রোদ সইতে পারে না। ও খুব নরম মেয়ে, রোদে হাঁটলে মোমের মতো গলে যাবে। আজ রোদ নেই, মৌকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে একটুও কষ্ট হবে না।

কিন্তু মৌ এখনো আসছে না কেন? পৌনে দশটা বাজে। ও কি তাহলে? কথাটা আমি ভাবতে পারি না। আমাকে কথা দিয়ে মৌ না এসে পারে না। আমি অপেক্ষা করবো, দরকার হলে সকাল নটা থেকে রাত নটা অব্দি।

আমি আবার সিগারেট ধরাই।

মৌ আসে ঠিক দশটায়। দূর থেকেই আমাকে দেখে হাসে। মৌর হাসিটা ভারি মিষ্টি। কিন্তু মৌকে দেখেই আমার একটু মন খারাপ হয়ে যায়। মৌ পরে আছে বেগুনি রঙের প্রিন্ট জর্জেট। আমি ভেবেছিলাম ও আজ নীল শাড়ি পরবে। পরেনি। কেন পরেনি? জানতে ইচ্ছে করে। তবুও জিজ্ঞেস করি না। বলি, এতো দেরি করলে কেন?

মৌ হাসে। তুমি কখন এসেছো?

নটায়।

নাস্তা করেছো?

আমি রিকশায় মৌর পাশে বসতে বসতে বলি, করেছি।

মৌ আমার মুখের দিকে তাকায়। মিথ্যে বলছো কেন?

মৌর গলাটা ভারি মিষ্টি আর আদুরে। আমার খুব ভালো লাগে। এক ঘন্টা অপেক্ষা করেছি, ভুলে যাই। বলি, তুমি নাস্তা করেছো মৌ?

না, নিয়ে এসেছি। দুজনে খাবো।

মৌর হাতে শাদা ভ্যানিটি ব্যাগ। আর একটা খাতা। দেখে আমি বলি, এসব এনেছো কেন?

বারে মাকে যে বললাম, নোট নিতে যাচ্ছি। খালি হাতে কলেজে যাওয়া যায়!

আমি হাসি। তখুনি টের পাই মৌর গায়ে ভারি মিষ্টি গন্ধ। মৌ খুব সেন্ট মেখেছে। কি সেন্ট? কান্তা না ইনটিমেট? জিজ্ঞেস করি না। অতো কিছু কি জিজ্ঞেস করা যায়! মৌর সঙ্গে আমার পরিচয় অল্প কদিন। কাল সন্ধ্যায় আমরা 'তুমি' হয়েছি। এতো সহজে সবকিছু জানতে চাইলে মৌ যদি আমাকে অন্য রকম ভাবে!

ইন্টারকনের সামনে এসে আমরা স্কুটার নিই। মৌ যে রিকশা নিয়ে

এসেছে, ভাড়া আমি দিয়ে দিই। আমার পকেটে হেভি পয়সা। পুরো একশো টাকা। কাল সন্ধ্যায় মৌর সঙ্গে প্রোগ্রাম হওয়ার পরই ম্যানেজ করে রেখেছি। দূরে কোথাও যাচ্ছি, সঙ্গে দারুণ সুন্দরী একজন, পকেটে হেভি পয়সা না থাকলে নিজেকে এতিম এতিম লাগবে না !
স্কুটারে চড়ে আমি আবার সিগারেট ধরাই। প্যাকেটটা রাখি মৌর খাতাটার ওপর। সিগারেট ধরাতে দেখে মৌ খুব রেগে যায়। তুমি অতো সিগারেট খাও কেন ?
খুব বেশি খাই না। দিনে চার পাঁচটা।
চার পাঁচটা ! মৌর চোখ বড়ো হয়ে যায়। তারপরই হাসে। আজ কটা কিনেছো ?
দশটা।
এতোগুলো খাবে ?
কোথাও বেড়াতে গেলে সিগারেট বেশি খাই।
খুব বেশি খেতে পারবে না, বলে মৌ আমার সিগারেটের প্যাকেটটা ওর ভ্যানিটি ব্যাগে রাখে। ব্যাগটা ছোট, সিগারেটের প্যাকেট রাখলে বন্ধ করা যায় না। মৌ প্যাকেট খুলে সিগারেট গুলো ছড়িয়ে রাখে ব্যাগের ভেতর। তারপর খালি প্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দেখে আমি হাসি। মৌ বলে, আমি যখন দেবো তখন খাবে।
আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি, আপনার দয়া।
শুনে মৌ খুব হাসে। মুখে আঁচল চেপে হাসে। ওর হাসির শব্দ বাতাস বহুদূর ঠেলে নেয়।

চিড়িয়াখানায় ঢুকে মৌ তার খাতাটা দেয় আমার হাতে। ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে লাল প্লাস্টিকের একটা গোগো পরে। ভারি সুন্দর লাগে মৌকে। আমি তাকিয়ে দেখি। নিজেকে ওর পাশে কি খুব বেমানান লাগে !
একটা চকলেটঅলা আমাদের দেখে বলে, টফি নিবেন স্যার ?
আমি মৌকে বলি, টফি খাবে ?
নাও।
কোনটা ?
মৌ বাচ্চা মেয়ের মতন একটা টফি দেখিয়ে বলে, এটা। আমার কি যে ভালো লাগে ! ছটা টফি কিনি।
মৌর হাতে দিতেই মৌ নিজে একটা নেয়, আমাকে একটা দেয় ! টফি খেতে খেতে আমরা হাঁটি। মৌ বলে, আমার খুব ভালো লাগছে।
আমি বলি, আমারও।

মৌ খুব হাসে।
চিড়িয়াখানার গেট পেরিয়েই বানরের ঘর। কাছাকাছি গিয়ে মৌ বললো, ওমা বাঁদর! আমার বিচ্ছিরি লাগে। বাঁদর আমি দেখবো না!
চলো তাহলে বাঘ দেখি।
চলো।
মৌ খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিলো। আমি খানিকটা এগিয়ে গিয়েছি দেখে মৌ বললো, অতো জোরে হাঁটছো কেন?
পিছিয়ে মৌর পাশে আসি। বলি, সরি।
মৌ আমার দিকে তাকায়। মৌর চোখ ভারি সুন্দর। তাকালে আমার বুকের ভেতর কি যেনো কি ঘটে যায়!
মৌ চিতা বাঘের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলে, কালো ওটা কি?
ওটাও বাঘ। কালো বাঘ।
যা বাঘ বুঝি কালো হয়!
হয়। ঐ দেখো লেখা আছে!
মৌ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। তারপর বলে, বাঘ এতো ছোট কেন?
চিতাবাঘ একটু ছোটই হয়। ওদিকে চলো, রয়েল বেঙ্গল টাইগার আছে।
খানিকটা এগিয়েছি হঠাৎ আমার পাশে মৌ দাঁড়িয়ে পড়ে। জিভ কেটে, ভয় খেয়ে বলে, ওমা আমাদের ক্লাশের একটা ছেলে।
আমি তাকিয়ে দেখি আমিনুল! আমার চেনা। বলি, ওকে আমি চিনি।
ও ক্লাশের সব ছেলে মেয়েকে বলে দেবে। আমি একেবারে লজ্জায় মরে যাবো। এমনিতেই ক্লাশের সব ছেলেগুলো আমার পেছনে লাগে।
আমি হেসে বলি, কেন?
আমি কাউকে পাত্তা দিই না যে! চান্স পেলে তাই সবাই আমার পিছু নেয়।
পাত্তা দাও না কেন?
আমার কাউকে ভালো লাগে না। সবগুলো মেয়েদের দেখে ছোঁক ছোঁক করবে। একটাও পুরুষ নেই।
আমি হো হো করে হেসে উঠি। মৌ বলে, ও যদি সবাইকে বলে দেয়?
বলবে না। আমি ওকে মানা করে দেবো।
তোমার মানা শুনবে?
দেখো শোনে কি না শোনে, বলে আমি হাত ইশারায় আমিনুলকে ডাকি। কি খবর রে?
আমিনুল হেসে বলে, ঘুরছি। তারপর মৌর দিকে তাকায়।
আমি বলি, তুই ওকে চিনিস না?
চিনবো না, এক ক্লাশে পড়ি!
সিগারেট খাবি?

দে।
মৌ তখুনি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে একটা সিগারেট দেয়। আমি আমিনুলের হাতে সিগারেট দিয়ে ম্যাচ জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিই। ধোঁয়া ছেড়ে আমিনুল বলে, যাই। আমার সঙ্গে লোক আছে।
কে?
একজন পুলিশ অফিসার। আমার রিলেটিভ।
শুনে আমি আর মৌ একসঙ্গে হেসে উঠি। আমিনুল চলে যায়। তখন মৌকে বলি, ভয় নেই। আমিনুল কাউকে বলবে না।
মৌ হাসে।
ঠিক তখুনি দূর থেকে রয়েল বেঙ্গল দেখে মৌ প্রায় হাততালি দিয়ে ওঠে, এতো বড়ো?
হ্যাঁ এরচেও বড়ো হয়।
আমরা খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়াই। ঘোড়ার মতন বিশাল জীবটা খাঁচার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে। বোঁটকা একটা গন্ধ বাতাসে। মৌ নাক সিঁটকে বললো, ওমা কি বিচ্ছিরি গন্ধ! পরিষ্কার করে না?
করে।
তাহলে গন্ধ কেন?
ওটা বুনো গন্ধ। পরিষ্কার করলেও যায় না।
তখন কালো প্যান্ট আর স্যাণ্ডো গেঞ্জি, মাথায় ক্যাপ বুড়ো মতন একটা লোক খাঁচার একেবারে কাছে গিয়ে চোঁ চোঁ করে বাঘটাকে ডাকে। বাঘটা পোষা বেড়ালের মতন কাছে এসে মোটা শিকের ফাঁকে মুখ রাখে। আহলাদে গোঁ গোঁ শব্দ করে। লোকটা দুহাতে বাঘটার মুখে হাত বুলায়। দেখে মৌ ভয়ে মরে। কী সাহস!
তখুনি বাঘটা বোধহয় একটু বেয়াদপি করে। লোকটা এক ধমক লাগায়। ধমক খেয়ে অতো বড়ো জীবটা বাচ্চা ছেলের মতন ভয় পেয়ে পড়িমরি দৌড় লাগায়। দেখে মৌ খিল খিল করে হেসে ওঠে। আমিও হাসি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, এতো বড়ো একটা বাঘ পুঁচকে একটা মানুষের ধমকেই পালিয়ে যায়। ভারি অবাক ব্যাপার। আমার খুব দুঃখ হয়।
মৌ বলে, কেন?
মানুষের কাছে হেরে যাওয়া বাঘের মানায় না।
মৌ হাসে। আমার মুখে তাকায়, তুমি খুব সুন্দর কথা বলো।
শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে। চেপে রেখে বলি, একটা সিগারেট দেবে মৌ?
মৌ খুব বাধ্য মেয়ের মতন সিগারেট বের করে দেয়।

আমি সিগারেট খাই, মৌ খায় টফি। দুজনে হাঁটি। হাতি ঘোড়া বাঘ ময়না টিয়া সব দেখি। মাছরাঙা দেখে মৌ খুব খুশি। মুগ্ধ গলায় বলে, কী সুন্দর!

দুটো ময়ূর পেখম ধরে নাচছিলো। খাঁচার কাছে গিয়ে মৌ আর আমি দাঁড়াই। মৌ অপলক তাকিয়ে আছে দেখে আমি বলি, ময়ূরের মধ্যে একটা বেশ রানী রানী ইমেজ আছে!

শুনে মৌ হাসে।

আমরা তারপর হরিণ দেখতে যাই। মায়া হরিণ দেখে মৌ বলে, হরিণ নাকি বাদাম খায়?

হ্যাঁ। খাওয়াবে?

না। আমার ভয় করে।

কিসের ভয়?

যদি কামড়ে দেয়!

শুনে আমি হো হো করে হেসে উঠি। হরিণ কখনো কামড়ায় নাকি!

সিংহ দেখে মৌ বলে সিংহের চেহারায় কেমন একটা পার্সোনালিটি আছে, না?

আমি বলি, হ্যাঁ।

পুরুষ মানুষের এরকম পার্সোনালিটি থাকা উচিত।

তাই নাকি? আমি হাসি।

মৌ সামনের দিকে তাকিয়ে বলে, আমিনুল।

আমিও তাকাই। দূরে একজন লোকের সঙ্গে আমিনুল হাঁটছে। বিরক্ত লাগে। মৌ বলে, এমন কোনো নির্জন জায়গায় যাওয়া যেতো যেখানে কেউ কাউকে চেনে না। ভারি ভালো হতো, না?

আমি ভারি গলায় বলি, সবাই সবাইকে চেনে। যেহেতু আমরা মানুষ!

অতো শক্ত কথা আমি বুঝি না। মৌ মুখ ভার করে।

আমি হাসি।

একটা বাচ্চা ছেলে অনেকক্ষণ ধরে আমাদের পেছনে ঘুর ঘুর করছিলো। আমি ওর দিকে তাকাতেই বললো, চটপটি খাইবেন স্যার?

না।

ফান্টা?

না।

খাইলে আমার কাছ থাইকা খাইয়েন। আপনারা কোনদিকে বইবেন কন। উত্তরের লেকে না দক্ষিণের লেকে। আমি দিয়ামুনে।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি, যা এখন।

সামনে ছোট্ট একটা পার্ক ছিলো। কিছু ফুল। দুটো দোলনা। আমি মৌকে বলি, দোলনা চড়বে?

চড়বো।
মৌ ছুটে গিয়ে দোলনায় বসে। ভ্যানিটি ব্যাগটা দেয় আমার হাতে। আমি আস্তে আস্তে দোলনায় দোল দিতে থাকি। মৌ খিলখিল করে হাসে। কি যে ভালো লাগে আমার।
খানিকপর মৌ বলে, থামাও। বেশি দুললে নেশা হয়ে যাবে।
আমি দোলনা থামাই। মৌ লাফিয়ে নামে। চলো কোথাও গিয়ে বসি। টায়ার্ড লাগছে।
মৌ আমার হাত থেকে ভ্যানিটি ব্যাগ নেয়, খাতাটা নেয়। তারপর হাঁটে। বলে, তোমার খিদে পায়নি ?
আমার সত্যি সত্যি খুব খিদে পেয়েছিলো। সকাল থেকে কিছু খাইনি। এখন সাড়ে বারোটা বাজে। কিন্তু চেপে রাখি। বলি, না।
মিথ্যে কথা বলছো কেন ? ছেলেদের তো বার বার খিদে পায়।
আমি হাসি। তুমি এতো কিছু জানো কেমন করে ?
মেয়েদের সব জানা হয়ে যায়।
তারপরই খুব ব্যস্ত হয়ে মৌ বললো, বাথরুম কোথায় ?
আছে কোথাও। যাবে ?
হ্যাঁ।
শুনে আমি হেসে ফেলি। মৌ বলে, হাসছো কেন ?
এমনিতেই।
বুঝেছি। বলে মৌ হাসে।
বাথরুমের কাছে এসে মৌ বলে, তুমি যাবে না ?
এ কথায় আমার ভেতর একটু দুষ্টুমি খেলে যায়। বলি, দুজন এক সঙ্গে গেলে লোকে কি বলবে!
শুনে মৌ লজ্জায় মরে। চোখ বুজে খাতা আর ভ্যানিটি ব্যাগ আমার হাতে দিয়ে বাথরুমে যায়।
আমরা তারপর দক্ষিণের লেকের ধারে, তিনদিক খোলা, মাথার ওপর ছাদ, সুন্দর বসার ব্যবস্থা, সেখানে গিয়ে বসি। বাচ্চা ছেলেটা ছুটে আসে, স্যার
আম বলি, দুটো ফান্টা আন।
ছেলেটা ছুটে চলে যায়। তখুনি মৌ ওর লম্বা খাতাটার ভেতর থেকে একটা খালি মিল্কভিটার প্যাকেট বের করে আমার হাতে দেয়। খাও। আমি প্যাকেটের ভেতর থেকে তিনটে ডালপুরি বের করি। মৌ বলে, আমাদের কাজের মেয়েটা বানিয়েছে। সকালের নাস্তা। আমি না খেয়ে নিয়ে এসেছি।
এসো দুজনে খাই।
আমি খাবো না। আমার একটুও খিদে নেই।

তুমি তো সকাল থেকে কিছুই খাওনি।
আমি না খেয়ে থাকার প্র্যাকটিস করছি। স্লিম হবো।
কার জন্য?
মৌ হাসে, একজন কারো জন্য। তুমি খাও।
আমি একটা ডালপুরির অর্ধেক খেয়েছি, ফান্টা আসে। মুখ খোলা। স্ট্র আছে। মৌ স্ট্রতে ঠোঁট ছোঁয়ায়। আমার এক হাতে ফান্টা অন্য হাতে ডালপুরি। ডালপুরি শেষ করে ফান্টা খাবো।
মৌ বললো, যা স্ট্রটা ভেঙে গেলো। আমারটা নাও, বলে আমি আমার স্ট্রটা মৌকে দিই। তারপর সামনের লেকের দিকে তাকিয়ে ডালপুরি খাই। লেকে অনেক হাঁস দেখতে দেখতে উদাস হয়ে যাই।
মৌ বলে, তুমি ফান্টা খাচ্ছো না?
মৌর ফান্টা খাওয়া শেষ। বোতলটা নামিয়ে রাখে। স্ট্রটা ঠিক আছে দেখে মৌর ঠোঁটে লাগানোটাই আমি নিই। দেখে মৌ বলে, এই এটা না আমি মুখে দিলাম!
তাতে কি! আমি অবলীলায় ফান্টা খাই।
আমাদের সামনে একটা হিজলগাছ, কোথা থেকে তার ডালে একটা দোয়েল এসে বসে। সকাল থেকে আকাশ আজ মেঘলা ছিলো। এইমাত্র চমৎকার রোদ উঠেছে। পৃথিবী বড়ো সুন্দর লাগে।
দোয়েল দেখে মৌ বললো, ওটা কি পাখি?
আমি বলি, দোয়েল।
ভারি সুন্দর তো। কোয়েল কেমন?
জানি না তো।
কোয়েল নামটা খুব সুন্দর, না?
হুঁ।
বাচ্চা ছেলেটা এসে তখন ফান্টার বোতল নিয়ে যায়। দাম নেয় দশ টাকা। দিয়ে দিই। মৌ আছে সঙ্গে, ছেলেটাকে কিছু বলা যায় না। চারটাকা বেশি নেয়, তবুও চেপে থাকি। আসলে আমি তখন অন্য-কথা ভাবছি। কেন যে মনে হয় মৌকে কেউ ভালোবাসতো! আদর করে সেই মানুষটি মৌকে ডাকতো কোয়েল বলে। সত্যি কি এরকম কিছু ঘটেছিলো মৌর জীবনে! জিজ্ঞেস করি, মৌ তোমাকে কেউ ভালোবাসে?
মৌ একটু অবাক হয়। তারপর বলে, বাসতো।
কে?
আমাদের এক লেকচারার।
সে এখন কোথায়?
রাজশাহী।

তুমি তাকে ভালোবাসতে ?
বাসতাম। এখন ঘৃণা করি।
কেন ?
লোকটা একটা ইডিয়ট। আমাকে ভালোবাসার কথা বলে, বিয়ে করার কথা বলে আবার অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে প্রেম করলো। খুব ভালো হয়েছে, সেই মেয়েটা ওকে ছ্যাঁক দিয়েছে।
সে তোমাকে চুমু খেয়েছে ?
খেয়েছে। জোর করে। পারমিশান চেয়েছিলো। আমি দিইনি। তখন জোর করে। তারপর পাঁজা কোলে নিয়ে খুব ঘুরপাক খেয়েছিলো।
এই কথাটা শুনে আমার কিযে হয়, চোখের ওপর দেখি সুন্দর একটা ঘরে মৌকে পাঁজা কোলে নিয়ে একজন পুরুষ ঘুরপাক খাচ্ছে। দৃশ্যটা দেখতে ভাল্লাগে না। বলি, মৌ তোমার ওয়েট কতো ?
তুমি বলো তো ?
আমি কিছু না ভেবেই বলি, একশো আট পাউন্ড।
না, একশো পাঁচ। তারপর একটু হেসে বলে, ওয়েট জিজ্ঞেস করলে কেন ?
জেনে নিলাম, তোমাকে কোলে নেয়া যাবে কি না।
কোলে চড়তে আমার খুব ভালো লাগে।
এসো তোমাকে কোলে নিই।
যা। লোকে দেখলে কি ভাববে ?
ভাববে প্রেমিক প্রেমিকা।
না।
তারপর আমি আর কিছু বলি না। মৌ হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করে, তোমাকে কেউ ভালোবাসে ?
একজন বাসতো। বিয়ে হয়ে গেছে।
তুমি তাকে ভালোবাসতে না ?
তখন বাসতাম না, এখন বাসি।
এখন তো তার বিয়েই হয়ে গেছে।
হলেই বা। সে আমাকে ভালোবাসে কথাটা আমি জানতে পারি তার বিয়ের দুদিন আগে। তখন আমার কিছু করার ছিলো না।
দেখতে কেমন ছিলো ?
ভারি সুন্দর, ঠিক তোমার মতো।
সত্যি ?
সত্যি। এজন্যেই তো তোমাকে আমার এতো ভালো লাগে।
মৌ কোনো কথা বলে না। আমিও চুপ করে থাকি। খানিকটা সময় কেটে যায়। আমার খুব মিতির কথা মনে পড়ছিলো। মিতি আমাকে

ভালোবাসতো, কথাটা আমি জানি ওর বিয়ের দুদিন আগে। এখন ওসব ভাবতে ভালো লাগে না। মৌর পারমিশান ছাড়াই ওর ব্যাগ খুলে একটা সিগারেট নিয়ে ধরাই। মৌ কিছু বলে না। ওকে ভারি উদাস দেখায়। মৌ কি সেই লেকচারারের কথা ভাবছে? আমার রাগ লাগে। বলি, মৌ একটা গান করো।
মৌ হাসে। আমি বুঝি গান জানি!
নিশ্চয়ই জানো। তোমার কথা শুনলে বোঝা যায়।
গাইতে পারি, কিন্তু তুমি আমার দিকে তাকাবে না।
কেন?
তুমি তাকালে আমার হাসি পাবে।
ঠিক আছে, আমি ঘুরে বসছি। বলে আমি মৌর দিকে পিঠ দিয়ে বসি। মৌ গান শুরু করে—'চন্দন পালঙ্কে শুয়ে একা একা কি হবে, জীবনে তোমায় যদি পেলাম না।'
মৌর গলা ভারি মিষ্টি। গানের সঙ্গে সঙ্গে আমার কেমন অদ্ভুত একটা ব্যাপার হয়। চোখের ওপর দেখি, দোতালার ওপর ছোট্ট একটা কাঠের ঘর। মাথার কাছের জানালা দিয়ে খানিকটা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে খাটের ওপর। সেই আলোয় এক হাতে ভর রেখে আধশোয়া হয়ে আছে মৌ। গান গাইছে, 'চন্দন পালঙ্কে শুয়ে'। আমি শুয়ে আছি মৌর বুকের কাছে।
পরপর অনেকগুলো গান গাইলো মৌ। তারপর বললো, চলো ফিরে যাই। তিনটে বাজে। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।
রাতে ঘুমোওনি?
ঘুম আসেনি। স্লিপিং পিল খেয়েছিলাম তবুও ঘুম আসেনি।
শুনে আমি চমকে উঠি। মৌ ও কি তাহলে আমার মতন টেনশানে ছিলো! চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে আমি বলি, চিড়িয়াখানায় আরো কিছু জীব রাখা উচিত।
কি রকম?
ধরো বিভিন্ন রকমের মেয়ে, বিভিন্ন রকমের পুরুষ।
শুনে মৌ হেসে মরে যায়।
স্কুটারে চড়ে মৌ আমাকে বলে, ডালপুরি খাও। তুমি খেলে আমার খুব ভালো লাগবে।
আমি কথা বলি না। একটা ডালপুরি খাই। তারপর সিগারেট ধরাই। তেজগাঁয়ের কাছে এসে মৌ বললো, রিকশা নাও। স্কুটারে কথা বলা যায় না।
আমি স্কুটার ছেড়ে রিকশা নিই। মৌ বলে, আজ থেকে আমার কেবল তোমার কথা মনে পড়বে।

আমারও মনে পড়বে তোমার কথা।
ফিরে যাচ্ছি, আমার একটুও ভাল্লোগছে না।
আমারও।
হঠাৎ কথা পাল্টে মৌ বললো, একটা ডালপুরি যে রয়ে গেলো!
খাবো না। ভাল্লাগছে না।
এটা ফিরিয়ে নিয়ে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে।
তাহলে দাও। আমি আমার বন্ধুদের খাওয়াবো, বলে মিল্কভিটার প্যাকেটসহ ডালপুরিটা ভাজ করে পকেটে রাখি। মৌ বলে, ছি ছি ওরা কি ভাববে?
কি ভাববে?
প্রমিস করো তুমি কারো কাছে আমার কথা বলবে না!
বলবো না।
আমি কসম টসমে বিশ্বাসী নই। তারচে এসো তোমাকে ছুঁয়ে বলি। সঙ্গে সঙ্গে মৌ তার ডানহাত বাড়িয়ে দেয়। আমি ওর হাত ধরি। ধরে থাকি। আ মৌর হাত কি নরম! আমার ভেতর কি যেনো ঘটে যায়! চোখে দেখি সারা পৃথিবীতে কোনো লোক নেই। কেবল আমি আর মৌ। আর বুড়ো রিকশাঅলা। সামনে খা খা সরল কালো পথ। ভাই রিকশাঅলা, তুমি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছো! কোন সুন্দর জীবনে!
মৌ বললো, এই কি ভাবছো?
আমি চমকে মৌর মুখের দিকে তাকাই। তাকিয়ে থাকি। মনে মনে বলি, জ্যোৎস্না রাতে তোমাকে একদিন পাঁজা কোলে নিয়ে খুব ঘুরপাক খাবো। ঠোঁটে ঠোঁট রেখে বলবো, মৌ তোমাকে আমি ভালোবাসি।

১৯৭৭

হৃদয়পুর

রিকশা থেকে নেমেই চুমু বললো, তোমার ভালো লাগছে না?
দিপু ছিলো একটু উদাস, একটু বিষণ্ণ। চার ঘন্টার বাস জার্নি। তার উপর এ লাইনের রাস্তা লোম ওঠা কুকুরের মতো দাদরা খাদরা। ঝাকুনিতে দিপুর শরীর অবশ হয়ে আছে। দিপুর কখনো এতোদূর পথ বাসে যাওয়া হয়নি।

তবুও ক্লান্তি কাটিয়ে দিপু বললো, ভালো লাগছে। তারপর মৃদু হাসলো।
চুমু এখন বাচ্চা মেয়ের মতো উচ্ছল। তাই দেখে দিপু ভেতরে ভেতরে অবাক হচ্ছিলো। এই গুমোট গরমে এতোদূর পথ এসেও চুমুর কোনো ক্লান্তি নেই কেন!
দিপু একপলক চুমুর মুখের দিকে। চুমু তাকিয়ে ছিলো নদীর দিকে। সামনে অনেকটা বালিয়াড়ি। তারপর সরু নদী, চুমুর সিঁথির মতো। খেয়াঘাট। দুপুরের রোদ নদীর কোমল জলে খেলা করছে। মৃদু একটা হাওয়া ছিলো। নদীতে জল হাওয়ার মনোরম খেলা।
চুমু মুগ্ধ হয়ে নদীর দিকে তাকিয়েছিলো। চুমু পরেছে গাঢ় নীল শাড়ি। তাতে রোদ পড়ে অনেকটা নদীর মতো দৃশ্য। আর চুমুর চুলে খেলছিলো নদীর অবোধ হাওয়া। একপলক চুমুকে দেখে দিপু সব ক্লান্তি ভুলে যায়। মনে মনে বলে, চুমু আমি তোমাকে ভালোবাসি।
কেউ শোনে না। কেবল মন শোনে মনের কথা।
দিপু বললো, এখন?
নদীর ওপার! তারপর বাস! দিপুর মন খারাপ হয়ে যায়।
চুমু মিষ্টি হেসে বলে, মাত্র দশ মাইল। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো লাগবে।
এতোক্ষণ?
তোমার খারাপ লাগবে না। ধু ধু মাঠের উপর দিয়ে পথ। বাস চলতে শুরু করলে দেখবে কি সুন্দর দৃশ্য।
দিপু কথা না বলে হাঁটে। চুমু তখনো মুগ্ধ হয়ে চারদিক দেখছে। চুমু যে কি! এসবের ভেতর দেখার কি আছে!
তবুও চুমুকে কিছু বলা যায় না। বিয়ে হয়েছে মাত্র কদিন। এসময় চুমুর কোনো ইচ্ছের বিরোধিতা করা কি ঠিক!
দিপু চেয়েছিলো কক্সবাজার যেতে। সমুদ্র তীরে চমৎকার কটি দিন কাটিয়ে আসা যেতো। চুমু রাজি হয়নি। চুমুর ইচ্ছে বিয়ের পরপরই এখানে আসবে। বহুকাল এখানে ওর আসা হয়নি।
দিপু কি না এসে পারে!
ঘাটে এসে চুমু বললো, আমরা একা একটা নৌকো ভাড়া করবো। বেশি পয়সা লাগবে না। দুতিন টাকা।
শুনে দিপু একটু হাসে। তুমি পয়সার কথা ভাবছো। আশ্চর্য!
বিয়ে হয়েছে, এখন বৈষয়িক হওয়া উচিত। তারপর চুমু খুব সুন্দর করে হাসে।
ঘাটে অনেকগুলো ডিঙি নাও। মাঝিরা ডাকাডাকি করছিলো। একটি নাওয়ে অনেকগুলো লোক বসে। ওপারে যাবে। মাঝি তবুও নাও ছাড়ছে না। আরো যাত্রী চাই।
দিপুদের দেখে মাঝিটি চেঁচিয়ে বললো, অহেন স্যার। অহনেই ছাইরা দিমু।

চুমু ততোক্ষণে অন্য নাওয়ে চড়ে বসেছে। তার দেখা দেখি দিপুও।
তখন দুপুরের রোদ চারদিকে তীব্র। নৌকায় ছই নেই। খোলা আকাশের তলায় বসে রোদে গরমে ঘেমে যাচ্ছিলো দিপু। দিপু একদম রোদ সইতে পারে না। তবুও মুখে কিছু না বলে চুপচাপ বসে থাকে।
নৌকোয় চড়ার পর থেকেই চুমুকে খুব আনমনা দেখাচ্ছিলো। জলের দিকে তাকিয়ে চুমু কি ভাবছে!
দিপু একটু নড়েচড়ে বললো, সিগারেট খাবো। শুনে চুমু কি একটু চমকে ওঠে। দিপু ঠিক বুঝতে পারে না। চুমু এরকমই। বিয়ের রাত থেকেই দিপু খেয়াল করেছে, চুমু হঠাৎ হঠাৎ আনমনা হয়ে যায়। ডাকলে চমকে ওঠে। এই যেমন এখন।
দিপু বললো, কি ভাবছো?
কিছু না। চুমু হাসে। তারপর ব্যাগ খুলে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার বের করে দেয়। দিপু খুব বেশি সিগারেট খায় বলে সিগারেটের প্যাকেট চুমু তার ব্যাগে লুকিয়ে রাখে। গুনে গুনে সিগারেট দেয়।
সিগারেট জ্বালাতে জ্বালাতে দিপু দেখে চুমু আবার আনমনা হয়ে গেছে। গরমে চুমুর নাকের তলায় জমেছে চিনির রোয়ার মতো ঘাম। চুমুকে যে কি সুন্দর লাগে!
সিগারেটে টান দিয়ে দিপু আবার মনে মনে বলে, চুমু আমি তোমাকে ভালোবাসি।
ঠিক তখুনি মাথার উপর দিয়ে দুটো অচেনা পাখি ডানায় রোদ ভেঙে উড়ে যায়। চুমু বললো, দেখো দেখো কি সুন্দর পাখি!
দিপু একবার আকাশের দিকে তাকায়। কথা বলে না।
চুমু অবাক হয়ে বলে, তোমার ভালো লাগে না?
পাখি দেখে ভালো লাগার কি আছে?
চুমু একটু দমে যায়। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তুমি যে কি!
শুনে দিপু হেসে ওঠে। এই সব পাখিটাখি, নদী কবিদের ভালো লাগে। আমি কি কবি!
একথায় চুমুর আর একটি দীর্ঘশ্বাস পড়ে। দিপু শোনে না। আনমনে আর একটি সিগারেট ধরায়। সঙ্গে সঙ্গে চুমু খুব রেগে যায়। সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে ব্যাগে রাখে। তারপর বলে, বেশি সিগারেট খেলে হাত পুড়িয়ে দেবো।
তারপর চুমু আবার আনমনা হয়ে যায়। চুমুর তখন কার কথা মনে পড়ে। চন্দনের। চন্দন নামটা সে দিয়েছিলো। চন্দনের গায়ে তীব্র একটা গন্ধ ছিলো। কি যে মিষ্টি। হাওয়ায় এখনো সেই গন্ধটা ভেসে আসে। মনে পড়ে, চুমুর সব মনে পড়ে।
চন্দন খুব সিগারেট খেতো। একবার নৌকোয় চড়ে বহুদূর বেড়াতে

গিয়েছিলো ওরা। মনে আছে কতো কি কথা হয়েছিলো সেদিন। চুমুই বলে যাচ্ছিলো। আর সেই ফাঁকে একের পর এক সিগারেট খাচ্ছিলো চন্দন। তাই দেখে চুমুর কি রাগ! বেশি সিগারেট খাওয়া চুমু একদম পছন্দ করে না। রেগে বলেছিলো, সিগারেট ফেলে দাও। আমার ভাল্লাগে না।

চন্দন সিগারেটের ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে বললো, আমার ভালো লাগে!

আমারচেও সিগারেট তোমার বেশি প্রিয়!

না, সমান। দুটোর রেজাল্টই জিরো।

শুনে রাগে চুমু মরে যায়। চন্দনের হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে ডান হাতে তিনটে ছ্যাঁকা মেরে দেয়। হাতের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকে চন্দন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তুমি তো থাকবে না! দাগই থাকবে!

উ পাপ্পা, আমার দেবদাস!

বাড়ি ফিরে রাতের বেলা চুমুর কি কষ্ট। কি কষ্ট। ঘুমের ভেতর কতোবার যে নিজের ডান হাতটা ছুঁয়ে দিয়েছে। কতোবার যে মনে হয়েছে ডান হাতে তীব্র জ্বালা। চুমু কি সিগারেটে নিজের হাত নিজে পুড়িয়েছে! এসবের মানে কি!

নৌকো ওপারে চলে আসে। চুমু খেয়াল করে না। অনেকক্ষণ ধরে জলে হাত ডুবিয়ে রেখেছে সে। চন্দন জল খুব পছন্দ করতো। জল দেখলেই উদাস হয়ে যেতো। জল কি চুমুরও খুব প্রিয়! অথবা চন্দন ভালোবাসতো বলে সেও!

দিপু বললো, জলে হাত ডুবিয়ে রেখেছো কেন?

চমকে হাত তোলে চুমু। তারপর মৃদু হেসে আঁচলে হাত মোছে। নদীর জলে হাত ভেজাতে আমার ভালো লাগে।

দিপু দেখে চুমুর চেহারায় এক ধরনের বিষন্নতা। চুমুর যে কখন কি হয়!

বাস ছাড়তে বেশ খানিকটা দেরি। চুমু বললো, চলো গাছতলায় বসি।

এখানে কয়েকটি গুমটি ঘরে চায়ের দোকান, পান বিড়ি সিগারেটের দোকান। তার মাঝ দিয়ে ইট বিছানো পথ বহুদূর চলে গেছে। খানিক দূরে একটা খোলা মাঠ, তাতে বিশাল এক শিমুল গাছ ছাতার মতো রোদ আটকে রেখেছে মাথায়।

সেবারও বাস ছাড়তে খানিকটা দেরি হয়েছিলো। চন্দন ছিলো সঙ্গে। বললো, চলো ঐ গাছতলায় বসে চা খাই। এসবই মনে থেকে যাবে।

চুমুর মনে আছে। গাছটির দিকে তাকাতেই মনের ভেতর তোলপাড় করে উঠেছে। চুমু কি ওসব স্মৃতি খুঁজতেই দিপুকে নিয়ে এসেছে!

দিপু বললো, ধেৎ, লোকে কি ভাববে!

দিপু খুব সচেতন। চন্দন ছিলো অন্য রকম। ওটুকুই কি চুমুর ভালো লাগতো!

চুমুর খুব মন খারাপ হয়ে যায়। বিষন্ন হয়ে গাছটির দিকে তাকিয়ে থাকে সে। আর কি আশ্চর্য হঠাৎ চুমু দেখে সে আর চন্দন পাশাপাশি বসে আছে গাছতলায়। কি কথায় চুমু খুব হাসছে।

দিপু বললো, চলো বাসে চড়ে বসি। এখানে দাঁড়িয়ে কি হবে !

চুমু কোনো কথা না বলে বাসে চড়ে। এ লাইনের বাসের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই। যাত্রী হলেই ছাড়ে। অনেক শিট খালি। কখন ভরবে কে জানে! মনে মনে দিপু খুব বিরক্ত হচ্ছিলো। কি দরকার ছিলো এখানে আসার। পরেও তো আসা যেতো। বোনের সঙ্গে দেখা কি পরে করা যেতো না! চুমুকে এসব বলা যাবে না। বললে মন খারাপ করবে।

চুমু তখন চুপচাপ জানালায় তাকিয়ে আছে। রাস্তার পাশে খোলা মাঠ, শস্যভূমি। বহু দূরে গ্রামসীমা। চুমু এসবের ভেতর কি দেখে! কার কথা ভাবে!

বাস চলতে শুরু করলে চুমু আবার উচ্ছল হয়ে ওঠে। রাস্তার পাশের গাছ জলাভূমি মানুষের ঘরবাড়ি দেখে কি যে মুগ্ধ! দূরে মাঠের উপর দিয়ে পথ। তাতে পোয়াতী মেয়েমানুষের মতো হেলে দুলে চলে গরুর গাড়ি। গাড়োয়ানের উদাস গলার গান ভেসে আসে। গরুর পায়ে উড়ে চিকন ধুলো। চুমু মুগ্ধ হয়ে বলে, কি সুন্দর, না!

এসবের ভেতর দিপু কোনো সুন্দর দৃশ্য দেখে না। চুমু কি দেখে! তবুও চুমুকে দুঃখ দিতে চায় না দিপু। নিজেও মুগ্ধ হতে চায়। খুব সুন্দর।

রাস্তার বাঁক পেরুতেই একটা ব্রিজ। বাস ব্রিজের উপরে উঠতেই চুমু বললো, এখন যদি বৃষ্টি নামতো! কি মজা হতো!

কি যে বলো। বৃষ্টি ফিষ্টি আমার ভালো লাগে না। বৃষ্টি মানেই ঝামেলা।

শুনে চুমু আবার বিষন্ন হয়ে যায়। সেবার বাস এ ব্রিজের উপর উঠতেই কি বৃষ্টি! কি বৃষ্টি! দেখে চন্দন মুগ্ধ। বাসের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জলে হাত ভিজিয়েছে। তারপর সেই ভেজা হাত চুমুর গালে বুলিয়ে দিয়েছে।

কথাটা মনে পড়তেই আনমনে চুমু একবার নিজের গালে হাত বুলোয়। দেখে দিপু বলে, কি হলো?

চুমু লজ্জা পায়। তারপর মৃদু হেসে বলে, কিছু না।

এই ভাবে পথ কখন শেষ হয় চুমু টের পায় না। রতনপুর নেমে দেখে দুপুর ফুরিয়ে যাচ্ছে। মনোরম মফস্বল শহরে বিকেলের ছোঁয়া। চুমুর আবার খুব ভালো লাগতে থাকে! কতোকাল পর এই শহরে এলো চুমু। তিন বছর। সেবার এসছিলো চন্দনকে নিয়ে। এবার দিপু। তিন বছরে জীবন কতো পাল্টে গেছে।

বাস থেকে নেমেই হিপ পকেট থেকে ব্রাস বের করে দিপু। তারপর কোকরা চুলে বুলিয়ে নেয়। চুমু আড়চোখে একবার দিপুকে দেখে। তারপর চোখ ঘুরিয়ে নেয়। পুরুষ মানুষের মাথা আঁচড়ানো চুমু একদম পছন্দ করে না। পুরুষদের অতো পরিপাটি হয়ে থাকার কি আছে। খানিকটা এলোমেলো না থাকলে পুরুষদের কি মানায়!

চন্দন কখনো মাথা আঁচড়াতো না। এক প্যান্ট এক শার্ট পরে কতোদিন যে কাটিয়ে দিতো! চন্দনের চেহারায় সব সময় এক ধরনের বিষণ্নতা থাকতো। চোখের কোলে জমে থাকতো কালি। হাত পায়ের নখ বন্য পশুর মতো। চন্দন কখনো নখ কাটতো না। তবুও চন্দনের কাছাকাছি গেলে অদ্ভুত একটা গন্ধ পেতো চুমু। কি যে পাগল করা গন্ধ। ওসবই ছিলো চন্দনের সৌন্দর্য।

চুমু যখন চন্দনের কথা ভাবছে তখুনি এক ঝলক হাওয়া আসে। হাওয়ায় কি চন্দনের গায়ের পাগল করা গন্ধ ছিলো! চুমু কেন কেঁপে ওঠে, চুমু কেন চমকে ওঠে!

দিপু বললো, এখন?

ও রিকশা নিতে হবে। এই তো কাছেই। দশ মিনিটের পথ। চুমু তারপর নিজেই একটা রিকশা ডাকে।

রিকশায় বসে কেউ কোনো কথা বলে না। দিপু সিগারেট টানছে। আর চুমু চারদিক তাকিয়ে তার ছেলেবেলার শহর, প্রিয় শহর দেখছিলো। মানুষের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকের পরিবেশও কেমন পাল্টে যায়! তিন বছর আগে রতনপুরের চেহারা ছিলো অন্যরকম। দেখে চুমুর কেন যে মন খারাপ হয়ে যায়! আপার বাসার সামনে নামতেই বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে চুমুর। দিপু খেয়াল করে না।

আপার বাসাটা শহরের শেষ প্রান্তে। প্রথমে বিশাল টিনের গেট। গেটের কাছে নেমে চুমু আলতো করে গেটটা একটু ঠেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে বিশাল গেট মৃদু শব্দ করে খুলে যায়। চুমু আবার একটু চমকে ওঠে!

গেটের ভেতর অদ্ভুত পরিবেশ। দুপাশে বিশাল গাছ পালার বাগান। তার মধ্যিখান দিয়ে সুরকি বিছানো পথ। তারপর একটা পুরনো কালের সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সিঁড়ির উপর টানা লম্বা বারান্দা অলা টিনের স্কুল ঘর।

বারান্দায় উঠে চুমু একবার চারদিকে তাকায়। কি নির্জন হয়ে আছে বাড়িটা। গাছপালার বনে বিকেল পড়ে অদ্ভুত পরিবেশ। গাছপালার ছায়া পড়েছে মাটিতে, ঘাসের উপর। হাওয়ায় গাছের পাতা কাঁপে, তলায় কাঁপে ছায়া। এসবের ভেতর কোথাও ডাকছিলো একটা পাখি। সেই ডাকে চুমু কি আবার কেঁপে ওঠে! চুমু কি আবার চমকে ওঠে!

স্কুল ঘর পেরিয়ে আবার একটা সিঁড়ি। নিচে নেমে গেছে। তারপর বিশাল একটা গাছ। গাছতলায় আর একটা গেট। দিনের বেলাও জায়গাটা কেমন অন্ধকার হয়ে আছে।

সিঁড়ি ভেঙে নামতে চুমুর বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন টলমল করে ওঠে। অন্ধকার জায়গাটার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তে দিপুর কথা ভুলে যায় চুমু। মনে হয় চন্দন আছে ওর সঙ্গে। দিনটি আজ নয়। তিন বছর আগের।

সেবার কি একটা পূজো হচ্ছিলো এই শহরে। রতনপুর হিন্দু বহুল শহর। পূজো পার্বনে কি যে উৎসব! কি যে উৎসব! রাতের বেলা হয় কীর্তন। শুনতে গিয়েছিলো চুমু। ফিরতে ফিরতে রাত দুপুর। এই গেটটার কাছে এসেই চন্দনের কি হলো, চন্দন দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। গেটের উপর ঝুলছিলো টিমটিমে একটা আলো! চারদিকে রাত দুপুরের নির্জনতা। প্রিয় মানুষের সঙ্গে নির্জনতায় মুখোমুখি, মানুষ কি ভাষা হারিয়ে ফেলে! চুমু কেন কথা বলতে পারেনি! চন্দনের সঙ্গে সঙ্গে সেও দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

চন্দন তখন কেমন করে যে তাকিয়ে আছে! সেই চোখের দিকে তাকিয়ে চুমুর যে কি হয়ে গেলো! চুমুও তাকিয়ে থাকে। সেই মুহূর্তেই চুমুর চোখে পড়েছিলো চন্দনের চোখের কোলে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। চন্দন কি রাতের বেলা ঘুমোয় না! কেন ঘুমোয় না। চন্দন তোমার কি কষ্ট! রাত জেগে তুমি কার কথা ভাবো!

চন্দন তখন হঠাৎ করে চুমুর দিকে দুহাত বাড়িয়ে দেয়। নিঃশব্দে। চুমুর যে কি হয়ে যায়! চুমু আলতো করে চন্দনের হাতের ভেতর চলে যায়! তারপর কি যে আবেগে দুজন দুজনকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকক্ষণ। অনেকক্ষণ।

শুধু এটুকুই। মনে আছে, চুমুর সব মনে আছে। সেই প্রথম পরশ। শরীরে এখনো লেগে আছে।

দিপু বললো, কি হলো?

চুমু কোনো কথা বলে না। নিঃশব্দে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অপলক তাকিয়ে থাকে দিপুর দিকে। দিপু নয়, ঐতো চন্দন দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু চন্দন কেন হাত বাড়ায় না! কেন নিঃশব্দে ডাকে না চুমুকে। এসো, এসো।

চুমু হঠাৎ করে দিপুকে জড়িয়ে ধরে। তারপর দিপুর বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে বলে, চন্দন, আমার চন্দন।

দিপু কিছু বুঝতে পারে না। দিপু বিরক্ত হয়। আ কি করছো? কেউ দেখে ফেললে কি ভাববে?

চুমু তারপর লজ্জা পেয়ে সরে যায়। গেটে নক করে।

খানিকপর আপার বাসায় তুলকালাম কান্ড। আপার ছেলেমেয়েদের চেঁচামেচিতে সারা বাড়ি মুখর হয়ে যায়। আপা ছিলো রান্না ঘরে। আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসে। দিপু তাকে হাত তুলে সালাম দেয়। দেখে চুমুর আবার মন খারাপ হয়ে যায়। চন্দন আপাকে পায়ে হাতদে সালাম করেছিলো। চন্দনের সব কিছুতে এক ধরনের নমনীয়তা ছিলো। দিপুর নেই।

বারান্দায় উঠে আপার পায়ে হাত দেয় চুমু। চুমুকে বুকে তুলে নেয় আপা। কেমন আছিস?

একথায় চুমুর কেন যে চোখ ছলছল করে ওঠে। মনে মনে বলে, আমি ভালো নেই। ভালো নেই।

চন্দন বলে ছিলো, রতনপুর নয় এই শহরের নাম হৃদয়পুর। আমি আমার হৃদয় গচ্ছিত রেখে গেলাম এখানে। এক জীবনে আবার যদি কখনো এই শহরে আসি, একদিন ভোর বেলার কুয়াশায়, নদীতীরে তোমার হাত ধরে হাঁটিবো।

চুমুর মনে আছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে শুতে শুতে রাত দুপুর। বিছানায় শুয়েই দিপু কেমন ঘুমিয়ে যায়। চুমুর ঘুম আসে না। কতো কি যে মনে পড়ে।

ভোররাতে চুমুর ঘুম ভেঙে যায়। ঠিক ঘুম নয়। তন্দ্রা মতো ছিলো। ভোররাতে চুমুটের পায় শিয়রের সামনে দাঁড়িয়ে চন্দন তাকে ডাকছে। চুমু নদীতীরে অদ্ভুত কুয়াশা নেমেছে। যাবে না?

চুমু হকচকিয়ে বিছানায় উঠে বসে। পাশে দিপু তখন গভীর ঘুমে। দিপুর খোলা লোমশ বুক শ্বাস প্রশ্বাসের তালে দুলছে।

চুমু ফিসফিস করে দিপুকে ডাকে, চন্দন আমার চন্দন।

একবার। দুবার।

দিপু চোখ মেলে তাকায়। বিরক্ত হয়। কি হলো? রাতের বেলা উঠে কি শুরু করলে?

চুমু বাঁশপাতার মতো কেঁপে ওঠে। তারপর দিপুর বুকে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কাঁদতে থাকে। চন্দন কেন চলে গেলো। চন্দন কোথায় চলে গেলো।

১৯৮০

বলো তারে

বকুলতলায় দাঁড়িয়ে চোখ মুছে টুনটুন। মধু তখন ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে নৌকো ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যাচ্ছে। নৌকোর চারোটে বসে আছে সুহাস। ধান ক্ষেতের জলে একটা কোড়া পাখি ডাকছে কুব কুব করে। টুনটুন অনেক দূর থেকেও ডাকটা শুনতে পায়। নৌকোটার দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে সে। চোখ ভরে আসছে জলে। টুনটুন আঁচলে চোখ মোছে।

সুহাস আজ চলে গেলো।

মধু তাকে খেজুর তলায় নামিয়ে দিতে গেছে। খেজুরতলার টেকেই বেশনালের ঘাট। দীঘিরপাড়ের বাজার থেকে লঞ্চ সোজা এসে খেজুরতলায় থামে। খেজুরতলা থেকে পুরান বাজার। তারপর আরো কতো ছোট ছোট ঘাট ধরে লঞ্চ। টুনটুন এসব জানে।

আর এখন বর্ষাকাল বলে রজতরেখায় কি জল, কি জল। দু তীরের ধানীমাঠ আর চর ছাপিয়ে শীর্ণ রজতরেখা এখন পদ্মার মতো উত্তাল। অবিরাম মহাজনী নৌকো যায়, লঞ্চ যায়। কখনো গভীর রাতে বজরা কিংবা পানসি নৌকা করে বরযাত্রী যায়। মাইকে পুরনো বাংলা গান বাজে। আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা থাকে।

সুহাস কাল রাতে বলেছিলো, টুনটুন তুমি কেঁদো না, আমি আবার আসবো। সামনে আমাদের দীর্ঘ জীবন। আমরা সবাইতো পাল্টে যাবো। তখন নিশ্চয় একবার আসবো। তুমি ভালো থেকো।

সুহাস কি সুন্দর করে কথা বলতে পারে। আর ওর গলায় কি যে এক মায়া। শহরের মানুষ এতো দরদী হয়!

টুনটুন কেঁদে ফেলেছিলো।

সুহাস তখন দু হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। ছি টুনটুন, কাঁদে না! সুহাসের স্বর কেমন ভেজা ভেজা। আমরা যে কেউ কারো কাছে থাকতে পারি না।

টুনটুনের কান্না আরো বেড়ে গিয়েছে। এই মানুষের বুকে মাথা রেখে কাঁদতে পারা, আহা কি যে সুখের!

টুনটুন অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। কাঁদে।

খেজুরতলায় বোধহয় এম এল দীঘিরপাড় এসে ভিড়লো। লঞ্চটার

ভট ভট শব্দ শুনতে পাচ্ছে টুনটুন। দুতিনবার ভোঁ বাজিয়েছে, এক্ষুণি আবার ছেড়ে যাবে।

আউশ ধানের ক্ষেতে কোড়া পাখি ডাকছে। কুব কুব। মধুকে দেখা গেলো নৌকো ঠেলে ঠেলে বাড়ির দিকে আসছে। ঠোঁটের বিড়ি এতো দূর থেকেও জ্বলছে দেখা যায়।

টুনটুনের বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। এম এল দীঘির পাড় ছেড়ে গেলো। রজতরেখায় এখন সেই লঞ্চের শব্দ ক্রমশ সরে যাচ্ছে। টুনটুন আবার চোখ মোছে। কান্নাটা আসছেই। সুহাস নিশ্চয় এখন ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। হয়তো বা টুনটুনের কথা ভাবছে। টুনটুন এখন কি করছে, নিশ্চয় কাঁদছে, কথাটা ভেবে সুহাসের মন খারাপ হয়ে যাবে। হয়তো গোপনে এক আধবার চোখ মুছবে সুহাস। টুনটুন এই বকুলতলায় দাঁড়িয়ে, সুহাস শুধু তার কথাই ভাবছে টের পেয়ে গেলো। আর তখন টুনটুনের কি কান্না! বুক ঠেলে সব দুঃখ উঠে আসে। টুনটুন দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কাঁদতে থাকে। মধু কখন এসে বকুলতলায় নৌকা বাঁধে টের পায় না।

সুহাস চলে যাওয়ায় মধুটাও কেমন দুঃখি মানুষ হয়ে গেছে। টুনটুনকে কাঁদতে দেখেও কথা বলতে পারে না মধু। কেবল টুনটুনের পিঠে হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে তাকে বাড়ির দিকে নিয়ে আসে। মোটে তো দশটি দিন, মানুষটা যেনো জাদুকর। সবাইকে কেমন মুগ্ধ করে দিয়ে চলে গেলো।

উঠোনে এসে মধু বললো, যাওনের কালে আপনে হের লগে দেহা করলেন না। কই গিয়া পলাইয়া রইলেন। হেয় কত খুঁজলো, আমি খুঁজলাম, আপনের মায় খুঁজলো। নাওয়ে বইয়া মানুষডার কি আফশোস। পারলে কাঁইন্দা দেয়।

টুনটুন কোনো কথা বলে না। চোখ মুছে মধুর দিকে একবার তাকায়। খুব সকালবেলা উঠে সুহাসের ব্যাগ ট্যাগ সব গুছিয়ে দিয়েছে টুনটুন। মধু চাঁই তুলে সব চিংড়ি মাছ বাড়ি নিয়ে এসেছিলো। মা সেই চিংড়ি ভেজে, ভুনা করে গরম ভাত খাইয়েছে সুহাসকে।

টুনটুন সুহাসের খাওয়ার সময় গত দশদিন সামনে বসে থেকেছে। কেবল আজই থাকেনি। সুহাস পরে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো, টুনটুন তুমি কোথায় ছিলে ?

টুনটুন কোনো জবাব দিতে পারেনি। সারাটা সকাল সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছে। চোখ মুখ ফোলা ফোলা! সুহাস টুনটুনের মুখের দিকে তাকিয়ে কি বুঝতে পেরেছিলো কে জানে। আর কোনো কথা বলেনি। কেবল আস্তে করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলো।

তারপর সুহাস চলে যাওয়ার সময় সে কবিরাজ বাড়ি গিয়ে বসেছিলো। সুহাস চলে যাবে, যাওয়ার আগে টুনটুনকে বলবে, টুনটুন তুমি

ভালো থেকো। আমি আবার আসবো। টুনটুন কোন্ প্রাণে এই কথা শুনবে!

রান্নাঘর থেকে মা বললো, টুনটুন আয় কিছু খেয়ে নে। তুই তো সকাল থেকে কিছু খেলি না।

টুনটুন বিষন্ন ভঙিতে পাটাতন ঘরের ঝুল বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে। আস্তে করে বলে, আমার ভাল্লাগছে না মা। পরে খাবো।

রান্নাঘরে বসে মা টুকটাক কথা বলে। কি যে মায়া লাগিয়ে গেলো সুহাস। ছেলেবেলায় সুহাস একবার এসেছিলো। ও খোদা, কি দুষ্টু ছিলো। রতনকে নিয়ে সারাদিন ঐ পুলের ওপর থেকে খালে লাফিয়ে পড়তো। তুই তখন একেবারে ছোট্ট। সুহাস আর রতনের কাপড় হাতে নিয়ে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে থাকতি। আর সুহাস যখন তখন তোকে ফুফু বলে চেঁচিয়ে ডাকতো।

টুনটুন কোনো কথা বলে না। চোখের সামনে কেবল সেই ছেলেবেলাকে দেখতে পায়।

এখন দুপুর। চারদিকে কি উজ্জ্বল রোদ ছড়ানো। নেবু ঝোপে আবছা ছায়া জমে আছে। সেই ছায়ার ভেতর থেকে এক বালক সন্ন্যাসী ফুফু বলে ডেকে ওঠে। টুনটুন চমকে দেখে একটা শালিক নেবু ঝোপ থেকে উড়ে গেলো।

এবার সুহাস তাকে একবারও ফুফু বলে ডাকেনি। নাম ধরে ডেকেছে! টুনটুন। আর তাতে টুনটুনের কি যে ভালো লেগেছে। হোক না মামাতো ভাইয়ের ছেলে, ভাইপো। সুহাস তো তার চেয়ে বয়সে কতো বড়ো। তা ছাড়া টুনটুনের যে বয়স তাতে অতো বড়ো ছেলের ফুফু বলে ডাকা, কি রকম শোনায় না!

এবার শহরে সুহাসদের বাসায় বেড়াতে গেলে সুহাস তাকে প্রথমেই বলেছিলো, টুনটুন ফুফু তুমি কতো বড়ো হয়ে গেছো।

টুনটুন খুব লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলো। অনেকক্ষণ আর সুহাসের দিকে তাকাতে পারেনি। তারপর এক সময় আলতো হেসে বলেছিলো, তুমিও তো কতো বড়ো হয়ে গেছো।

সুহাস হা হা করে হেসে উঠেছিলো। আর সেই ফাঁকে টুনটুন দেখে সুহাসের হাসি কি সুন্দর। টুনটুন অনেকক্ষণ সুহাসের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

সুহাস ওর দিকে তাকাতেই ধরা পড়ে যাবে ভাবটা কাটাতে শাড়ির আঁচল দাঁতে কামড়াতে কামড়াতে বলেছিলো, তুমি আমাকে ফুফু বলবে না। শুধু টুনটুন বলে ডাকবে।

সুহাস মৃদু হেসেছিলো।

মা বললো, এই ভর দুপুরে কোথায় যাচ্ছিস টুনটুন?

টুনটুন সে কথা না শোনার ভান করে হাঁটতে থাকে। মা জানে, টুনটুনের মন খারাপ থাকলে এরকম করে। সহজে কোনো কথার জবাব দেবে না। অতো বড়ো মেয়ে যেখানে সেখানে চলে যাবে।

মা আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। টুনটুন হাঁটতে হাঁটতে কবিরাজ বাড়ির দিকে নেমে যায়।

এখন পুরোপুরি দুপুর হয়ে গেছে। গাছপালা কি নিঃসাড়। একটুও হাওয়া দিচ্ছে না। ভরা বর্ষা বলে চারদিকের জল থেকে এক ধরনের চুটপুট শব্দ উঠে নিরন্তর ছড়িয়ে যাচ্ছে। হালদারদের আমবাগানে একটা ডাক ক্রমাগত ডাকছে। টুনটুনের বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে। সাথী হারিয়ে গেলে মেয়ে ডাকটা এ রকম দুঃখের ডাক ডাকে।

টুনটুন হালদারদের আমবাগানের দিকে হাঁটতে থাকে।

আর সব বর্ষায় এই দিনে কি বৃষ্টি! কি বৃষ্টি! এবার এক ফোঁটাও বৃষ্টি নেই। মানুষটা আশ্চর্য সুন্দর দিন রাত্রি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো। যেদিন তারা শহর থেকে ফিরলো সারাটা দিন খটখটে শুকনো। রাত্রে কি জ্যোৎস্না ফুটেছিলো। অথচ সুহাস কিছুতেই আসতে চায়নি। টুনটুন জোর করে নিয়ে এসেছিলো। তুমি এবার না গেলে আমার চেহারা আর কোনোদিন দেখতে পাবে না। তারপর সুহাস আসতে রাজি হলে টুনটুনের কি আনন্দ। লঞ্চের ডেকে দাঁড়িয়ে সারাক্ষণ গল্প করেছে দুজনে। আপার ক্লাশে অতো লোকজনের সামনে টুনটুনের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েছে সুহাস।

বাড়ি এসে সুহাসের কি আনন্দ। চারদিক ঘুরে ঘুরে দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলো। ভর সন্ধ্যায় মধুকে নিয়ে রজতরেখায় নৌকো বেয়ে এসেছে। উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই গল্প অনেক রাত পর্যন্ত টুনটুনকে বলেছে। জানো টুনটুন, ভেবেছিলাম নৌকো বাওয়া ভুলে গেছি। আজ দেখলাম, না দিব্যি চালাতে পারি। মধু তো হা করে রইলো। আমি একা বেয়ে দীঘিরপাড় পর্যন্ত চলে গিয়েছিলাম।

টুনটুনের তখন ঘনঘন হাই উঠছিলো। পুবের ঘরে সুহাসের বিছানা করে মশারী টাঙিয়ে দিয়ে বলেছিলো, রাতে কোনো দরকার হলে আমাকে ডেকো।

আর তাতে সুহাসের কি হাসি।

পরদিন সুহাসের ঘুম ভেঙেছে অনেক বেলা করে। টুনটুন অনেকক্ষণ সুহাসের ঘুম ভাঙতে না দেখে পরে এসে ডেকে তুলেছে। ইস কি যে ঘুম তোমার। দুপুর হয়ে গেলো, ওঠো।

সুহাস তারপরও অনেকক্ষণ বিছানায় পড়ে থাকে। তারপর উঠে টুনটুনের দিকে তাকিয়ে হাসে। রাতের বেলা একটুও ঘুমুতে পারিনি। চারদিকে কি রকম সব শব্দ। ইঁদুরের দৌড়াদৌড়ি। একটা ব্যাঙ

ক্যাঁ ক্যাঁ করেছে অনেকক্ষণ। পেয়ারা গাছে কি যেনো বারবার ডানা ঝাপটিয়েছে। ঘুম কি আর আসে!

টুনটুন বলে, সাপে বোধহয় ব্যাঙ ধরেছিলো। আর পেয়ারা গাছে রাতের বেলা ঝাঁক ঝাঁক বাদুড় আসে। তুমি ভয় পেয়েছিলে, না?

না ভয় পাইনি। তবুও কেমন অস্বস্তি লেগেছে! তোমাকে ডাকতে চেয়েছিলাম।

ডাকলে না কেন?

দাদী যদি কিছু ভেবে বসে এই ভয়ে।

যা কি ভাববে।

টুনটুন সুহাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। জানালা দিয়ে পাটাতনের উপর রোদ এসে পড়েছে। সেই আলোয় সুহাসকে রূপকথার রাজপুত্রের মতো দেখায়। টুনটুন তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকে।

হালদারদের আমবাগানে এখন দুপুরের কাটা ছেঁড়া রোদ পড়ে আছে। গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে বর্ষার জলজ মাঠ, সবুজ ধান ক্ষেত দেখা যায়। টুনটুন হেঁটে হেঁটে বাগানের শেষ প্রান্তে চলে আসে। জলের একেবারে কাছে এসে বসে পড়ে। হালদার বাড়ির ভেতর থেকে তখন কলের গানের শব্দ ভেসে আসে। সন্ধ্যা নামে ঐ নীল গগনে হায়। টুনটুন কান খাড়া করে গানটা শোনে। আবার সুহাসের কথা মনে হয় তার।

রাতের বেলা মা ঘুমিয়ে পড়লে অনেকক্ষণ কেটে যায়, টুনটুনের ঘুম আসে না। পুবের ঘরে সুহাসও বোধহয় জেগে আছে। টুনটুনের কেবল বাইরে যেতে ইচ্ছে করে। সুহাস ঘুমিয়ে পড়লো কিনা দেখতে ইচ্ছে করে। তখন উঠোনে কারো পায়ের শব্দ পাওয়া যায়। তারপর ক্ষীণ গলায় গান। আমিও পথের মতো হারিয়ে যাবো।

টুনটুন আর শুয়ে থাকতে পারে না। হ্যারিকেনের আবছা আলোয় দেখে মা বেঘোরে ঘুমুচ্ছে। টুনটুন চুপি চুপি দরোজা খুলে বেরিয়ে আসে।

বাইরে কি জ্যোৎস্না ফুটেছে! অবিকল বিকেলের নরোম রোদের মতো। সুহাস উঠোনে এসেছে, একটা পেয়ারার ডাল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। গুন গুন করে গান গাইছে। আসবো না ফিরে আর, আসবো না ফিরে কোনোদিন।

টুনটুন এসে সুহাসের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। সুহাস কোনো কথা বলে না। একটা হাত রাখে টুনটুনের কাঁধে। টুনটুন আর একটু সরে আসে। সুহাস গান গায়।

গান শেষ করে সুহাস দুহাতে টুনটুনকে জড়িয়ে ধরে। তুমি আজ আমার কাছে থাকবে। নইলে আমার একটুও ঘুম আসবে না।

মা জেগে গেলে?

কিচ্ছু হবে না।

ওরা অনেকক্ষণ এরকম জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর সুহাস হঠাৎ করে টুনটুনকে পাঁজা কোলে করে ঘরের ভেতর নিয়ে আসে। টুনটুন একটুও বাধা দেয়নি।

পরের দিন কি লজ্জা। কি লজ্জা। কেউ কারো দিকে তাকাতে পারে না। দুপুর বেলা খেতে বসে সুহাস বললো, আমি কাল চলে যাবো।

সুহাসের চেহারা কেমন ভারি ভারি। বুঝতে পেরে টুনটুন হেসে ফেলে। আমার কি দোষ। তুমিই তো সকাল থেকে আমার সাথে কথা বললে না। আমাকে দেখেই কেমন চোখ নামিয়ে নিয়েছো। পুরুষ মানুষের অতো লজ্জা থাকতে নেই।

সুহাস মৃদু হাসে।

রাতের বেলা সুহাস মাকে বললো, দাদী, আমি কাল সকালেই চলে যাবো।

টুনটুন চমকে ওঠে। সুহাসের দিকে তাকিয়ে দেখে সুহাসকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। মা বললো, আর দুএকটা দিন থেকে যাও।

না, পরে আসবো।

টুনটুনের তখনই কান্না পেয়ে গিয়েছিলো।

মা শুয়ে পড়লে টুনটুন সুহাসের ঘরে গিয়েছিলো। সুহাস তখন জানালা দিয়ে বাইরে ঢালাও জ্যোৎস্না দেখছে। টুনটুন গিয়ে সামনে দাঁড়ায়। সুহাস হাত বাড়িয়ে টুনটুনকে ধরে। টুনটুন কোনো কথা বলে না, সুহাসকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলে। সুহাস আস্তে আস্তে ওর পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। ভেজা ভেজা স্বরে বলে, কেঁদো না টুনটুন। আমরা যে কেউ কারো কাছে থাকতে পারি না। সামনে আমাদের দীর্ঘ জীবন। আমরা সবাই তো পাল্টে যাবো। তুমি ভালো থেকো। আমি আবার আসবো।

টুনটুন কোনো কথা বলতে পারে না। কেবল কাঁদে। কাঁদে।

চারটে কালো ছা নিয়ে একটা ডাক ধান ক্ষেতের দিকে সাঁতরে যায়। টুনটুন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। মাঠের জল এখন চকচকে কালো। জলের ভেতর চেলামাছ ছুটোছুটি করে। একটা আর একটার পেট কামড়ে ধরে। মাছেদের এখন ডিম ছাড়ার সময়। নরগুলো মাদীদের পেট কামড়ে সব ডিম ছড়িয়ে দিচ্ছে জলের ভেতর। টুনটুন অপলক মাছদের এই ডিম ছাড়া দেখে।

তখন সামনে, ধান ক্ষেতের ভেতর কোড়াপাখি ডাকে। কুব কুব। সেই ডাকে টুনটুনের বুকের মধ্যে এক পাগল করা দুঃখ উথাল পাথাল করে। টুনটুন আস্তে আস্তে জলের দিকে নেমে যায়। আর সেই শব্দে ধানক্ষেতের ভেতর কোড়াপাখিটা বুঝি থেমে যায়। টুনটুন নামতে থাকে। নামতে থাকে। হাঁটু জল, কোমর জল। কোড়াপাখিটা আর ডাকে না। টুনটুন

তখন হাত দিয়ে জলের ভেতর শব্দ তোলে। ধান ক্ষেত থেকে কোড়া-পাখিটা উড়াল দেয়। টুনটুন সেই উড়ো পাখিটার দিকে তাকিয়ে বলে, তারে বলো, আমি তার কথা ভাববো। ভাববো আর অপেক্ষা করবো।

টুনটুন তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে।

১৯৭৪

টুলটুলি

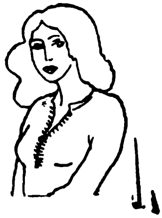

বাসায় আমাকে নিয়ে একটা প্রোবলেম হয়েছে।

কি রকম ?

তোমার সঙ্গে হলে হবে নয়তো অন্য পাত্র দেখে তিনমাসের মধ্যে আমার বিয়ে দিয়ে দেবে।

কেন, তোমাদের বাসার সবাই তো আমাদের ব্যাপারটা জানেই।

জানলে কি হবে, আমার তো আরো কতোগুলো বোন আছে। আমারটা না হলে নিমনিরও যে হচ্ছে না।

নিমনির কি বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে ?

তা নয়। নিমনির বর ঠিক হয়ে আছে ছেলেবেলা থেকে। আমার বড়ো খালার ছেলে। খালার তো ঐ একটাই ছেলে, তার ওপর খালার আবার হাই বলড প্রেশার। যে কোনো সময় হার্ট ফেল করতে পারে। তার ইচ্ছে ছেলেকে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে করাবে।

করাক।

প্রোবলেমটাই তো ওখানে। খালা কাল আমাদের বাসায় এসেছিলো। মাকে বললো, যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব নিমনির সঙ্গে মিন্টুর বিয়েটা হয়ে যাক। নয়তো অন্য পাত্রী দেখবো। মা রাতের বেলা আমাকে বললো তোমার কথা। তুমি কি বলো ?

কি বলবো ?

বারে একটা কিছু না বললে আমি মাকে গিয়ে কি বলবো।

আপাতত আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।

কবে সম্ভব ?

টাইম লাগবে।

তাহলে তো আমি আর বাসায় থাকতে পারি না।

মানে?

অন্য জায়গায় আমার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে। তোমার সঙ্গে ছাড়া অন্য কোথাও আমার বিয়ে হতে পারে না।

একথা বাসায় বলোনি?

বলেছি। কিন্তু আমার তো আরো কতোগুলো বোন আছে। এটা তুমি বোঝ না!

এতো গরজ থাকলে নিমনির বিয়েটা দিয়ে দিক না।

তা হয় কেমন করে?

কেন হবে না?

একটা সামাজিক ব্যাপার আছে তো।

আজকাল এরকম প্রচুর হচ্ছে।

হলেও আমাদের ফ্যামিলিতে হবে না। জানোই তো, বাবা খুব ব্যাকডেটেড।

বাবাকে বোঝাও।

মা বলেছিলো, বাবা রাজি হয় না।

তাহলে?

চলো আমরা বিয়েটা সেরে রাখি। বিয়ে হলে আমি মা বাবাকে বলে আরো বছর খানেক ইজিলি কাটিয়ে দিতে পারবো।

এরপর আমি আর কথা বলি না। টুলটুলির কাছে ব্যাপারটা যতো সহজ, আমার কাছে ততোটা নয়। টুলটুলির সঙ্গে আমার প্রেম বছর খানেকের। এই এক বছরে আমাদের ব্যাপারটা টুলটুলিদের বাসার সবাই জেনে গেছে। টুলটুলিই ইচ্ছে করে জানিয়েছে। পরে যাতে কোনো রকমের প্রোবলেম এরাইজ না করে। কিন্তু আমি কাউকে জানাতে পারিনি। আমার বাবা ভীষণ বদমেজাজি। রিটায়ার্ড মিলিটারি ম্যান। কর্নেল ছিলেন। তার কথার ওপর কথা বলার সাহস আমাদের কারো নেই। আমি এমনিতেই একটু ভীতু প্রকৃতির। বাড়ির ছোট ছেলে, হলে কি হবে, বাবাকে আমি যমের মতো ভয় পাই। মা নেই তো। মা থাকলে ব্যাপারটা ম্যানেজ করা যেতো। আর একটা ব্যাপার আছে, আমার ইমিডিয়েট বড়ো ভাইটির এখনো বিয়ে হয়নি। বছর খানেক হলো ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে বেরিয়েছে। একটা চাকরিও জুটিয়েছে মাস ছয়েক। বাবা বোধহয় ওর বিয়ের কথা ভাবছেন। এসময় আমার এইসব ব্যাপার শুনলে নির্ঘাৎ গেটআউট করে দেবে। বাড়ি থেকে বের করে দিলে আমার কি হবে! বাপরে, অতোদূর আমি ভাবতেই পারি না।

টুলটুলি বললো, তোমার পরীক্ষা কবে?

ডিসেম্বরে।

তারপরও তো পাককা এক বছর।

তাই তো।

টুলটুলি একপলক আমার মুখের দিকে তাকায়। তারপর পায়ের কাছ থেকে দুর্বাঘাস ছিঁড়ে দাঁতে কাটে। দুপুর বেলায় চারদিকে আগষ্ট মাসের রোদ ঝিম ঝিম করছে। আমরা বসে আছি পার্কের মাঝামাঝি একটা জায়গায়। মাথার ওপর বিরাট কৃষ্ণচূড়া গাছ। থেকে থেকে একটা হাওয়া দিচ্ছে, তাতে মৃদু ফুলের গন্ধ। দূরে কোথায় একটা পাখি শিস দেয়। একটা প্রজাপতি অনেকক্ষণ ধরে আমাদের চারপাশে ওড়াউড়ি করে। এটা তার ডিউটি। ঠিকঠিক পালন করে এইমাত্র রেস্ট নিতে চলে গেলো।

আমি টুলটুলির একটা হাত ধরে বলি, তুমি তোমার মাকে বলে নিমনির বিয়েটা দিয়ে দাও। বড়ো বোন রেখে ছোট বোনের বিয়ে আজকাল ঘরে ঘরে হচ্ছে।

বাবা রাজি হবে না। তাঁর প্রেস্টিজ। লোকে বলবে বড়ো মেয়ের কোনো খুঁত আছে, নইলে তাকে রেখে ছোটটির বিয়ে হয় কেন।

বললেই বা। পাবলিকের কথায় কি যায় আসে?

এবার টুলটুলি রীতিমতো রেগে যায়। তোমারই বা অতো অসুবিধা কি। শুধু বিয়েটা সেরে রাখো না। বাসায় কাগজপত্র দেখিয়ে আমি সব ঠাণ্ডা করবো। কতো জনেই তো এরকম করে।

বাবা শুনলে আমায় খুন করে ফেলবেন।

শুনবে কি করে?

এসব কথা চাপা থাকে না।

চাপা তো থাকেই না। তাই বলে কি আমরা কিছু করবো না?

করবো, একটু যা টাইম লাগবে।

টাইম তো তোমায় দেয়াই হচ্ছে। বিয়ে হলেই তো আমি তোমার ঘরে গিয়ে উঠছি না!

আমি কি করবো বুঝতে পারি না। এই রকম স্বভাব আমার। যে কোনো ব্যাপারেই ডিসিশান নিতে দেরি হয়ে যায়। তার ওপর বিয়ে করা। অসম্ভব। এমনিতেই বাবা ভীষণ রাগী। তারপর আমাকে দেখতে পারেন না অন্য কারণে। আমার ভাই বোনদের মধ্যে দুজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন ডাক্তার। কেবল আমিই বাবার কথায়, যার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, বাংলায় অনার্স পড়ি। পাশ টাশ করলে চারশো টাকার মাস্টারি। বাবা মাঝেমধ্যে জোক করে বলেন, তুমি বিয়েটিয়ে করো না কিন্তু, বউকে খাওয়াতে পারবে না। রিমেমবার ইট। ইটস এ গুড সাজেসান ফর ইউ। হা হা হা। বাবা বিকট স্বরে হাসেন। কি বলবো, আমি তখন লজ্জায় মরে যাই।

কিন্তু আমি এখন কি করবো? টুলটুলিকে কি বলবো? মানা করে দেবো। তাতে টুলটুলি খুব রেগে যাবে। ও যা সেন্টিমেন্টাল। রাগ করে

হয়তো আমার সঙ্গে দেখাই করবে না। আমি ওদের বাসায় গেলেও কথা বলবে না। আর তাতে আমার যে কি ভীষণ কষ্ট হবে! ধেৎ শালা, আমাদের জেনারেশানে যদি বিয়ে ফিয়ে না থাকতো। এরকম একটা নিয়ম তৈরি হয় না কেন, যাকে ভালো লাগে তার সঙ্গে যতোদিন ইচ্ছে প্রেম করো, যখন ভালো না লাগবে ছেড়ে দেবে। অন্য কারো সঙ্গে আবার, এই রকম। অবশ্য টুলটুলিকে ছেড়ে দেয়ার কথা আমি কখনো ভাবি না। কিন্তু বিয়ে ব্যাপারটা ভাবলে আমার বুক শুকিয়ে যায়। আমি বলি, টুলটুলি, তুমি অন্যভাবে ম্যানেজ করো। এখন আমি বিয়ে করতে পারবো না।

তিন মাসের মধ্যে যদি অন্য কোথাও আমার বিয়ে হয়ে যায়?

কথাটা শুনে আমার বুকের ভেতরটা কাঁপে। তবুও নিজেকে কায়দা করে শক্ত রাখি। বলি, তুমি রাজি না থাকলে হবে কেমন করে?

যদি আমি ওদের চাপে রাজি হয়ে যাই?

তাহলে আর কি করবো।

তবুও তুমি বিয়ে করবে না?

আপাতত না।

তুমি একটা কাওয়ার্ড।

মেয়েরা পুরুষকে কাওয়ার্ড বলে এটা আমি গল্প উপন্যাসে পড়েছি। এই প্রথম জ্যান্ত কোনো মেয়ের কাছ থেকে শুনে খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই। টুলটুলি তখন উঠে গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে। আমি পেছন থেকে দু তিনবার ডাকি। টুলটুলি গ্রাহ্য করে না। গেটের কাছে গিয়ে রিকশায় চড়ে। আমি স্পষ্ট দেখি রিকশায় বসে টুলটুলি চোখ মুচছে। আমার বুকের ভেতরটা মোচড়ায়। টুলটুলি কাঁদছে, অথচ আমার কিছু করার নেই। বুঝতে পারি, আসলে মানুষ বড়ো অসহায়।

খোকন, তোমার টেলিফোন।

টেলিফোন! আমি অবাক হই। এতো সকালে আমায় কে টেলিফোন করবে! আমার বন্ধুরা সবাই জানে বাবা খুব রাগী। যখন তখন টেলিফোনে ডাকাডাকি পছন্দ করেন না। তাছাড়া এখন সকাল আটটা। আমার টেলিফোনঅলা বন্ধুরা সব নটা পর্যন্ত ঘুমায়।

কে টেলিফোন করলো!

আমি পড়ার টেবিলে ছিলাম। দ্রুত উঠে যাই। টেলিফোন ধরি, হ্যালো। বাবা অন্য ঘরে চলে গেলেন।

আমার এখন ভীষণ নার্ভাস লাগছে। বাবা চলে যেতেই ছোট করে কেশে নিয়ে বললাম, হ্যালো কে?

খোকনকে চাইছি। ওপাশে ভারি পুরুষ গলা।

বলছি। আপনি কে?

খোকন, আমি টুলটুলির ছোট মামা।

ও, কি ব্যাপার?

এক্ষুণি একবার মেডিকেলে আসো। টুলটুলির ভীষণ খারাপ অবস্থা।

হঠাৎ করে আমার হাত পা কাঁপতে শুরু করে। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে যায়। ঢোক গিলে বলি, কি হয়েছে?

স্লিপিং পিল খেয়েছিলো। তুমি এক্ষুণি চলে আসো।

ওপাশে টেলিফোন নামিয়ে রাখার শব্দ।

আমার তখন কিযে নার্ভাস লাগছে। এখনো সকালের নাস্তা খাইনি। দৌড়ে আমার ঘরে গিয়ে শার্ট প্যান্ট পরি। বাবা যে এতো সকালে বেরুনো পছন্দ করেন না, ভুলে যাই।

বেরিয়ে আসার মুখে বাবার সঙ্গে দেখা। বললেন, কোথায় যাচ্ছো?

একটু মেডিকেলে যেতে হবে বাবা। এক বন্ধু ভীষণ এ্যাকসিডেন্ট করেছে।

অবলীলায় মিথ্যে কথা বলে ফেলি। বাবার সঙ্গে মিথ্যে বলার সাহস আমার নেই। ব্যাপারটা যে কেমন করে ঘটে গেলো বুঝতে পারি না। বাবা কি বুঝলেন কে জানে। এক পলক আমার দিকে তাকালেন। কথা বললেন না।

ইমারজেন্সি ওয়ার্ডের সামনে টুলটুলির ছোট ভাই দাঁড়িয়ে ছিলো। মুখটা ফ্যাকাশে, কর্কশতায়। সারারাত ঘুমোয়নি বোঝা যায়। আমাকে রিকশা থেকে নামতে দেখে বললো, আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। চলুন।

আমি রিকশাঅলাকে আস্ত পাঁচ টাকার নোট দিয়েই চলে আসি। দু মিনিটের মধ্যে টুলটুলির কেবিনে।

কেবিনে ভিড় করে আছে টুলটুলির মা বাবা আরো দুচারজন লোক। টুলটুলির মামা চাচা হবে। আমাকে দেখে ভিড় পাতলা হয়ে যায়। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ি টুলটুলির বিছানার ওপর। শাদা ধবধবে বিছানায় শুয়ে আছে টুলটুলি। মাথার কাছে ঝুলছে স্যালাইন। টুলটুলির জ্ঞান নেই। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিলো টুলটুলি বুঝি মারা গেছে। আমার কান্না পাচ্ছিলো।

টুলটুলির মা বললেন, কি কাণ্ড বলো তো!

ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেললেন। একজন ডাক্তার তখুনি এলো কেবিনে। টুলটুলির মার দিকে তাকিয়ে বললো, ভয়ের কিছু নেই। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সেন্স আসবে। শুনে আমি বড়ো করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। টুলটুলি এমন করলো কেন? আমার ওপর রাগ করে? আমি তো ওকে তেমন কিছু বলিনি। তাহলে?

টুলটুলির ছোটভাইকে ডেকে আমি পুরো ঘটনা জেনে নিই। টুলটুলির বাবা রেগুলার ভেলিয়াম খান। তাঁর টেবিলের ওপরেই থাকে সব সময়। কাল রাতে বাবার টেবিল থেকে কায়দা করে সরিয়ে ছিলো টুলটুলি। খেয়ে শুয়ে পড়েছিলো। তখুনি খোঁজ পড়লো।

এইটুকু শুনে আমার আর শুনতে ইচ্ছে করে না। কেবিনের সামনে টুলটুলির মা বাবা দাঁড়িয়ে। আমি তাঁদের মুখোমুখি, তবুও ভুল হয়ে যায়। সিগারেট ধরাই।

টুলটুলির সেন্স আসে বারোটার দিকে। আমি তখন টুলটুলির মুখের কাছে চেয়ারে বসা। ওর বাবা চলে গেছেন। মা বসে আছেন টুলটুলির পায়ের কাছে। ছোট ভাইটা গেছে কোথায় কোথায় খবর দিতে।

চোখ খুলেই টুলটুলি আমার দিকে তাকালো। তাকিয়েই থাকলো। ওর মা এসে ঝুঁকে পড়লেন টুলটুলির মুখের ওপর, কেন তুই অমন করলি পাগলী?

টুলটুলি কোনো কথা বলে না। চেয়ে থাকে। টুলটুলির মা ব্যাপারটা বুঝে বেরিয়ে গেলেন কেবিন থেকে। তখন আমি টুলটুলির একটা হাত ধরি। টুলটুলি তুমি অমন করলে কেন?

টুলটুলি কথা বলে না। ওর চোখে জল। দেখে আমার বড়ো মায়া হয়। হাত বুলিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিই। ঠিক সেই মুহূর্তে টুলটুলি বলে, তুমি আমার কথা রাখবে না?

জীবনে এই প্রথম আমি খুব দ্রুত একটা ডিসিশান নিয়ে ফেলি। টুলটুলির মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলি, রাখবো। তুমি ভালো হয়ে নাও।

১৯৭৬

প্রেমিক প্রেমিকা

বউ নির্বিকার ভাবে বাঁ চোখ টিপলো।

পর পর দুবার। গাড়িতে ওর পাশে ওর মা বসা। তার পরে চশমা চোখে বাবা। কেউ খেয়াল করলো না।

নারিন্দা রোডে ট্রাফিক জ্যাম। সব ফ্রিজ হয়ে আছে। আমার রিকশা বউদের নীল ডাটসানের পাশে। বউ ছাড়া কেউ আমায় দেখছে না। আমিও চোখ টিপি। পর পর দুবার। নির্বিকার ভাবে। কি আশ্চর্য

তখুনি ট্রাফিক জ্যাম ভাঙে। মুহূর্তে সাঁ করে বেরিয়ে যায় বউদের গাড়ি। বউ আমার দিকে তাকাবার চান্স পায় না।

ওরা কোথায় যাচ্ছে?

এখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা। ওরা কি সিনেমায় যাচ্ছে, না মার্কেটিংয়ে! না কোথাও কোনো আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে! কে জানে। বউয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয় না দশদিন। আমি খুব বিজি। ছলাখ টাকার কাজ হাতে। মোট চারটে সাইট চলছে। সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কাজ কমপ্লিট। ফুলটাইমার এসিস্টান্ট আছে। ওরাই দেখাশোনা করে। বড়ো ভাই যান অফিসের পরে। তবুও আমি খুব বিজি। মাল ম্যাটা- রিয়ালস অফিস সাপ্লাই। এটাই মেইন প্রোবলেম। আমার সিগনেচার ছাড়া ট্রাক চলবে না।

দশদিনে আমার একটুও অফ টাইম ছিলো না। টেলিফোনে বউর খবর নেবো, পারিনি। তাছাড়া যখন তখন বউর কাছে টেলিফোনও করা যায় না। ফিক্সট টাইম আছে। কাঁটায় কাঁটায় বারোটা। এটাই আমার খুব কাজের সময়।

দশদিনে পৃথিবীর কতো কি যে বদলে গেলো কে জানে! তেইশ বছর বয়সটাই খুব খারাপ। মিনিটে মিনিটে পৃথিবী পাল্টে যাওয়ার খবর আসে।

বউ আমাকে চোখ টিপলো। পর পর দুবার। এটা একটা সাইন। কাল সকাল দশটায় আমি আসছি।

আমিও চোখ টিপি। পর পর দুবার। এসো, আমি অপেক্ষায় থাকবো।

বউর আসার অপেক্ষায় থাকলে আগের দিন আমি একটু প্রিপারেশান নিয়ে রাখি। যেমন সন্ধের সময় সেভ করি। বউ আসে সকাল দশটায়। ইচ্ছে করলে সাতটার সময় সেভ করা যায়। কিন্তু বউর আমার অনেক ফ্যাকরা। কাছে এলেই ওকে আমি চুমু খাই। সাতটায় সেভ করলে দশটা পর্যন্ত গালটাল মেয়েমানুষের ত্বকের মতো থাকবে, এটায় ওর আপত্তি। কামানো গালে মুখে বউ আমার ঠোঁট ছুঁইয়ে বলবে, তোমাকে মেয়েমানুষের মতো লাগে।

আগের সন্ধ্যায় সেভ করলে বউর মনের মতো থাকা যায়। গালে খরখরা দাড়ি, একিউরেট পুরুষমানুষ। দেখে বউ যে কি খুশি হয়!

কিন্তু আমি কখনো সেলুনে সেভ করতে পারবো না। এতে বউর জোর আপত্তি। আমি আগে সেলুনে সেভ করতাম। শুনে বউ কি রাগ! তোমার গাল অন্যলোকে ছোঁবে কেন! তারপর থেকে আমি নিজ হাতে সেভ করি

সন্ধ্যার সময় সেভ করে গোসলও করতে হয় আমাকে। সাবান দিয়ে ঘষে মেজে। বাথরুমে কমপ্লিট ন্যাংটো হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে

হয় শরীর। হাত পায়ের নখ, বগলের লোম। কোথাও একরত্তি ময়লা থাকলে বউ রাগ করবে। নোংরা আমি পছন্দ করি না জেনেও তুমি নোংরা থাকো!

কখনো খুব রেগে গেলে কেঁদেও ফেলে। আমার ঐ একটা ভয়, মেয়েমানুষের কান্না কিছুতেই দেখতে পারি না। নিজেও কেঁদে ফেলি। এজন্যে বউ আমাকে বলে, তুমি লেডি কিলার নও, লেডি হিলার।

বউর আসার আগের দিন সন্ধ্যায় গোসল করার আমার অন্য একটা গোপন কারণও থাকে। খুব ছেলেমানুষি কারণ। পরদিন সকাল বেলা অকারণে বিছানায় শুয়ে থাকি। ঘুম ভাঙে অনেক আগে। বউর আসার কথা থাকলে আগের রাত্রে যতো টায়ার্ডই থাকি না কেন আমার সাউন্ড স্লিপ হয় না। এজন্যে মাঝে মধ্যে টেন মিলিগ্রাম সিডাক্সিন খাই। কদিন ড্রিংকও করেছি। নেশার ঘুম। পরদিন মুখ চোখ ফুলে যায়। নিজেকে ভারি সুন্দর লাগে। নিজের জন্যে নয়, এসবই করি বউর জন্য। বউ আমাকে সুন্দর দেখলে খুশি হয়।

আমি দেখতে মোটামুটি। চলনসই যাকে বলে। হাইট পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি। বুকের মাপ চৌত্রিশ। আটাশ ইঞ্চি ঘেরের বেলবটম পরি। মাথায় লম্বা চুল রাখতে ভাল্লাগে। হাতে সার্বক্ষণিক রিকো অটোমেটিক। টেলিভিশান মডেল। পায়ে আড়াই ইঞ্চি হিলের জুতো। খুব কম দেখা যায় এমন শার্ট থাকে গায়ে। রং শ্যামলা। ঠোঁটের ওপর ক্লাসিকাল গোঁফ আছে আমার। সবকিছু মিলিয়ে আমি মোটামুটি চলে যাই। লেখাপড়া যা শিখেছি চলে। টেনেটুনে বি এস সি পাশ করলেও ইংরেজি বলতে পারি মন্দ না। '৭৪ এ বিজনেসে নামি। প্রথম প্রথম টুকটাক টুকটাক। ইদানীং রাইজিং কন্ট্রাক্টর! বেশ কাজ টাজ করছি।

তো আমি এই লাইফটা কখনো চাইনি। ছেলেবেলায় খুব ভালো ছাত্র ছিলাম। বাংলা গল্প উপন্যাসের হিরোদের মতো বরাবর ক্লাশে ফার্স্ট হতাম। ম্যাট্রিকে তিনটে লেটারসহ স্টার মার্ক পাই। ইন্টারমিডিয়েটও ফার্স্ট ডিভিশন। ব্রেকটা তারপরই। '৭১ এ বাবা মারা গেলেন। না খান সেনাদের হাতে নয়। নেচারেল ডেথ। বরাবর গ্যাস্ট্রিকের রোগী ছিলেন। তার ওপর হাই ব্লাড প্রেশার। চাকরি করতেন ছোট খাটো। পয়সা কামাতেন দেদারই। রাখতেন না। বড়ো হাতখোলা মানুষ ছিলেন। তার ওপর ব্যাকডেটেড। ফ্যামিলি প্লানিং তখনো চালু হয়নি। ফলে আমরা এগারো বছরে পর পর এগারোটি ভাইবোন জন্মাই। এবং শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে, খোদার ফজলে বেঁচে থাকি। বাবা বড়ো আদর করতেন আমাদের। লাই পেয়ে ভাইবোনগুলো ছোটবেলা থেকেই রাজা বাদশার স্টাইলে বড়ো হয়। তার ঠেলা সামলাতে বাবা উজার হয়ে যায়। মরে যাওয়ার সময় তাই আমার বাবা এগারোটি সন্তান-

সন্ততি ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেন নি। বড়ো ভাই এম এ পাশ করে সবে একটা চাকুরিতে ঢুকেছে তখন।

এইভাবে একটা ভাঙচোরের ভেতর দিয়ে পুনরায় জন্ম হয় আমার। জগন্নাথ কলেজে নাইটে বি এস সি পড়তে পড়তে বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের তেরো হাজার টাকা আসে আমার হাতে। বাবার কিছু দেনা ছিলো। হাজার চারেক। শোধ দিই। মাকে বড়ো ভাইকে পটিয়ে বাকি টাকাটা নিয়ে পাটনারশীপ বিজনেস শুরু করি। কন্ট্রাকটরী। এটা '৭৩ এর গোড়ার দিকের কথা। সেই সময় আমি খুব নিরীহ আর গোবেচারা গোছের ছিলাম। চোখে মুখে স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখাটা আমার হবি। ছেলে বেলায় স্বপ্ন দেখতাম বড়ো হয়ে ডাক্তার হবো। গলায় ছাগলের দড়ির মতো ঝুলবে স্টেথিসকোপ। অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকবো।

আবার কখনো ভাবতাম খুব বড়ো লেখক হবো। পাঠ্য বইয়ে রবীন্দ্রনাথ। নজরুলের পরে থাকবে আমার গদ্য পদ্য। পরীক্ষার খাতায় আমার লেখা থেকে প্রশ্ন করা হবে। ছাত্ররা রাতভর পড়বে আমার লেখা।

কিছুই হওয়া হয়নি আমার। তবুও এখনো আমি স্বপ্ন দেখি। একদিন মস্ত একটা কিছু হয়ে যাবো। কি তা ঠিক জানি না। তো খুব নিরালায় থাকলে সুনীলের একটা কবিতার লাইন মাঝে মধ্যে মাথার ভেতর টুং করে ওঠে। 'এ জীবন অন্যরকম হবার কথা ছিলো।'

কিন্তু আমি বলছিলাম বউর কথা। বউর আসার কথা থাকলে আগের দিন এইভাবে নিজেকে সাজাই আমি। আর একটা ছেলেমানুষি কারণের কথা বললাম, তা হচ্ছে এই রকম। সন্ধের সময় গোসল করলে রাতের বেলা ভালো ঘুম হয়। পরদিন সকালে গা একটু গরম গরম লাগে। এই ছোট ব্যাপারটাকে আমি প্রেজেন্ট করি অন্য ভাবে। মাকে বলি, মা আমার জ্বর এসেছে।

মা উদ্বিগ্ন হয়ে কপালে হাত ছোঁয়ায়। বালাই ষাট। জ্বর হবে কেন। তুই আজ বেরুবি না। শুয়ে থাক।

বড়ো ভাই অফিসে যাওয়ার সময় দেখে যায়। ভাবি এসে স্পেশাল চা নাস্তার এরেঞ্জ করে। আমি তো এই চাই। একটা কোনো কাজ দেখিয়ে মটকা মেরে বিছানায় পড়ে থাকবো। বউ এসে দেখবে আমি তার প্রতীক্ষায় আছি।

বউ আমাদের এক বড়লোক আত্মীয়ের মেয়ে। আমাদের বাসায় হেভি দাম ওদের। বউ ছাড়া ওদের বাড়ির কেউ কখনো আমাদের বাসায় আসে না। এজন্যে আমার মার যে কতো দুঃখ। বউ আসে বলে মা ওকে ভীষণ যত্ন আত্তি করে। এবং মার বুঝি গোপন একটা লোভও আছে। বউর সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয়। একদিন আমি হেসেছি। মাকে বুঝতে দিইনি কিছু।

কাল ওরা আসছে।
কারা?
নারায়ণগঞ্জের পার্টি।
তোমায় দেখতে?
হুঁ।
কি হবে এখন?
কি আর হবে। দেখতে আসবে দেখে যাবে।
বললেই হলো!
নয়তো কি?
বারে আমার বউ কেন অন্যলোকে দেখে যাবে!
না দেখালেই পারো।
কি করবো?
কি করবে তার আমি কি জানি!
একথায় আমি অফ হয়ে যাই। বউর খুব মন খারাপ। কাল ওকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে। বউ তার মা বাবার একমাত্র মেয়ে। বিয়ের বয়স ঠিক হয়নি। তবুও বড়োলোক মা বাবার ব্যাপার। মেয়ের বিয়ের জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন তাঁরা। এদিকে আমার যে হাতে হ্যারিকেন তা কাকে বোঝাই।
বউ বললো, অন্য কোথাও আমার বিয়ে হবে না।
আমি কি চাই অন্য কোথাও তোমার বিয়ে হোক।
বলেছি নাকি?
টের পাই বউ আস্তে ধীরে রেগে যাচ্ছে। কাল ওকে অন্য লোক দেখতে আসবে, এটা ঠিক ওর পছন্দ নয়। আমারই কি পছন্দ! কিন্তু কি করা! আমাদের কথা যে আমরা কাউকে বলতে পারবো না। ওর মা বাবা কখনোই মেনে নেবে না।
আমি শুয়েছিলাম। বউ আমার কোলের কাছে বসা। ও পরেছে আজ ফুলভয়েল প্রিন্টেড শাড়ি। ম্যাচ করা ব্লাউজ। চেহারায় কোনো মেকাপ নেই। ঠোঁটে লিপস্টিকও না। ওকে তবুও সুন্দর দেখায়। রাতেরবেলা ঘুমোয়নি বোঝা যায়। চোখের কোণে কালি, চেহারায় রুক্ষতা। তবুও বউ যে আমার কি সুন্দর!
আমি হাত বাড়িয়ে বউর একটা হাত ধরি। বউ আমার দিকে একটু ঝুঁকে আসে। তারপর উবু হয়ে আমার বুকে মুখ গুঁজে দেয়। দুহাতে জড়িয়ে ধরে আমার কাঁধ। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না।
আমিও না। বলে আমি বউর ঠোঁটে গালে অনবরত চুমু খেতে থাকি। বউ আস্তে ধীরে গলে যায়।
কাল রাত থেকে বউ নিশ্চয় কিছু খায়নি। আমি জানি। মন খারাপ

থাকলে ও কিছু খায় না। সারাক্ষণ শুয়ে থাকবে আর আমার কথা ভাববে আর কাঁদবে।

আমাদের এই ব্যাপার শুরু হয়েছিলো খুব ছেলেবেলায়। আমি তখন পাঠশালায় পড়ি। গ্রামে। একবার শীতকালে বউরা আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসে। সেই প্রথম বউকে দেখি আমি। অবিকল খেলনা পুতুলের মতো দেখতে। আমাদের পাটাতন ঘরে ওর মা খেলনা দিয়ে বসিয়ে রেখেছিলো। আমি পাঠশালা থেকে ফিরে দেখি আমাদের ঘরের ভেতর একটা জাপানি পুতুল। আমি পড়ার বইয়ের ছবিতে যেরূপ দেখেছি। জ্যান্ত পুতুল ঘরের ভেতর বসে থাকতে দেখে তারপর আমার কি যে আনন্দ! ঘুরে ঘুরে কেবল বউকে দেখি। গোসলের কথা ভুলে যাই, খিদের কথা ভুলে যাই।

বড়ো হয়ে বউকে আমি এই কথাটা বলেছিলাম। অর্থাৎ আমার ভালো লাগার কথা! শুনে বউ বড়ো রাগ করে। অকারণে বলে, মাকে বলে দেবো। এই কথার এই অর্থ আমার জানা ছিলো না। তিন বছর বউর সঙ্গে আমি কথা বলিনি। টোটাল অফ। ওদের বাসায়ও যাইনি। রাস্তায় কিংবা কোনো আত্মীয়ের বাসায় কোনো ফাংশানে দেখা হয়ে গেলে মুখ ঘুরিয়ে রাখি! বউর ভেতর এই ব্যাপারটা রিয়্যাকট করে।

ওর ছোট মামার বিয়ের কার্ড ও নিজে এসে আমাদের বাসায় দিয়ে যায়। যেদিন কার্ড দিতে আসে সেদিন ওকে দেখে আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখি। সেই বিয়েতে আমাদের বাড়ির সবাই গিয়েছিলো। আমি যাইনি। বউর ওপর রাগ করেই। ব্যাপারটা ঘটে এর কদিন পর। পাবনা থেকে বউর ছোট মামার এক বন্ধু এসেছিলো বিয়েতে। এসেই বউর পেছনে লাগে। তিনদিনের মাথায় এপ্রোচ করে বসে, আই লাভ ইউ। বউ কি করে! চাকর ছেলেটাকে দিয়ে এক সন্ধ্যায় খবর পাঠালো আমাকে।

আমি যাই না। পরদিন চিঠি লেখে, পায়ে পড়ি, এসো।

যাই।

দিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। জুন মাসের এক সন্ধেবেলা। কখনো কখনো এক আধটা সময় আসে, বড়ো ভালো। পৃথিবীতে অনেক অনেক দিন বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। সেই সন্ধেটা ছিলো এই রকম একটা সময়।

বউদের বাসায় গিয়ে আমি অনেকক্ষণ একাকী বসে থাকি। বউর মা পারিবারিক খোঁজখবর নেয় আমাদের। মা ভাই বোনদের কথা জিজ্ঞেস করে। আমি ছোট ছোট কথায় জবাব দিয়ে যাই। বউকে কোথাও দেখি না। ভারি বিরক্ত লাগে। এতো করে আসতে বললে অথচ তুমি নিজেই নেই! আমি চলে আসার পাঁয়তারা করি। তখন বাচ্চা হরিণীর

মতো ছুটে আসে বউ। এসে অবলীলায় আমার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। ভুলে যায় তিন বছর ওর সঙ্গে আমি কথা বলি না। জিজ্ঞেস করে, কখন এলে? অনেকক্ষণ। আমি মাথা নিচু করে বলি। বউর মুখের দিকে তাকাতে পারি না। ভারি একটা লজ্জা করে। বউ কিন্তু অপলক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি একবার তাকাতেই হাসলো।

সত্যি?

সত্যি।

তাহলে আমি দেখলাম না যে।

তুমি কোথায় ছিলে?

ছাদে।

তাহলে দেখবে কি করে!

বউ আর কোনো কথা বলে না। অপলক তাকিয়ে থাকে আমার মুখের দিকে। আমিও তাকাই। বউ বিষন্ন স্বরে বললো, আমার খুব অসুখ করেছিলো।

কি অসুখ?

টাইফয়েড। বলে আমার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দেয়, দেখো আমি কতো রোগা হয়ে গেছি।

আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে। বউর বাড়ানো হাতটা আলতো করে ছুঁয়ে দিই। ঠিকঠাক মতো খাওয়া দাওয়া করো, সেরে যাবে।

খেতে আমার ভাল্লাগে না। তাছাড়া

কি?

বউ হাসে, পরে বলবো।

চাকর ছেলেটা প্লেট ভর্তি কি সব খাবার নিয়ে আসে। বউ বললো, ছাদে নিয়ে যা। আমরা আসছি।

ছেলেটা চলে গেলে বউ আমার হাত ধরলো, চলো ছাদে যাই। আ বউর হাত কি নরোম। আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত সেই ছোঁয়া পৌঁছে যায়। বউর পিছু পিছু ছাদে উঠে আসি। উঠেই চমকে যাই। ছাদে প্লাস্টিকের চেয়ার টেবিল পাতা। একটা চেয়ারে কে একজন বসে আছে। কে?

লোকটার সামনেই বউ আমার হাত ধরলো। মিনতি করে বললো, বসো। আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম। লোকটা কে? বউর লাভার টাভার নয়তো! দেখতে তো ভালোই। কিন্তু চেহারায় একটা খুঁত আছে। স্মার্টনেসের অভাব। এই একটা চিহ্ন দেখে আমি সাহসী হয়ে উঠি। তার দিকে তাকিয়ে বলি, হ্যালো।

লোকটা এর মানে বোঝে না। হা করে আমার মুখের দিকে তাকায়। ব্যাপারটা ম্যানেজ করে বউ। বলে, এসো তোমাদের পরিচয় করিয়ে

দিই। ইনি ছোট মামার বন্ধু, পাবনা থেকে এসেছেন।
তারপর লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে, আর ও, ওর কথা তো আপনাকে কিছুক্ষণ আগে বললাম।
আমি আবার চমকে উঠি। বউ আমার কথা কি বলেছে! লোকটার চেহারা দেখে আমি বুঝে যাই বউ কি বলেছে। তখন আস্তে আস্তে বড়ো ভালো লাগতে থাকে আমার।
বউ চায়ের কাপ উঠিয়ে দেয় আমার হাতে। প্লেট থেকে ড্রাইকেক তুলে দেয়। খাও।
আমি বউর সত্যিকারের প্রেমিকের মতোই ম্যানেজ করি সব কিছু। এর কিছুক্ষণ পর লোকটা চা খেয়ে উঠে যায়।
আমি যাই।
আমি চেয়ার ছেড়ে উঠি না। বসে থেকেই হাত বাড়াই, সি ইউ।
লোকটা চলে যায়। আমি দম ফেলে বাঁচি। চায়ে চুমুক দিয়ে বউকে বলি, এসবের মানে কি?
লোকটা আমাকে বড়ো জ্বালাচ্ছে।
এরপর আর জ্বালাবে না। আমি উঠি।
না। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।
কি কথা?
বউ একটু চুপ করে থাকে। তুমি রাগ করলে?
না। ভাবছি অন্য যে কাউকে দিয়েই এটা ম্যানেজ করতে পারতে। অযথা আমাকে ডেকে
আমার কি অন্য কেউ আছে?
আমিই কি আছি?
আছো।
আমি আবার চমকে উঠি। বউর চোখের দিকে তাকাই। চারদিকে সন্ধ্যা লেগে গেছে, আবছা অন্ধকারে বউর চোখ স্পষ্ট দেখা যায় না। তবুও বুঝতে পারি বউ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।
শুরুটা হয়েছিলো এইভাবে।
বউ বললো, তুমি কাল দুপুরবেলা আমাদের বাসায় যাবে।
কেন?

ওরা তো দুপুরবেলাই আসবে। আমাদের আরো অনেক আত্মীয়স্বজন আসবে। হেভি অ্যারেঞ্জম্যান্ট করেছে বাবা।
কিন্তু আমি যাবো কোন পারপাসে?
হঠাৎ করে গিয়ে উঠবে। যেমন আগে যেতে।
না। আমার ভীষণ খারাপ লাগবে!

তাহলে কালই সব ফাঁস হয়ে যাবে। আমি কিছুতেই ওদের সামনে যাবো না। এটাই আমার সবচেয়ে বড় ভয়। আমি চাই না আমাদের কথাটা কেউ জানুক। জানলেও এখন নয়। আরো কিছুকাল পর।

আমি বললাম, ঠিক আছে যাবো।

এবার বউ খুব খুশি। হেসে বললো, তুমি ওদের সঙ্গে বসে থাকবে। আমি জানবো তুমিই আমাকে দেখতে গেছো। তুমিই পাত্র। আমিও কেবল তোমার দিকে তাকাবো। এভাবে দেখেটেখে তো আর তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে না। চান্সটা মিস করি কেন।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

কালরাতে আমি মদ খেয়েছি।

আমি খুব কম মদ খাই। তাও বাসায় কখনো নয়। কাল হলো কি রাতের বেলা বউর কথা এমন করে মনে হতে লাগলো! বউকে আমার দেখতে আসবে অন্যলোক! কথাটা ভাবতে ভাবতে একসময় কেঁদে ফেলেছি। তখন রাত দশটা। আমি সিউর হয়ে গেলাম আজ সারারাত আমার ঘুম হবে না। আর ঘুম না হওয়ার কি যে যন্ত্রণা! সারারাত কেবল সিগারেট খাবো। রাত দুটোয় দেখা যাবে টেপরেকর্ডার বাজাচ্ছি। ক্যাসেটে বিসমিল্লাহ খাঁর সানাই। দুঃখটা যাবে আরো বেড়ে। সারারাত ঘুম না হলে চেহারা ভীষণ খারাপ হয়ে যায় আমার। এক ধরনের রুক্ষতা চলে আসে মেজাজে। বউ আমাকে একপলক দেখেই বুঝে যাবে ব্যাপারটা। আমি এখন কি করি?

রাত দশটায় আমি তারপর শাঁখারি বাজার গিয়ে একটা ইয়েলো লেবেল হুইস্কির পাইট কিনে আনি। এক প্যাকেট ডানহিল কিনি মোড়ের দোকান থেকে। আর কিছু চানাচুর। এই করে আমার রাত কাটাতে হবে ভেবে বুকের ভেতরটা মোচড়ায়। নিজেকে বলি, বাকাপ, লাইফ দিচ্ছেন বটে!

আমার ঘরটা খুব ছোট। একটা সিঙ্গেল খাট ফেলার পর অল্প কিছুটা জায়গা ফাঁকা। তার মধ্যে একটা আলনা, একটা রাইটিং টেবিল, চেয়ার। একপাশে ছোট্ট আর একটা টেবিল তার ওপর আমার সনিও থ্রিইন ওয়ান। ব্রিফকেস সিস্টেম। চৌপরদিন খোলা থাকে জিনিশটা, বাজে। ইতি উতি ছড়ানো কিছু রেকর্ড, ক্যাসেট। মেঝেতে কার্পেট বিছানো, মাথার ওপর রেগুলেটারহীন মিল্লাত ফ্যান সাঁ সাঁ করে বাতাস দেয়। এই আমার ঘর। দরোজা বন্ধ করে দিলে আমার নিজস্ব একটা পৃথিবী তৈরী হয়ে যায় ঘরের ভেতর।

দম নিয়ে কাটায় কাটায় এগারোটায় আমি বসি। তার আগে টেপ-রেকর্ডার অন করি। বিসমিল্লা খাঁর নাইন্টি মিনিটের ক্যাসেট। লো ভল্যুমে বাজতে শুরু করলে আমি দরোজা আটকাই। বাসার সবাই

ঘুমে। আমাদের ফ্যামিলিতে একটু তাড়াতাড়ি ঘুমুনোর নিয়ম। ভাই-ভাবি কি এখনো জেগে! থাকগে। কেহ টেরটিও পাবে না।

নীল ডিম লাইট জ্বেলে আমি একটা পাগলামী করি। শার্ট গেঞ্জি প্যান্ট জাঙ্গে সব খুলে ফেলি। পুরো ন্যাংটা। তারপর ফ্যান ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে কার্পেটের ওপর বসে গ্লাসে মদ ঢালি। জল মেশাই, খেতে থাকি। হাতে জ্বলে কিং সাইজ ডানহিল। দাঁতে কুরমুর চানাচুর। ন্যাংটো আমাকে এ অবস্থায় পৃথিবীর কেউ দেখছে না। তিন সিপের মাথায় এজন্য আমার দুঃখ হতে থাকে।

ঘুম ভাঙে খুব সকাল বেলা। সাতটা হবে। উঠে দেখি শুয়ে আছি কার্পেটের ওপর। সামনে হুইস্কির বোতল, খানিকটা এখনো আছে। ডানহিলের প্যাকেট পরে আছে হাফ। ছড়ানো ছিটানো চানাচুর। আমি ন্যাংটো। ভারি একটা ভাল্লাগে। ঠিক তখুনি বুকের ভেতর বসে বউ বলে ওঠে, আজ আমায় দেখতে আসবে।

আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আজ আমি কোথাও বেরুবো না। সারাদিন শুয়ে থাকবো ঘরে।

বাথরুম পায়। উঠে লুঙ্গি পরি ডানহিলের প্যাকেট আর চানাচুরটা রাখি টেবিলের ওপর। দেখি টেপরেকর্ডার অন করা। রাতের বেলা বন্ধ করার কথা মনে হয়নি। তাড়াতাড়ি স্টপ করি। হুইস্কির বোতলটা ভালো করে বন্ধ করে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখি। তারপর দরোজা খুলে বেরুই। পৃথিবী খুব নতুন লাগে। আজ কিছু একটি ঘটবে। গোসল টোসল সেরে দশটার দিকে ভাত খাই। মাকে বলে সকাল বেলা গরম ভাত, ডিমভাজার এ্যারেঞ্জ করেছি। গ্রাম থেকে হাতে তৈরি ঘি এনেছে কেয়ার টেকার। গরম ভাতে কাচা ঘি বড়ো টেস্টি। এ্যাসিস্টান্টরা এসেছিলো ঠিক আটটায়। চারজন। চার সাইটে পাঠিয়ে দিয়েছি। মানিক নগরের কাজটা একটু ঝামেলার। আর্থফিলিং। ৫২৪ ফুট বাই ১২ ফুট। নোংরা জলা ভূমির ওপর দিয়ে মাটি ফেলে ঐ মাপের রাস্তা করে দিতে হবে। দুপাশে সালবল্লা গেড়ে ড্রামসিট ফিট করে তার পর মাটি ফেলা। মাটি ফেলা শেষ হলে আবার ব্রিকসলিং। প্রথমে ফ্লাট সলিং করে তার ওপর পেভমেন্ট। এক লাখ ছিয়াশি হাজার টাকার কাজ। বড়ো ঝামেলার। এ্যাসিস্টান্ট চলে গেছে। সন্ধে ছটা পর্যন্ত থাকবে। টাকা পয়সাও দেওয়া আছে। তবুও একবার যাওয়া উচিৎ। অন্যগুলোতে না গেলেও চলে। কিন্তু আমি আজ যাবো না। আমার মন ভালো নেই। বউকে আমার দেখতে আসবে অন্যলোক।

দশটার দিকে দরোজা বন্ধ করে আমি আবার টেপরেকর্ডার অন করি। অশোক তরুর রবীন্দ্র সঙ্গীত। খাটের তলা থেকে টেনে বের করি মদের বোতল। ডানহিল ধরাই। নিজেকে শেষ করে দেবো শালা। কার জন্যে

ভালো থাকবো! বউকে আমার দেখতে আসবে। পছন্দ হলে বিয়েও হয়ে যাবে। বউ আমাকে ছেলে ভুলানো আশ্বাস দিয়েছে। আমার সঙ্গে ছাড়া ওর বিয়ে হবে না। সব মিথ্যে, মিথ্যে। আমার কিছু বিশ্বেস হয় না।

বোতলটা খুলে আমি সবটুকু মদ গলায় ঢেলে দিই। র। ইয়েলো লেবেল হুইস্কি ব্লেড মারতে মারতে গলা দিয়ে নেমে যায়। বুকের ভেতরটা জ্বালা করে ওঠে। তখন ক্যাসেটে অশোক বাবু ভরাট গলায় গাইছেন, 'নয়ন মেলে দেখি আমায় বাঁধন বেঁধেছে।' এটা শালা গালিভারের গান। চক্ষু খুলিয়া ম্যানমাউন্টেন দেখিলো তাঁহার নড়িবার উপায় নাই। মাটির সহিত আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তাহার শরীর। রবীন্দ্রনাথ মাইরি ক্যাতনা বড়া কাবি। একখানা গানের কতোরকমের যে মানে। কথাটা ভেবে সবকিছু ভুলে আমি একচোট হাসি। তারপর আর একটা ডানহিল ধরিয়ে বিছানায় গিয়ে শুই। হুইস্কি আর ডানহিল মিলে পয়মাল করে দেয় ভেতরটা। চোখের সামনে আমার ১৪ ফুট বাই ১০ ফুট ঘরটা আস্তে ধীরে অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

ঘুম ভাঙে সোয়া দুটোয়। উঠে বেশ একটা ফ্রেস লাগে। মুখ চোখ ফুলে গেছে। শরীরটা হালকা। তখুনি মনে পরে বউর কথা। বউকে আমার অলরেডি দেখতে চলে এসেছে লোকজন। বাড়িতে হেভি গ্যাঞ্জাম নিশ্চয়। বউরা মাল্টিমিলিওনিয়র। মা বাবার একমাত্র মেয়ে। বউ আমার নীহার রঞ্জনের হিরোইন একেবারে।

না আমার এখন যেতে হয়। বউ প্ল্যান দিয়ে গেছে, সাডেন চলে যাবে। ভাববে তুমি না জেনে গেছো। তারপর তুমি আমাকে দেখবে, আমি তোমাকে।

আল্লা কি যে হবে! আমার বুকের ভেতর চিনচিনে ভয়। তবুও বেরিয়ে পরি।

আমি খুব টিপটপ না থাকলে বউ ভীষণ মাইণ্ড করে। সো দ্যাট, আমি গিল্ডার্স থেকে ধোয়া শাদা প্যান্ট পরি, শাদা শার্ট। হাতে কপলিন লাগাই। আড়াই ইঞ্চি হিলের চকচকে কালো জুতো পরি। হিপি চুল জাফর ইকবাল স্টাইলের আমার। ব্রাশ মেরে আয়নায় নিজেকে দেখে আমার কেমন লাগে! সবকিছু ভুলে আমি আয়নায় নিজেকে জিজ্ঞেস করি, হাউডু ইউডু।

দোতলার সিঁড়িতে জুলির্ সঙ্গে দেখা। জুলি আমাকে দেখেই রেগে গেলো, কটা বাজে?

আমি ঘড়ি দেখি। অপরাধীর মতো বলি, তিনটে পাঁচ।

যান। বউ ভীষণ রেগে গেছে।

দেখানো শেষ?

না খাওয়া দাওয়া শেষ। চারটের দিকে দেখানো হবে।
আমি হাঁফ ছাড়ি। তাহলে রাগের কি আছে ?
তিনটে বাজে। ও এখনো কিছু খায়নি।
কেন ?
আপনি আসেন নি বলে।
ও। আমি হেসে তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠে যাই। জুলি আমার আগে আগে দৌড়ে চলে যায়।
উপরে উঠে আমি বোল্ড। ঘরদোর ভর্তি লোকজন। যেনো আজই বউর বিয়ে।
বউর মা, আমার সম্পর্কে খালা, আমাকে দেখে হাসেন। তুমি এসেছো ভালোই হলো। বউকে আজ দেখতে এসেছে।
তাই নাকি ? আমি হাবাগঙ্গারামের ক্যারেক্টার করি। জুলি দূর থেকে হাসে। তারপর চোখ টিপে আমাকে খাওয়ার টেবিলে বসতে বলে। আমি খালার দিকে তাকাই। খালা বলেন, তুমি বসো। খেয়ে যেও। তিনি খুব ব্যস্ত। চলে গেলেন।
জুলি প্লেটভর্তি খাবার এনে টেবিলের ওপর রাখলো। ফিসফিস করে বললো, তাড়াতাড়ি খান। আপনি মুখে না দেওয়া পর্যন্ত বউ খাবে না। ওর সামনে খাবার দেওয়া আছে। আপনি মুখে দিলে আমি ওকে গিয়ে বলবো, তারপর খাবে।
আমি জানি বউ এরকম। খেতে বসি। জুলি চলে গেলো।
কিন্তু আমার গলা দিয়ে খাবার নামে না। ঢকঢক করে বোরহানী খাই। খাবার সব পড়ে থাকে। বউ আমার না জানি কতো কেঁদেছে আজ।
জুলি এলে আমি জিজ্ঞেস করি, বউ খুব কেঁদেছে, না ?
হ্যাঁ।
কেউ কিছু বলেনি ?
না। রেগে গেলে ওর সঙ্গে কেউ কথা বলে না।
এসব তো আমি জানি। তবুও জুলির মুখে শুনতে বেশ লাগে। বউ আমার সেন্টপারসেন্ট বউ।
চারটের দিকে বউকে দেখানো হয়। ড্রয়িংরুমে বসে আছে সবাই। চারদিকের সোফায় গোল হয়ে বসে আছে পাত্রপক্ষ। একপাশে টেবিলের ওপর হারমোনিয়াম, তবলা আর একটা হাওয়াইয়ান গিটার। বউর এক খালাতো ভাই কলেজ অব মিউজিকের ছাত্র। পার্টি নিয়ে এসেছে। বউকে দেখানোর পর পপগান হবে। সব কিছুই পাত্রপক্ষের এন্টার-টেইনমেন্টের জন্য। ভেবে রাগে আমার গা জ্বলে উঠে। ইচ্ছে করে পোঁদে লাথ মেরে সব শালাকে তুলে দিই। বাপ দাদার আড়তদারী পেয়েছো শ্যালকগণ, অন্যের বউকে ঘটা করে দেখে যাবে, খেয়ে যাবে,

গান শুনে যাবে!

র বাবা, র। নিজেকে গ্রাম্য কায়দায় ঠাণ্ডা রাখি। খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে পাত্রের সঙ্গে গিয়ে এক সোফায় বসি। ব্যাপারটা কেউ খেয়াল করে না।

জুলির সঙ্গে বউ এসে ঢোকে। ববিতার মতো অল্প হাত তুলে সালাম দেয় সবাইকে। আমি সবকিছু ভুলে বউর দিকে তাকাই। তাকিয়েই থাকি। আরে বা বউকে আমার কি সুন্দর লাগছে! বউ পরেছে গরদের শাড়ি, ঘি রংয়ের ওপর টকটকে লাল পাড়। কপালে লাল টিপ। গলায় চিক পরেছে, হাতে এত্তো চুড়ি। লুনা জুয়েলার্সের বিজ্ঞাপন হয়ে বউ আমার মুখোমুখি বসে। বসেই একবার মুহূর্তের জন্যে আমার দিকে চায়। তারপর মাথা নিচু করে রাখে।

লোকগুলো তখন হামলে দেখছে বউকে। কে একজন মুরুব্বীগোছের লোক জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম কি মা?

বউ একটা নাম বললো। মোসাম্মত অমুক বেগম ঘারানার। বিচ্ছিরি নাম। বউ কখনো এই নামটি আমায় বলেনি। আমি কি কখনো জানতে চেয়েছিলাম? না। আমাদের জেনারেশানে মেয়েদের নামের আগে মোসাম্মত শেষে বেগম চলে না। আমি কখনো বউর কাছে তার পুরো নাম জানতে চাইলেও আমি সিউর বউ এ দুটো শব্দ বাদ দিয়ে তার নাম বলতো।

কিন্তু আজ তো আমি এখানে প্রেজেন্ট। বউর আমার মধ্যে কথা হয়েছে হবু বর কনের মতো আমরা পরস্পর পরস্পরকে দেখে নেবো আজ। পৃথিবীর আর কেউ তা জানবে না। তাহলে বউ ঐ নাম বললো কেন! আমার ভেতর স্ট্রাইক করে। মুহূর্তে সামলে নিই নিজেকে। আসলে পারিবারিক বলে একটা ব্যাপার আছে, অস্বীকার করা যায় না।

আমি থিতু হয়ে বসে। বউ তখন একের পর এক লোকগুলোর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। ফাঁক পেলেই এক আধবার আমার দিকে তাকায়। আমি বুঝতে পারছি পাত্রপক্ষের পছন্দের ব্যাপারে বউ আমার নাইনটি পার্সেন্ট মার্কস অলরেডি কেরি করে ফেলেছে। ধীরে সুস্থে আমার ভেতর তখন একটা রিয়্যাকশান শুরু হয়। আমার বধূয়া যায় বুঝি আনবাড়ি। আমি গটগট করে বেরিয়ে আসি। কান্না পাচ্ছিলো। সামলে সুমলে ছাদে চলে আসি। রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে ছ্যাক খাওয়া প্রেমিকের মতো সিগারেট ধরাই। বেচারা ডানহিল সিগারেট আমাকে খুশি করার জন্যে বুকের অনেক গভীর পর্যন্ত চলে যায়। ছাদে দাঁড়িয়েই আমি স্পষ্ট দেখতে পাই বউর হাতে পাত্র পক্ষের কেউ একজন চমৎকার আংটি পরিয়ে দিচ্ছে। পাত্রী পছন্দ হলো।

ধুৎ শালা! আমি বুঝি হাফসোলই খেলাম শেষ পর্যন্ত। নিচে তখন

হারমোনিয়াম বেজে ওঠে, সঙ্গে তবলা। গিটার ও কড দিচ্ছে ! সব ছাপিয়ে অমোঘ সুরে কে গেয়ে ওঠলো 'পাগলার মন নাচাইয়া পাগলী গেলো চলিয়া।' শুনে আমার বুকের ভেতরটা কাঁপে। সবকিছু গুলিয়ে যায়। আমার এখন কি হবে। চারদিকে সন্ধ্যা নামে, আমি খেয়াল করি না। বউ আমার পেছনে এসে দাঁড়ায়, তাও না।

বউ আমার হাত ধরলে চমকে উঠি। তারপর অপলক চোখে বউর দিকে তাকাই। বউ বললো, তুমি চলে এলে কেন ?

আমার ভাল্লাগছিলো না।

আমারই কি লাগছিলো !

কি জানি।

বাজে কথা বলো না। তাহলে আমি কাঁদবো।

তোমাকে তো ওদের পছন্দ হয়ে গেলো।

তাই হবে। এই দেখো আংটি দিয়েছে।

বউ তার সুন্দর বাঁ হাত আমায় চোখের সামনে তুলে ধরে। আবছা অন্ধকারেও আমি দেখি ওর আঙুলে চকচকে আংটি। বলি, তুমি নিলে কেন ?

না নিলে কেমন দেখায় !

কেমন দেখায় ?

তুমি বোঝ না ?

না।

অমন করে কথা বলছো কেন ? বউর স্বর ভেজা। আমি বুঝতে পারি ও এক্ষুণি কাঁদবে। ম্যানেজ করি। তুমি এতো সুন্দর আগে তো দেখিনি।

বউ কথা বলে না। আমি ওর বাঁ হাতটা ধরি। বউ, আমিও তো তোমাকে দেখতে এসেছিলাম।

তুমি এসেছো বলেই তো আমি ওদের সামনে গেছি। আমি তো জানি কে আমায় দেখবে।

দুজনেই চুপ করে থাকি। বউ বললো, পাত্রী পছন্দ হয়েছে ?

আমি তখন একটা কাজ করি। আমার কড়ে আঙুল থেকে লাল-পাথরের আংটিটা খুলে বউর আঙুলে পরিয়ে দিই। বউ এক মুহূর্ত কি ভাবে। তারপর পাত্র পক্ষের আংটিটা হাত থেকে খুলে অবলীলায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো ওদের বাড়ির পেছন দিকের গলিতে। আমার একটা হাত ধরে নিজের গালে ঘষতে ঘষতে বললো, আজ যে আমার কি সুখের দিন।

আমি অপলক বউর দিকে তাকিয়ে থাকি।

রোববার বজলুর বাসায় দাওয়াত। আমার একারই। বজলু আমাকে টেলিফোন করে জানিয়েছিলো। আমি বলেছিলাম, আমার খুব কাজ। রোববারও সাইট চলে।

বজলু কোনো কজ শুনতে চায়নি। বলেছে সব কিছু ফেল রাখ শালা। বেড়ে আমার কন্ট্রাকটর হয়েছে। রোববার আবার কি কাজ! যদি সকাল দশটার মধ্যে আমার বাসায় না আসবি তো আমি দেখবো ঢাকার শহরে তুমি কন্ট্রাকটরি করো কেমন করে!

বজলু এরকমই। যা প্ল্যান করবে, করে ছাড়বে। আমার বন্ধুদের মধ্যে ওই একমাত্র ছেলে যে পর পর তিনবার বাঁ হাতের ড্যানা ভেঙেছে। বজলুকে এভয়েট করার সাহস আমার নেই। রোববার সকাল দশটায় গোপীবাগে বজলুর বাসায় গিয়ে উঠি।

বজলু দাঁড়িয়েছিলো দোতলার রেলিংয়ে। আমাকে দেখে নেমে এলো। সাবাস দোস্ত। আয়।

বজলুর বাসায় দিনটা মন্দ কাটবে না বোঝা যায়। বহুকলের পুরনো বন্ধু। গেণ্ডারিয়া স্কুলে আমরা একসঙ্গে পড়তাম। বজলু শালা খাতার-নাক মাল ছিলো। আমাদের কেমিস্ট্রির টিচার ছিলেন হরিপদ বাবু। লোকটা নিজেকে মহা একটা কিছু ভাবতো। একদিন কি একটা কারণে আমাকে ক্লাশ থেকে বের করে দেয়। আমি ফার্ষ্টবয় ছিলাম। ক্লাশ থেকে ফার্ষ্টবয়কে বের করে দেওয়া নট এ ম্যাটার অব জোক। আমি উঠে দাঁড়িয়েছি ক্লাশ থেকে বেরিয়ে যাবো। ফার্ষ্টবয় হই আর যাই হই আফটার অল টিচারের অডার, অমান্য করা যায় না।

আমাকে দাঁড়াতে দেখে লাষ্ট বেঞ্চ থেকে বজলুও উঠে দাঁড়ালো। উদার গলায় বললো, ও বেরুবে না স্যার।

হরিপদ চমকে গেলেন। বজলুর দিকে তাকিয়ে রেগেও গেলেন বুঝি। ক্লাশ নাইনে বেত চলে না। সুতরাং মুখেই বললেন, তুমিও বেরিয়ে যাও। একথায় বজলুর কোনো রিয়্যাকসান হয় না। সে খুব স্বাভাবিকভাবে, যেনো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলছে এমন স্বরে বললো, আপনি বেরিয়ে যান। হরিপদ থ। ছাত্ররাও।

বজলু খুব ডেয়ারিং বলে ক্লাশে সবাই ওকে জমা খরচ দেয়। বজলুর ওপর কথা বলার কেউ নেই। ছাত্ররা সব চুপ করে রইলো। হরিপদ তখন রাগে কাঁপছেন। চেঁচিয়ে বললেন, তোমাকে আমি টিছি দেবো।

বজলু আস্তে ধীরে স্যারের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সারা ক্লাশ সাউণ্ডলেস। শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দও হয় না। বজলু হরিপদর মুখের ওপর দাঁড়িয়ে বললো, আপনি বেরিয়ে যান নয়তো

হরিপদ সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেছেন। ফ্যাকাশে মুখে উঠে চলে গেলেন। বজলু আমার হাত ধরে বললো, চল।

কোথায় ?

চল না।

বজলু আমাকে নিয়ে স্কুলের পেছনের দরোজা দিয়ে পালিয়ে এলো।

মনে আছে তারপর অনেকদিন বজলু স্কুলে যায়নি। স্কুল কমিটির এক মেম্বার ছিলো ওর মামা। তাকে ধরেটরে হেড স্যারের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলো।

সেই বজলু এখন দিব্যি আছে। খায় দায় ফুর্তি মারে। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে বহুদিন। ইন্টারমিডিয়েটের পর আর এগোয়নি। ওর বড়ো মামার বিরাট বিজনেস। মতিঝিলের একটা ছোটখাটো অফিসে বসে বজলু মাঝে মধ্যে মামার কাছ থেকে বিজনেস শেখে।

দোতলায় বজলুর রুমে বসতেই বজলু আলমারি খুলে দুটো বিয়ারের টিন বের করলো। টেবিলের ওপর গ্লাস ছিলো, দুটোতে ঢাললো। ওর বিছানায় পড়ে আছে অজস্র ইংরেজি বাংলা সেক্স ম্যাগাজিন, এক প্যাকেট সদ্য সেলোফিন ছেঁড়া ফাইভ ফিফটি ফাইভ, একটা রনসন লাইটার। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে বিয়ারে চুমুক দিই। বজলু বলে, তুই কেমন আছিস দোস্ত ?

আমি বলি, ভালো নেইরে। বউকে নিয়ে আর পারছি না। ঐ একটা প্রোবলেম।

আমি বউর সব কথা বজলুকে বলতে শুরু করি। গল্প জমে যায়।

জাস্ট বারোটায় বজলুর বাসা থেকে বউকে টেলিফোন করি। জানি রোজ বারোটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত বউ আমার টেলিফোনের সামনে বসে থাকবে। এ সময় ওদের বাড়িটা খুব নির্জন থাকে।

বউ টেলিফোন ধরলো, হ্যালো।

আমি।

ইস, তুমি তাহলে টেলিফোন করলে। আমি এদিকে মরে যাচ্ছি।

কেন ?

কতোদিন তোমার সাথে দেখা নেই। তাছাড়া

কি ?

বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক হয়ে গেছে।

মানে ?

ওরা খবর পাঠিয়েছে। পাত্রী পছন্দ। এখন দিন তারিখ ঠিক করলেই হয়।

তাহলে ?

আমি কিছু ভাবতে পারছি না। রাতেরবেলা আমার ঘুম হয় না। কিছু খেতে ভাল্লাগে না। আমি এখন কি করবো! তোমাকে ছাড়া আমি কিছুতেই বাঁচবো না।

বউর স্বর ভেজা ভেজা। ও বুঝি টেলিফোনেই কেঁদে ফেলবে।

এদিকে আমার বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডের শব্দ পাল্টে গেছে। আমার কি করার আছে! সামলে নিয়ে বউকে বলি, কি করা যায় এখন?

আমি জানি না। আমি পাগল হয়ে যাবো, মরে যাবো।

বউ টেলিফোনেই কেঁদে ফেলে। আমি কি করবো বুঝতে পারি না। চুপ করে থাকি। ওপাশে বউ খানিক কাঁদে, তাঁর নাক টানার শব্দ, কান্নার শব্দ পাই।

হঠাৎ কান্না থামিয়ে বউ বললো, তুমি কাল এগারোটায় রমনা রেস্টু-রেন্টে থাকবে।

আমার অনেক কাজ। কাল সোমবার, ব্যাংকে কাজ আছে। এগারোটার দিকে যাবো কেমন করে! কিন্তু একথা বউকে বলা যায় না। বলি, ঠিক আছে।

বউ বলে, তুমি, কাল শাদা প্যান্ট আর শাদা পাঞ্জাবী পরবে। সকাল বেলা উঠে সেভ করবে, গোসল করবে। আমি যে সেন্টটা দিয়েছিলাম লাগাবে।

শুনে আমার এতো কিছুর মধ্যেও হাসি পায়। বলি, আচ্ছা। বউ টেলিফোন নামিয়ে রাখে।

সব শুনে বজলু বললো, বিয়ে করে ফেল।

আমি সিগারেট ধরিয়ে উদাসভাবে টানি। বললেই কি বিয়ে করা যায়?

আরে করে ফেল। পরে সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

তা না হয় হলো! লোকে বলবে কি। আমার এতোগুলো ভাইবোন, চারটে বোনের এখনো বিয়ে হয়নি।

তোর বড়ো ভাই বোন দুটোর তো বিয়ে হয়েছে। এখন তো তোরই সিরিয়াল।

সিরিয়াল টিরিয়াল কোনো ব্যাপার নয়। আমি ভেবেছিলাম সেজো বোনটার বিয়ে দিয়ে

ছাড় ওসব। এতো দায়িত্ববান হয়ে কোনো লাভ নেই দোস্ত। বোনদের বিয়ে কি আর আটকে থাকবে। তুই করে ফেল।

বউদের বাসায় হেবি প্রোবলেম। ওর মা বাবা রাজি হবে না। এখন বিয়ে করলে পালিয়ে করতে হবে। তাতে হবে কি, আমার মা ভাইরাও ব্যাপারটা একসেপ্ট করবে না।

বজলু সিগারেট টানতে লাগলো। কিছু ভাবছে। এ সময় চাকর ছেলেটা এসে বললো, খাবার দেয়া হয়েছে।

বজলু তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে বললো, চল। হেভি খিদে পেয়েছে। আমরা নিচে ডাইনিং রুমে চলে আসি।

উরেস শালা, একি করেছিস? ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকিয়ে আমি

অবাক। দুজন মানুষ খাবে তার কি এরেঞ্জ। ৬ ফুট বাই ৩ ফুট ডাইনিং টেবিলে একচুল জায়গা নেই।

বজলু বললো, চলো। বহুদিন ভালো খাবার টাবার পাই না। আজ তোর উপলক্ষ্যে হয়ে গেলো।

আমরা খেতে শুরু করি।

খেতে খেতে বজলু এক সময় বললো, বেটা তুই এক কাজ কর। মেয়েটাকে যখন এভয়েড করা সম্ভব নয়, কাজীর অফিসে গিয়ে বিয়েটা কর। করে সোজা আমার কাছে চলে আয়! আমি মাস খানেকের জন্যে তোদের লুকিয়ে রাখবো। খুলনায় মামা বিরাট একটা বাড়ি করেছে। সেখানে পাঠিয়ে দেবো। তারপর টেলিফোনে ওদের বাসায় তোদের বাসায় ব্যাপারটা জানিয়ে আস্তে ধীরে ম্যানেজ করে ফেলবো।

আমি কোনো কথা বলি না। কি বলবো। আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে। বজলুর এসব কথা শুনে দিব্য চোখে দেখতে পাই, নির্জন তিনতলা একটা শাদা বাড়ি। সামনে বিশাল বাগান। বাগানে থরে বিথরে ফুটে আছে ফুল। প্রজাপতি উড়ছে। আমি আর বউ তিনতলার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখছি। বেশ লাগে এসব ভাবতে।

বজলু বললো, কি হলো, খা।

খাচ্ছি।

আমি আবার বউর কথা ভাবছি। হঠাৎ মানব সমাজের কথা ভেবে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। বিয়ে ব্যাপারটা যদি না থাকতো! যদি এমন হতো, যাকে ভালোলাগে তার সঙ্গে যতোদিন ইচ্ছে প্রেম করো, তারপর খারাপ লাগলে ছেড়ে দাও!

না তা হয় না। মানুষ বড়ো বোকা জীব।

সকালবেলা আমি বেরিয়েছি আটটার দিকে। তার আগে সেভ করেছি। গোসল করেছি। শাদা প্যান্ট পাঞ্জাবী পরে সেন্টও লাগিয়েছি বউর কথা মতো। কাল অনেক রাতে বজলুর ওখান থেকে ফিরেছি। সারাদিন বিয়ারের পর রাতের বেলা জনি ওয়াকার টেনেছি। ফলে সকালবেলা খুব ফ্রেস লাগে! মনে হয় বেঁচে থাকা বড়ো সুখের। সাইট ফাইট ঘুরে, ব্যাংকের কাজ সারতে সারতে এগারোটা বেজে যায়। ঠিক এগারোটা পাঁচ মিনিটে লক্ষ্মীবাজার থেকে আমি রিকশায় চড়ি। এখন যেতে যতোটা সময় লাগে।

রিকশাঅলাটা বুড়ো মতন। টেনে চালাতে পারে না। দেখে আমার ভারি রাগ ধরে। বউ খুব পাংচুয়াল। ঠিক এগারোটায়, চাই কি দুদশ মিনিট আগেই এসে বসে আছে। ওই জায়গাটা বাজে হয়ে গেছে। একা মেয়েমানুষ বসে থাকলে লোকে ভাবে লাইনের মাল। চার পাশে

ঘুর ঘুর করে, চোখ টোক মারে। সাহসী দুএকজনে রেটও জিজ্ঞেস করে বসে। ইস বউ আমার এমন জায়গায় বসে আছে। ভেবে রাগে দুঃখে আমার কান্না পায়। বউকে যদি কেউ চোখ মেরে বসে, কিংবা রেট জিজ্ঞেস করে।

বড়ো ভাই বলেছিলো, তুই একটা হোণ্ডা কিনে নে! তাতে কনভেন্সটা সেভ হবে।

হোণ্ডা জিনিশটা বরাবরই আমার অপছন্দ। কিনিনি। তারচে রিকশা ভালো। কিন্তু দুএকটা মুহূর্তে এমন রিকশাঅলা পরে, শালা নিজের চুল নিজে ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। এই যেমন এখন। রদ্দি এক রিকশাঅলা নিয়েছি, শালা চালাতেই পারে না।

এগারোটা পঁচিশ মিনিটে আমি রমনা রেস্টুরেন্টে পৌঁছাই। ঢুকে পাগলের মতো বউকে খুঁজি। ভেতরে না পেয়ে ঝোলানো বারান্দায় যাই। ঐ তো উত্তর কোণের রেলিং ঘেষে বউ বসে আছে। ঐ টেবিলটার সঙ্গে চমৎকার একটা স্মৃতি আছে আমাদের। ওখানে বসে এক দিন বৃষ্টিতে ভিজেছিলাম আমরা। পরদিন বউর ভীষণ সর্দি হয়। দেখা হতেই বউকে আমি বলেছিলাম, এসো আমরা সর্দি পাল্টা-পাল্টি করি।

কথাটা আমাদের দুজনেরই মনে আছে।

বউ আমাকে দেখে মুখ ভার করে রাখলো। আমি ওর মুখোমুখি বসতে গিয়ে বুঝি, বউ খুব রেগে আছে। বললাম, কখন এসেছো?

পৌনে এগারোটায়।

আমার খুব লেট হয়ে গেলো।

জানতাম।

সত্যি ভীষণ একটা কাজ ছিলো।

বিয়ে হলেও এমন করবে?

কি রকম?

সব কিছুতেই লেট।

আমি বউকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকি। আ বউ কি চমৎকার সেজেছে আজ। টুকটুকে লাল কাতান শাড়ি পরেছে। লাল ব্লাউজ, কপালে লাল টিপ, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। পায়ে দুইঞ্চি হিলের খরম, তাও লাল। বউকে আজ বউর মতো লাগছে। আমি বলি, বউ তোমাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে।

তোমাকেও। একেবারে বরের মতো।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। এসো আমরা আজই বিয়ে করে ফেলি।

শুনে আমি হা হা করে হাসি! বেয়ারাকে ডেকে বলি, দুটো কোক

লাগাও।
বউ বলে, আমি কিন্তু সিরিয়াসলি বলছি। আজ আমরা বিয়ে করবো।
বউর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে যাই। দুষ্টুমির চিহ্ন নেই মুখে। বরং খানিকটা চিন্তিত।
আমি ঢোক গিলে বলি, বিয়ে না হয় করলাম, তারপর ?
কয়েকদিন বাইরে কোথাও থাকবো। তারপর বাবাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবো। তখন মেনে নেবে। ফেলে কি আর দিতে পারবে !
তারপর একটু থেমে বলে, আগামীকাল দিন তারিখ ঠিক করতে আসবে ওরা। এর আগেই ব্যাপারটা সেরে বাবাকে জানাতে হবে।
আমি অফ হয়ে যাই। বুঝতে পারি আমার ভয় করছে। বউকে দেখি বড়ো নির্বিকার। ও ডিসিশান নিয়ে নিয়েছে। মেয়ে হয়েও এতোটা করতে পেরেছে ভেবে হঠাৎ আমার ভেতর অন্য একজন আমি আমাকে দুয়ো দিই। তারপর গা ঝাড়া দিয়ে উঠি। ঠিক আছে, চলো আজই।
কোক আসে। আমি কোক না খেয়ে কাউন্টারে গিয়ে টেলিফোনটা টেনে নিই। বজলুকে টেলিফোন করি। বাসায় নেই। ড্যাম কেয়ার। আবার রিং করি। নারায়ণগঞ্জে সাঈদকে। ওকে পাওয়া যাবেই।
সাঈদ বললো, তুই এখনো বেঁচে আছিস। এদিকে নারায়ণগঞ্জে আমরা সব বন্ধুরা মিলে যে তোর গায়েবী জানাজা পড়লাম।
ভালো করেছো বাবা। এখন একটা কাজ করো, পিয়া মাসুদ ধলা শফিক ওদের নিয়ে রমনা রেস্টুরেন্টে চলে আসো।
কি ব্যাপার ?
সিরিয়াস।
ইজ ইট ?
আমি কি বিটলামী করছি।
ও কে। সাঈদ টেলিফোন ছেড়ে দেয়।
আমি তারপরও চারটে টেলিফোন করি। পিয়া মাসুদ ধলা শফিককে। মাত্র একজনকে পাওয়া যায়, পিয়া। সাঈদকে যা বলেছি তার হুবহু কপি বলি পিয়াকে। পিয়া বলে, আমি এক্ষুণি আসছি। যাকে যাকে পাই নিয়ে আসবো।
ঠিক সোয়া বারোটায় তিনটে তিন ঘারানার গাড়ি এসে থামলো রেস্টুরেন্টের সামনে। এক গাড়ি থেকে দুজন আর অন্য দুটো থেকে দুজন, মোট চারজন ১৯৭৭ এর স্মার্ট যুবক নামলো। নেমে হন হন করে ঢুকে গেলো রেস্টুরেন্টের ভেতর। আমাদের দেখে হৈ হৈ করে উঠলো সবাই। পিয়া বললো, শালা বসে বসে প্রেম করছো। আর আমি ভাবলাম কি না কি।

আমি বউর সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিই। তারপর বলি, এরেঞ্জ কর এক্ষুণি বিয়ে করবো।
সবাই হুররে দিয়ে ওঠলো, লাগা শালা।
বউ চুপ করে আছে। আমি বললাম, কিন্তু বউ নিয়ে উঠবো কোথায়?
ধলা বললো, আবে ওটা কোনো ফ্যাকটর না। আমার বাসায় চল। ভাই ভাবী দেশে গেছে। আমার ছাদের রুমটা ছেড়ে দেবো। যে কদিন ইচ্ছে থাক।
তাহলে চল।
সবাই ওঠে দাঁড়ায়। আমরা এখন মগবাজার কাজী অফিসে যাবো। ধলা বললো, দাঁড়া বাসায় একটা টেলিফোন করে দিই। ঘরটা গুছিয়ে রাখবে।
ধলা টেলিফোন করতে কাউন্টারে গেলো। শফিক বললো, তোরা কাজী অফিসে চলে যা। আমি কিছু ফুলটুল আর মিষ্টি ফিষ্টি কি কি লাগে নিয়ে আসছি।
সাঈদ আমাকে সিগারেট দিলো। মোর, ইয়া লম্বা সরু কালো সিগারেট। ও শালা মাসে মাসে ব্রাণ্ড পাল্টায়। বললাম, মোর চালাচ্ছিস?
হ্যাঁ। আর দিন সাতেক চলবে।
শফিক গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলো।
সাক্ষীর অভাব নেই। কিন্তু প্রোবলেম হলো উকিলবাপ নিয়ে। বন্ধুরা কেউ এ দায়িত্বে যেতে চায়না। কিন্তু কাজীর অফিসে বিয়ে, উকিলবাপ লাগবেই।। দেখেশুনে ধলা বললো, আমিই হবো।
তারপর আমার দিকে বউর দিকে তাকিয়ে বললো, তোরা আমাকে আব্বাজান ডাকবি।
শুনে বুড়ো কাজী সাহেব সহ সবাই হো হো করে হেসে ওঠলো। ধলা বরাবর একটু জোকার ধরনের। ভাই ভাবীর সঙ্গে থাকে। ভাই কোন একটা মিলের একাউনটেন্ট। নারায়ণগঞ্জে পুরনো মডেলের একটা বিরাট বাড়ি আছে ধলাদের। ধলার সব বন্ধুরই পার্সোনাল কার আছে। ধলার দুঃখ তার একটাও গাড়ি নেই। এসব আমি জানি।
কাবিননামায় অবলীলায় আমি সই করলাম। সাক্ষীর ঘরে সই করলো পিয়া আর সাঈদ। দুজনই সাফেসিয়ান্ট। শফিক এখনো ফুলটুল নিয়ে ফেরেনি।
সব শেষে সই করলো বউ। সই করতে ওর হাতটা মৃদু কাঁপে, আমি দেখতে পাই। কাঁপবেই, মেয়েমানুষ তো।
কিন্তু সব করে বউ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। বন্ধুরা সব অবাক। কাজী সাহেব এমন দৃশ্য রেগুলার দেখেন। তার কোনো রিয়্যাকসান হয় না। আমি বউর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিই। কানের কাছে মুখ

নিয়ে ফিসফিস করে বলি, তুমি এমন করলে আমিও কিন্তু কেঁদে ফেলবো।

বাস্তবিকই আমার তখন কান্না পাচ্ছিলো। বউর কান্না দেখলে আমার কান্না পায়।

বউ আস্তেধীরে নিজেকে সামলালো। রুমালে চোখ মুছে আমার দিকে তাকালো।

কাজী সাহেব বললেন, ২৫০০১ টাকা দেনমোহরে গবর্মেন্টচার্জ ১৫০। আমি মানিব্যাগ বের করতে যাবো তার আগেই বউ একটা ৫০০ টাকার নোট বের করে কাজী সাহেবের হাতে দিলো। বাকীটা আপনার বকশিশ। বুড়ো কাজী সাহেব ফোকলা মুখে হাসেন। রাজরাণী হও মা। আমি তো থ, এতোগুলো টাকা দেয়ার দরকার ছিলো কি! তবুও বউকে কিছু বলা যায় না। আজ থেকে বউ আমার সত্যিকারের বউ।

তখুনি শফিক এলো। এক হাতে দুতোড়া ফুল, দুটো তাজা ফুলের মালা। অন্য হাতে ঢাউস একটা মরণচাঁদের প্যাকেট। দেখে ধলা কাজী সাহেবের সামনেই একপাক খেমটা নাচ নেচে ফেললো। হেভি বকশিশ পেয়ে কাজী সাহেব তো আহলাদে ৮+৮=১৬ খানা হয়েছিলেন! আমাদের সাথে গলা মিলিয়ে তিনি হাসেন। বউ মুখে আঁচল চেপে বসেছিলো। ধলা শফিকের হাত থেকে মিষ্টির বাক্সটা নিয়ে ওর হাতে দিলো, দাও মা তুমিই ভাগ করে দাও।

শুনে বউ তো লজ্জায় মরে। পিয়া একটা রামচাটি বসালো ওর মাথায়। সাঈদও গেলো মারতে। ধলা নিজেকে সেভ করতে কাজী সাহেবের পাশে গিয়ে বসলো। হাসতে হাসতে বললো, আমার দোষ কি! উকিল বাপ হলে এমনই হয়।

আবার সবাই হাসে। বউ মিষ্টির বাক্স খুলে সবাইকে মিষ্টি দেয়। আমি একটা মিষ্টির অর্ধেকটা খেয়ে বিক্রমপুর স্টাইলে বাকি অর্ধেকটা বউকে দিই। বউ আমার মুখে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসে! তারপর মিষ্টিটা খায়।

সাঈদ বললো, চল তোদের আমি চাইনিজ খাওয়াবো। এতনা বড়া একটা কাজ করলাম।

ধলা আবার একপাক নাচলো।

কিন্তু প্রোবলেম হলো বউ আর আমি কার গাড়িতে যাবো। পিয়া বললো, তোরা আমার গাড়িতে চল।

সাঈদ রেগে গেলো, খাওয়াবো আমি যাবে তোমার গাড়িতে, না!

শফিক বউর কাছে গিয়ে বললো, ভাবি আমার তো লাল টয়োটা, বর কনে লাল গাড়িতেই চলে।

আমি হাসি। পিয়া বলে, রাখ শালা আমিও লাল গাড়ি কিনবো।
শেষ পর্যন্ত সাঈদের ফোক্সওয়াগানেই যেতে হলো। সোজা ম্যাণ্ডারিন। খেতে খেতে আমাদের ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ আলোচনা চলে। পিয়া বউকে বললো, ড্যাম কেয়ার ভাবী। আমি আগামীকাল টেলিফোনে আপনার বাবাকে সব জানিয়ে দেবো।
সকালবেলা টেলিফোন করবেন।
ঠিক হ্যায়।
সাঈদ আমার দিকে তাকিয়ে বললো, আমি তোর ভাইকে জানাবো। টেলিফোনে না। অফিসে গিয়ে দেখা করবো।
ধলা বললো, কেমন করে বলবি আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। বলে, বাইরের কেউ আমাদের দেখছে না, ধলা প্রথমে পর্দা ঠেলে ঢুকলো, হাত তুলে সালাম দিলো। বড়ো বিনীত ভাব।
অভিনয় শুরু হলো
আমরা খাওয়া ফেলে অভিনয় দেখি, হাসতে হাসতে মরি!

ঘরে ঢুকে আমরা অবাক! সুন্দর করে সাজানো হয়েছে ঘরটা। কোনো ফার্নিচার নেই ঘরে! কেবল একটা ফোমের ডাবল খাট! তাতে মশারির মতন করে টাঙানো হয়েছে কাগজের ফুল। বিভিন্ন কালারের। একটা টিউব লাইট জ্বলছে। ভারি চমৎকার লাগে দেখতে। ঢাকাইয়া ফিল্মের বাসর ঘর আর কি!
রুমটা ছাদের ওপর। পুব পশ্চিমে লম্বা। দরোজা জানালা সাফেসি-য়ান্ট। সামনে রেলিং দেওয়া স্টেডিয়ামের মত ছাদ। দূরে ধলেশ্বরী দেখা যায়। অজস্র লঞ্চ, স্টিমার নৌকা। ওপাশে ডক। লঞ্চ স্টিমার ওয়েলডিং হয়, তার শাদা আলো দেখা যায়। হেভি বাতাস আছে।
বউর দিকে তাকিয়ে ধলা বললো, কি মা থাকতে পারবে তো এখানে? শুনে বউ আমার লজ্জায় মরে। আমি হাসতে হাসতে ধলার কলার চেপে ধরি। তুই যদি এমন করবি শালা তো এক্ষুণি চলে যাবো। গিয়ে দেখতো। তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে বললো, একটু মাল খাওয়াবি না দোস্ত? এতো কিছু হলো
চুপ বউ শুনলে মাইণ্ড করবে!
তুই না হয় না খেলি।
সাঈদ পিয়া ওদেরকে বল।
ওরা খাবে না। শফিক তো চলেই গেছে।
আমি একটু চুপ করে থাকি। মনে পড়ে এই ঘরে প্রথম ধলাকে আমি মাল খেতে শিখিয়েছিলাম। ধলার কি ভয় সেদিন। বারবার আমার হাত পা ধরছিলো, দোস্ত আমাকে নষ্ট করে দিবি! আমি

খুব গালাগাল করেছিলাম, কেউ কাউকে নষ্ট করতে পারে শালা! জন্মের পর থেকেই তো নষ্ট হয়ে আছো।
আমি আগেই আস্ত একটা নিপ চড়িয়ে রেখেছিলাম। মাল খেলে আমার খুব ফিলসফি আসে।
ধলার সেই প্রথম। এখন ও শালা আমার চেয়েও বড়ো মালখোর! রেগুলার চালায়। শালা আবার গান করে। ক্লাসিক্যাল।
মাল খেলে নাকি গলা খুব খোলে। আমি ধলাকে তিনটে দশ টাকার নোট দিই। ধলা চুক করে আমার গালে চুমু খায়।
বউ দাঁড়িয়েছিলো পাশে। আমি থতমত খেয়ে যাই। বউ এসব পছন্দ করে না। অন্য কেউ আমার গালে চুমু খাবে! অসম্ভব। আমার গাল কেউ ছুঁয়ে দিক এটাই বউ পছন্দ করে না। এজন্যে আমার সেলুনে সেভ করা নিষেধ।
ধলা এটা কি করলো? আমি জানি ও খুব আবেগ থেকে করেছে।
শালা এখন মাল টানবে, অর্ধেক মাতাল হয়েই গেছে। আমি বিরক্ত হয়ে বলি, এবার যা তো। টায়ার্ড লাগছে।
সাঙ্গদরা চলে গেছে অনেকক্ষণ। এখন রাত দশটা। আমরা ডিনার সেরেছি সাড়ে আটটার দিকে।
আমাদের দুজনকে গুডনাইট জানিয়ে ধলা চলে গেলো। আমি ওর পিছু পিছু গিয়ে ছাদে ওঠার দরোজাটা বন্ধ করে দিলাম।
ঘরে এসে দেখি বউ মুখ গোমরা করে আছে। আমাকে দেখে বললো, যাও মুখ ধুয়ে এসো।
আমি কথা না বলে এটাচড্ বাথরুমে ঢুকে ভালো করে মুখ ধুই। আজ থেকে নতুন করে সব শুরু করতে হবে। অনেক কিছু পেছনে ফেলে এলাম। মুখ ধুতে ধুতে আমি আয়নায় নিজেকে দেখি। হাসি। সাবাস মিয়া, সাবাস।
হাতমুখ মুছে বাথরুম থেকে বেরুই। ঘরে এসে দেখি বউ লাইট অফ করে দিয়েছে। আকাশে পেল্লায় চাঁদ উঠেছে খেয়াল করিনি তো। জানালা দিয়ে শাদা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। বউ আমার জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াই। বউ আমার দিকে ঘোরে। অপলক তাকিয়ে থাকে। আমিও তাকাই। কেউ কোনো কথা বলি না। আমি আস্তে করে বউর কাঁধে একটা হাত রাখি। বউ আমার দিকে সরে আসে। তারপর দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। আমার ঠোঁটে চুমু খেতে থাকে। আ কি সুখ। আমি পাগল হয়ে যাই। দুহাতে বউকে বুকে চেপে ধরি। দূর আকাশে বসে পুরনো চাঁদ দেখে পৃথিবীতে এইমাত্র একজোড়া মানব মানবী চমৎকার একটা যুদ্ধে নামলো। ১৯৭৭

তোমাকে ভালোবাসি

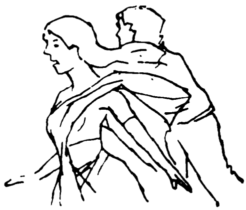

আমার বন্ধু ওমরের সঙ্গে সখী পালিয়ে গেছে। অনেকদিন আগের কথা। ওরা এখন কোথায় আছে, কিভাবে আছে আমি কিছু জানি না। সখী আমার পুরনো স্মৃতি। বুকের ভেতরে চাপা পড়ে আছে। তবুও, কখনো কখনো সখীর কথা আমার মনে পড়ে। খুব মনে পড়ে। বুকের খুব ভেতরে মৃদু একটা ব্যথা টের পাই। যেদিন সখীর কথা আমার মনে পড়ে, সেদিন সারাটা দিন, সারাটা রাত আমার খুব কষ্টে কাটে। মনটা বিষন্ন হয়ে থাকে। বাসায় থাকলে মা বাবা ভাই বোনদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। খেতে বসলে আধপেটা খেয়ে উঠে যাই। অফিসে কলিগদের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে না। কাজ করতে করতে আনমনা হয়ে যাই। কাজে ঘন ঘন ভুল হয়। বসের ইংরেজি বকুনী খাই। রাতের বেলা অন্ধকার বিছানায় শুয়ে থাকি। ঘুম আসে না। ঘন ঘন সিগ্রেট খাই, পানি খাই! এসবই ভালোবাসার কষ্ট!

সখীকে আমি খুব ভালোবাসতাম! খুব ভালোবাসতাম। সখী আমাকে ভালোবাসতো কিনা জানি না। আমি বাসতাম। অন্যান্য প্রেমিকদের মতো আমি সখীকে কখনো বলতে পারিনি, সখী তোমাকে ভালোবাসি। তবে সখী জেনে গিয়েছিলো, সখীকে আমি ভালোবাসি। কেমন করে জেনেছিলো জানি না। প্রেমকাতর পুরুষদের আচরণ, কথা বলা এবং চোখ দেখে মেয়েরা সব বুঝতে পারে। সখীও বুঝে গিয়েছিলো। বুঝে বোধহয় সে খুব মজা পেয়েছিলো। সখীর সঙ্গে কোথাও দেখা হয়ে গেলে কিংবা সখীদের বাড়ি গেলেই সখী আমার পেছনে উঠে পড়ে লাগতো! এটা করতো ওটা করতো। ঠাট্টা ইয়ার্কীর ছলে কথার খোঁচা মারতো। সব সয়ে নিরীহ গোবেচারা, প্রেমকাতর চোখে আমি সখীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম! ওরকম তাকিয়ে থাকলে সখী যে কেন রেগে যেতো! বলতো, অমন ক্যাবলাকান্তের মতো তাকিয়ে থাকো কেন! বিচ্ছিরি লাগে।

আমি থতমত খেয়ে, কেলানো একটা হাসি দিয়ে বলতাম, সখি তুমি খুব সুন্দর।

তা আমি জানি। তবে তুমি দেখতে মোটেই সুন্দর নও। সুন্দর

দেখতে তোমাদের বন্ধু ওমর। টল, হ্যান্ডসাম। কি সুন্দর করে কথা বলে। ওমরকে আমার খুব ভালো লাগে।

শুনে আমার বুক ফেটে যেতো। বাস্তবিকই আমি দেখতে সুন্দর নই। রোগা টিংটিংয়ে শরীর। মুখটা ভাঙাচোরা। ছেলেবেলা থেকেই চোখ খারাপ। মোটালেন্সের চশমা পরি। হাত পাগুলো সরু ডালপালার মতো। মাথায় পাতলা চুল। একটু হাঁপানির দোষ আছে। হাঁপানি বন্ধ করার জন্য ছেলেবেলায় কোন পীরের কাছ থেকে মা একটা মাদুলী নিয়ে দিয়েছিলো। সেটা গলায় বাঁধা আছে। ছাত্রজীবনে কালো কাইতানের সঙ্গে গলায় ঝুলতো মাদুলীটা। দেখতে জঘন্য লাগতো। কোনো উপায় নেই। পীরের আদেশ, মায়ের আদেশ সারাজীবন মাদুলীটা গলায় রাখতে হবে। কিন্তু মাদুলীতে আমার কোনো উপকার হয়নি। জিনিশটা তবুও সঙ্গে আছে। অভ্যেস হয়ে গেছে।

ছাত্রজীবনে মাদুলীটা নিয়ে বন্ধুরা আমাকে খুব ক্ষেপাতো। নববর্ষের খেতাব হিসেবে ডিপার্টমেন্টের ছেলেমেয়েরা একবার আমার নাম দিয়েছিলো 'মাদলী হিরো'। লজ্জায় আমি কয়েক দিন ক্লাসে যেতে পারিনি।

চাকরীতে ঢুকে প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই মাদুলীটার সংস্কার করেছি আমি। সোনার পাতলা একটা চেন কিনে তাতে মাদুলীটা ঝুলিয়েছি। চেনটা একটু লম্বা বলে মাদুলীটা থাকে শার্টের ভেতর। বুকের কাছে। কিন্তু হাঁপানিটা যায়নি। একটু ঠান্ডা লাগলেই তিনচার দিন কষ্ট পাই। ঠাণ্ডা বাঁচিয়ে চলতে হয়। ফ্রিজের পানি খেতে পারি না, বৃষ্টিতে একটু ভিজতে পারি না। অল্প শীতে যেখানে আমার বয়সী লোকেরা শার্ট গেঞ্জি পরে ঘুরে বেড়ায় সেখানে আমার পরতে হয় ফুলহাতা জাম্পার। স্যাণ্ডেল সুর সঙ্গে পড়তে হয় মোজা, গলায় মাফলার। এই পরাধীনতা আমার অভ্যেস হয়ে গেছে।

শুনেছি হাঁপানি রোগীদের স্বাস্হ্য কখনো ভালো হয় না। আমারও হয়নি। আজন্ম একই রকম থাকতে হবে। আমার কোনো উপায় নেই। তবে আমার বন্ধুদের সবারই স্বাস্থ্য ভালো। সখীর ভাই সারোয়ার তো পালোয়ান। আগে রেগুলার ব্যায়াম করতো। বিলু পাভেল কাজল ওদের স্বাস্থ্যও ভালো। আর ওমরের তো কথাই নেই। ছ ফিটের কাছাকাছি লম্বা। গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা। বুকের মাপ ছত্রিশ ইঞ্চি। হাত পাগুলো নাদুসনুদুস। মাথায় ঘন কোঁকড়ানো চুল। গোলগাল মুখ। ক্লিন সেভ করে ওমর। চালচলনে ওমর একেবারে ফিল্মের নায়কদের মতো স্মার্ট। সাহেবদের মতো তরতরিয়ে ইংরেজি বলে। বন্ধু হয়েও মনে মনে ওমরকে আমি খুব ঈর্ষা করতাম। আহা। আমি যদি ওমরের মতো হতাম দেখতে।

ওমর খুব স্পিডি ছেলে। অস্থির প্রকৃতির। বেশিক্ষণ একসঙ্গে কোথাও কাটাতে পারতো না। মস্ত এক মোটর সাইকেল দাবড়ে বেড়াতো। এই আছে এই নেই ওমর। আমাদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে হঠাৎই মোটর সাইকেল স্টার্ট দিয়ে হাওয়া হয়ে যেতো।

সখীর সঙ্গে ওমরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম আমিই। দিনটির কথা আমার খুব মনে আছে। বিকেলবেলা সখীদের বাড়ি আমি গেছি সারোয়ারের সঙ্গে আড্ডা দিতে। সারোয়ার বাড়ি ছিলো না। সখীর সঙ্গে ছাদে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম আমি। গল্প মানে দুএকটি টুকরো কথা বলা আর সখীর দিকে ক্যাবলাকান্ত চোখে তাকিয়ে থাকা।

সখী খানিক কথার খোঁচাখুঁচি চালিয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলো, তুমি যে অমন করে যখন তখন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকো, তোমার ব্যাপারটা কি!

আমি থতমত খেয়ে বলেছিলাম, ব্যাপার আবার কি! এমনিতেই তাকিয়ে থাকি। তুমি তো খুব সুন্দর, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি।

শুনে খিল খিল করে হেসে ওঠে সখী। তারপর হাসতেই থাকে, হাসতেই থাকে। হাসির চোটে খুলে খুলে যায়। সখী দেখতে এতো সুন্দর, কি বলবো! সখীর বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব! শুধু এইটুকু বলা যায় সখী হেঁটে গেলে চারদিকের পৃথিবীতে সাড়া পড়ে যায়। বৃক্ষেরা নত হয়ে কুর্ণিস করে। ফুলেরা তীব্র গন্ধ ছড়িয়ে দেয়। কোলাহল বন্ধ করে কর্কস পাখিগুলোও ধরে মিষ্টি সুরের গান। সমুদ্র কিংবা নদী স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রেমিকার চুমুর মতো হাওয়া বয়! সখী মন খারাপ করলে স্বচ্ছ নীল আকাশে জমে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। সখী হাসলে পুরো শতাব্দী আলোকিত হয়ে যায়।

হাসতে হাসতে সখী সেদিন বলেছিলো, তুমি খুব ছেলেমানুষ!

কথাটার মানে আমি বুঝতে পারিনি। আনমনা হয়ে ভেবেছি সখী আমাকে ছেলেমানুষ বলছে কেন! আমি তো ছেলেমানুষ নই। তবে খুব সরল মানুষ। আমি জটিলতা একদম বুঝতে পারি না। চালাকি বুঝতে পারি না। আমি মানুষের সারল্যে বিশ্বাসী।

এসব যখন ভাবছি তখুনি সখীদের গেটে এসে থামে বিশাল এক মোটর সাইকেল। কে যেন চেঁচিয়ে সারোয়ারের নাম ধরে ডাকে। সেই ডাকে সখী এবং আমি দুজনেই নিচে তাকিয়েছিলাম।

সখী মুগ্ধ গলায় বললো, ছেলেটি কে? ভারি হ্যাণ্ডসাম তো!

আমি অবাক হয়ে বললাম, ও ওমর। তুমি চেনো না। আমাদের বন্ধু।

তাই নাকি, কখনো দেখিনি তো।

কেন তোমাদের বাসায় ও কখনো আসেনি?

এলেও আমি দেখিনি। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও না।

চলো।

তারপর ছাদ থেকে চেঁচিয়ে আমি ওমরকে বললাম, সারোয়ার বাড়ি নেই। দাঁড়া আমি আসছি।

নিচে এসে সখীর সঙ্গে ওমরের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। পরিচয়ের মুহূর্তে দুজন দুজনের দিকে এমন করে তাকিয়েছিলো, দেখে আমার বুকের ভেতরটা একটুখানি কেঁপে উঠেছিলো। এবং সেই প্রথম আমি বুঝতে পারি ওমরের মতো ছেলেদের পৃথিবীর যাবতীয় মেয়েরাই খুব পছন্দ করে।

সখীও ওমরকে পছন্দ করেছিলো। সখীদের বাড়ি কখনো খুব একটা যাওয়া হতো না আমার। সপ্তাহে দুসপ্তাহে এক আধদিন। তাও ছুটির দিনে। সপ্তাহে ঐ একটা দিনই হাতে কিছুটা সময় পাই। বাকি দিনগুলো অফিসে। আমার চাকরিটা বেশ ঝামেলার। অফিস থেকে ফিরে এতো ক্লান্ত হই, কোথাও যাওয়ার এনার্জি থাকে না।

তো সখীর সঙ্গে ওমরের পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর মে মাসের বিকেলে সখীদের বাড়ি গিয়ে আমি খুব অবাক হয়েছিলাম। সখী নাকি ওমরের সঙ্গে কোথায় বেড়াতে গেছে। সকালবেলা গেছে কখন ফিরবে তার ঠিক নেই। শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেমন করে। তাহলে কি ওদের দুজনের হয়ে গেছে! হায়!

সখীদের বাড়ির কারো সঙ্গে কথা না বলেই আমি বেরিয়ে আসি। গেটের কাছে এসেছি ঠিক তখুনি একটা মোটর সাইকেলের ভটভট শব্দ পাই। এবং মুহূর্তে আমার কাছে এসে থামে ওমরের মোটর সাইকেল। অবাক হয়ে দেখি মোটর সাইকেলের ওপর ওমরের কোমর জড়িয়ে সখী বসে আছে।

দৃশ্যটা আমার সহ্য হয় না।

আমাকে দেখেই হৈ হৈ করে ওঠে ওমর। আরে শালা, তুই!

সখী হেসে জিজ্ঞেস করে, কেমন আছো?

আমি সখীর কথার জবাব দিই না। ওমরের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসি। যাই, একটু কাজ আছে।

তারপর সোজা চলে আসি। পেছনে সখী আর ওমর একসঙ্গে হেসে ওঠে। ভারি একটা লজ্জা হয় আমার।

সেই সখীর সাথে শেষ দেখা আমার। ওমরের সঙ্গে শেষ দেখা। আমি আর কখনো সখীদের বাড়ি যাইনি। অনেক পরে শুনেছি সখী ওমরের সঙ্গে পালিয়ে গেছে।

কিন্তু সখী কেন পালালো?

যতোদূর মনে হয় সখীর মা বাবাও চেয়েছিলো ওমরের সঙ্গে সখীর বিয়ে হোক। ওমরের মা বাবাও চেয়েছিলেন সখীর সঙ্গে ওমরের বিয়ে হোক। তাহলে ওরা কেন পালালো। এডভেঞ্চার!

ব্যাপারটা আমাকে খুব ভাবিয়ে তোলে। সখীকে তারপর থেকে আমার খুব মনে পড়তে থাকে। খুব। অফিসে কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে আমি আনমনা হয়ে যাই। সহজ কাজগুলোতেও যা তা রকমের ভুল হয়। বস একদিন বিরক্ত হয়ে আমাকে বললেন, আপনি বোধহয় অসুস্থ। মাসখানেক রেস্ট নিন।

আমি পুরো এক মাসের ছুটি নিই।

সেই একটা মাস আমি আর বাড়ি থেকে বেরুইনি। নিজের রুমে একাকী শুয়ে থেকেছি। হাঁপানীর জন্যে সিগারেট খাওয়া নিষেধ আমার। তাও যখন তখন কাজের ছেলেটাকে দোকানে পাঠিয়ে সিগারেট আনিয়েছি। অনবরত সিগারেট খেয়ে গেছি, চা খেয়ে গেছি। রাতে ভালো ঘুম হতো না আমার। অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখতাম। বেশির ভাগ স্বপ্নই সখীকে নিয়ে। কখনো দেখি অস্পষ্ট কুয়াশার ভেতর দিয়ে একটা মোটর সাইকেল অবিরাম চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে। তার মৃদু ভটভট একটা শব্দও পেতাম। কখনো জেগে জেগেও শব্দটা কানে আসতো আমার। বুঝতে পারছিলাম মানসিক দিক দিয়ে আমি খুব দুর্বল হয়ে পড়েছি। স্নায়ুর দুর্বলতা থেকে স্বপ্ন দেখে মানুষ।

কিন্তু আমার কিছু করার ছিলো না। সখীর কথা না ভেবে আমার উপায় ছিলো না।

সখী পালিয়ে গেছে সেই কবে। ব্যাপারটা এখন হারিয়ে যাওয়া শৈশবের মতো। তবুও শৈশব স্মৃতি যেমন মানুষের বুক জুড়ে রয়ে যায়, সখী তেমন করেই আমার বুক জুড়ে রয়ে গেছে। সখীকে মনে পড়লেই বুকের ভেতর মৃদু একটা ব্যথা হয়। আর একটা স্বপ্ন প্রায়ই দেখি, নীল অথই এক সমুদ্র, আকাশের প্রতিবিম্ব বুকে ধরে বয়ে যাচ্ছে। দূরে বহু দূরে দৃষ্টিসীমার বাইরে একটা জাহাজের অস্পষ্ট ধোঁয়ার রেখা। জাহাজের ভেঁপু বাজে। স্বপ্নের ভেতর দূরাগত সেই ভেঁপুর শব্দ আমার কানে আসে। আর আসে একটা সমুদ্র পাখির করুণ কান্না। দেখতে পাই জাহাজের ধোঁয়ার রেখা ধরে একটা সীগাল একাকী উড়ে যায়। উড়ে যায়।

স্বপ্নটার মানে কি!

আমি কি ওই দুঃখি সীগালটির মতো এখনো সখীর পেছনে রয়েছি! অথবা সখী কি আমার পুরনো রোগ হাঁপানীর মতো এখনো আমার বুকের ভেতর রয়ে গেছে! চিরকাল থাকবে! এসব মনে হলেই বুকের

কাছে লেগে থাকা মাদুলীটা ডান হাতের মুঠোয় চেপে ধরি। মনে মনে বলি, সখী তোমাকে আমি এখনো ভালোবাসি। খুব ভালোবাসি।

১৯৭৫

দিন আমাদের

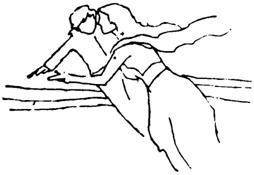

দূরে ঝিরঝিরে একটা নদী। রূপোলী ফিতের মতো। চিরল। রোদে ঝিলমিল করে নদী। নদীর নাম কি? ঘুম নদী! এপার ওপার জুড়ে ধু ধু বালিয়াড়ি তার। কোথাও কোনো শব্দ নেই, মানুষ নেই। একটা পাখিও না। পারে ছোট্ট একটা ডিঙি নাও, খানিকটা চরার ওপর টেনে তোলা। আমি আর কোয়েল হাত ধরাধরি করে সেই নাওটার দিকে হেঁটে যাই। হাওয়ায় আমার চুল ওড়ে, কোয়েলের আঁচলও। আমরা কেউ খেয়াল করি না। বালিয়াড়ি ভেঙে হেঁটে যাই, হেঁটে যাই। নাওটা যেনো আমাদের জন্যই অপেক্ষা করে। চড়লেই ওপারে পৌঁছে দেবে।

এই স্বপ্নটা আমি দেখি ভোররাতে। দেখেই ঘুম ভাঙে। তখন বাইরে প্রবল বৃষ্টি। টিনের চালে ঝমঝম শব্দ। বৃষ্টির শব্দই কি আমাকে সুন্দর স্বপ্ন থেকে ফিরিয়ে আনে? নৌকায় চড়লে কি হতো? কোথায় যেতাম? স্বপ্নের শেষটা দেখতে আমার ভীষণ লোভ হয়। কোয়েল আমার হাত ধরেছিলো। নৌকোয় চড়েও কি ধরে রাখতো? ওপারে পৌঁছে কোয়েল আমাকে কি বলতো? কোয়েল কি রংয়ের শাড়ি পরেছিলো? কিছুই দেখা হলো না, শোনা হলো না কোয়েলের কথা। মন খারাপ হয়ে যায়। ঘুমিয়ে পড়ি।

ঘুম ভাঙে ঠিক আটটায়। মাথার কাছে ছোট টেবিলের ওপর ঘড়ি। দেখে বিছানায় উঠে বসি। বাইরে তখনো বৃষ্টি। ভোররাতের মতোই। একটুও থামেনি। আবার মন খারাপ হয়ে যায়। বৃষ্টি যদি আজ না থামে! ইস, তাহলে পাগল হয়ে যাবো। কোয়েলের সঙ্গে আজ আমার হোলডে প্রোগ্রাম। ঠিক দশটায় কোয়েল আসবে। দুদিন আগে কোয়েল আমায় চিঠি লিখে জানিয়েছে আমি যেনো দশটার দুপাঁচ মিনিট আগেই রমনা রেস্টুরেন্টে পৌঁছে যাই। কোয়েল আসবে কাঁটায় কাঁটায় দশটায়। আমি কোয়েলকে বলেছিলাম, তোমাকে সোনারগাঁ নিয়ে যাবো। শুনে কোয়েল খুব খুশি। ও কখনো ঢাকার বাইরে যায়নি।

কোয়েল চিঠি লিখেছিলো; আমরা কিন্তু সোনারগাঁ যাবো। রেডি থেকো।
আমি তো রেডিই। কোয়েলকে নিয়ে একা কোথাও বেড়াতে যাবো, আহা তার মতো সুখ কোথা আছে!

কিন্তু বৃষ্টি দেখে আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। সত্যি বলতে কি, কান্না পায়। বৃষ্টি না থামলে কোয়েল বাড়ি থেকেই বেরুবে না। মা ওকে বেরুতে দেবে না। ওর মা খুব কড়া। যা বলবে কোয়েলকে তা শুনতে হবে। মাকে খুব ভয় কোয়েলের। কোয়েলের সঙ্গে বাড়ি গিয়ে কেউ দেখা করতে পারে না। কোয়েলকে টেলিফোন করলে মা কখনো ডেকে দেবে না। একদিন টেলিফোন করে আমি গাধা হয়ে গিয়েছিলাম। ওর মা ধরে বললেন, কাকে চাই?

কোয়েলকে।

আপনি কে?

কোয়েলের সঙ্গে পড়ি।

কথাটা বানোয়াট নয়। আমি কোয়েলের সঙ্গেই পড়ি। সত্যি কথাটা বলি, ওর মা কিছু মাইণ্ড করবে না ভেবে। কিন্তু কাজ হলো না। ভদ্রমহিলা স্ট্রেট বললেন, কোয়েল এখন কথা বলবে না।

টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন।

মনে আছে আমি পুরো দুমিনিট টেলিফোনে কান লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। পাবলিক কল থেকে টেলিফোন। ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একজন বললো, একটু তাড়াতাড়ি করুন ভাই।

শুনে আমি থতমত খেয়ে টেলিফোন নামিয়ে রাখি। তারপর একটা আধুলি ছুঁড়ে দিয়ে ফিরে যাই। পরে কোয়েলকে কথাটা বলায় কোয়েল খুব দুঃখ পেয়েছিলো।

তারপর থেকেই আমাদের চিঠি লেখালেখি। চার মাইলের ব্যবধানে কোয়েল আর আমি থাকি। সকালবেলা পোস্ট করলে বিকেলবেলা চিঠি পৌঁছে যায়। নো প্রোবলেম। কিন্তু একটা অসুবিধা আছে, চিঠির ওপরে কোয়েলের নাম ঠিকানা লিখতে হবে মেয়েলি কায়দায়। হইতে—যে কোনো একটি মেয়ের নাম। নয়তো চিঠি ওর মা খুলে পড়বেন। আমার বাসায় ওরকম কোনো প্রোবলেম নেই। আমার কাছে যে কোনো মেয়ে চিঠি লিখতে পারে। সরাসরি বাসায় এসে একা আমার রুমে বসে কথা বলতে পারে। মা চা বিসকিটও খাওয়াবে। বললেই হবে, মা ও আমার বন্ধু।

কিন্তু মেয়েলি কায়দায় নাম ঠিকানা বেশ ঝামেলার ব্যাপার। আমি হাজারো চেষ্টা করে পারি না। মাকে বলবো লিখে দিতে? বললে মা হয়তো রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু আমার লজ্জা করে।

কি করি! কি করি!

শেষমেষ আমার খালাতো বোন নিমমিকে দিয়ে এক বিকেলে দশটা খামের ওপরে কোয়েলের নামঠিকানা লিখিয়ে আনি। নিমমি খুশি হয়ে কাজটা করে। নিমমিদের বাসায় আমি খুব কম যাই। নিমমির ওপর একটা কথায় আমি খুব রেগেছিলাম। সে অনেককাল আগের কথা। একদিন হঠাৎ করে নিমমিদের বাসায় গেছি, নিমমির রুমে ঢুকতেই নিমমি আমাকে বললো, কি ব্যাপার?

শুনে আমি ভ্যাবলা হয়ে গেলাম। আমাকে দেখে নিমমি কি খুশি হয়নি! তাহলে! কি ব্যাপার মানে?

আমার সেন্টিমেন্টে লাগে। খালার সঙ্গে দেখা না করেই চলে আসি। তারপর অনেককাল যাই না। বছরখানেক পর এই ছোট্ট কাজটা নিয়ে গেলে নিমমি খুশি হয়ে করে দেয়। প্রোবলেমটা নিমমি বোঝে। কথা থাকে দশটা খাম শেষ হলে আবার খাম নিয়ে আসবো, নিমমি আবার লিখে দেবে। আ, নিমমির ওপর আমি যে কি খুশি হই। সব ভুলে নিমমির সঙ্গে আবার।

তারপর থেকে কোয়েলকে আমি সপ্তাহে দুটো করে চিঠি লিখি। কোয়েলও আমাকে। দুদিন আগে কোয়েলের শেষ চিঠি পাই। আজ ঠিক দশটায় রমনা রেস্টুরেন্টে কোয়েল আসবে। আমরা সোনারগাঁ যাবো। কিন্তু হায়, আজ সকাল থেকেই বৃষ্টি।

দশটার ক মিনিট আগে বৃষ্টিটা একটু ধরে। পুরোপুরি কমে না। ঝিরঝির করে পড়ছেই। তো আগের চেয়ে খানিকটা হালকা হয়ে। আকাশ ঠিক আগের মতোই। মেঘের পর মেঘ ভেসে যাচ্ছে। দেখে বোঝা যায় বৃষ্টিরও আজ হোলডে প্রোগ্রাম।

কিন্তু বৃষ্টিটা একটু ধরতেই আমার কেন যে মনে হয় কোয়েল এই ফাঁকে ঠিক চলে আসবে। মাকে বোঝাবে সামনে আমার পরীক্ষা। সারাদিন লাইব্রেরী ওয়াক করতে হবে।

মা তাহলে আর কোনো কথা বলবে না। লেখাপড়ার প্রতি ওদের মোহ ভয়ানক। কোয়েল এই চান্সটা নেয়।

এসব মনে হতেই আমি আর এক মিনিটও লেট করি না। জিনসের প্যান্ট আর হালকা খয়েরী রংয়ের শার্ট পরে, পায়ে বাটার স্যাণ্ডেল, মানিব্যাগ, হেয়ার ব্রাস সব নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। কোয়েল নিশ্চয় আসবে। এখন একটা স্কুটার পেলেই হয়। কিন্তু মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়েও পাই না। বৃষ্টিতে ভিজতে থাকি। আর কি যে খারাপ লাগে! কোয়েল যদি এসে দাঁড়িয়ে থাকে! কিংবা আমার দেরি দেখে যদি চলে যায়! ইস্ তাহলে যে কি হবে! কোয়েল আর কখনো আমার সঙ্গে দেখাই করবে না। চিঠিও লিখবে না। কখনো দেখা হলেও কথা বলবে না। কোয়েল ভীষণ অভিমানী।

শেষমেষ আমি একটা রিকশা নিই। রিকশা অবশ্য টাইম নেবে বেশি। হোক। কি আর করা। পৌঁছে তো যাবে এক সময়। আর কোয়েল যদি দয়া করে একটু অপেক্ষা করে। ও জানে আমি যাবো, ওকে কথা দিয়ে আমি না গিয়ে পারি না। আগে একদিন কোয়েল এর প্রমাণ পেয়েছে। সেদিন দশটার কথা বলে কোয়েল এসেছিলো সাড়ে এগারোটায়। আমি ঠিকই দশটায় গেছি। গিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছি। সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে ফিল্টারগুলো সব জমিয়ে রেখেছিলাম। কোয়েল দেখে বলবে, ইস তোমাকে খুব কষ্ট দিলাম। শুনে আমি হাসি। বলি, কষ্ট কি! তোমার জন্যে এভাবে আমি সারাজীবন ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

শুনে কোয়েল খুব খুশি।

রিকশায় বসে এসব মনে হয়। পরে নিশ্চিত হয়ে ভাবি, বাড়ি থেকে বেরুতে পারলে কোয়েল নিশ্চয় অপেক্ষা করবে। ও কি আমার অপেক্ষার কথা ভুলে গেছে!

রমনা রেস্টুরেন্টের কাছাকাছি পৌঁছে দূর থেকে দেখি হুড তোলা একটা রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। রিকশাঅলাটা দূরে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে দেখে আমার বুকের ভেতর একটা জলের গ্লাস কেঁপে ওঠে। রিকশায় কোয়েল বসে নেই তো!

রিকশাঅলাকে বলি, তাড়াতাড়ি চালাও। আসলে আমি তখন বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছি। কোয়েল যদি এসে বসে থাকে, আমার লেট দেখে তাহলে বেশ রেগে আছে। কোয়েলকে গিয়ে আমি এখন কি বলবো! মনে মনে একটা রিহার্সেল দিয়ে নিই। তুমি আসবে আমি ভাবতেই পারিনি কোয়েল। বৃষ্টি মাথায় করে তুমি তাহলে এলে? কথাটা বলবো একটু অভিনয় করে। শুনে কোয়েল যাতে রাগ না করতে পারে।

হুডতোলা রিকশাটার কাছাকাছি আসতেই কোয়েল ডাকলো, এই।

শুনেই আমি রিকশা থেকে লাফিয়ে নামি। রিকশা ভাড়া মিটিয়ে কোয়েলের কাছে যেতে ত্রিশ সেকেণ্ড লাগে। আমাকে দেখে কোয়েলের রিকশাঅলাটা সিগারেট ফেলে এগিয়ে আসে। আমি কোয়েলকে বলি, আমার একটু লেট হয়ে গেছে। তুমি কখন এসেছো?

খানিক আগে যে রিহার্সেল দিয়েছিলাম কোয়েলকে দেখে তা ভুলে যাই। কোয়েল ভারি গলায় বললো, ওঠো।

আমি রিকশায় কোয়েলের পাশে বসি। রিকশা চলতে থাকে। কোয়েল কোনো কথা বলে না। আমি বুঝতে পারি, কোয়েল খুব রেগে গেছে। কোয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি, কোয়েল অন্যদিকে তাকিয়ে। মুখভার। কোয়েলের কোলের ওপর অবহেলায় ধরা শাদা ভ্যানিটি ব্যাগ। কোয়েল পরছে নীল জর্জেট। প্রিন্টের। নীলের ওপর লাল ফুল

আঁকা। ভারি সুন্দর। কোয়েলকে খুব মানিয়েছে। ভোররাতে দেখা স্বপ্নে কোয়েল কি এই শাড়িটাই পরে ছিলো!

আমি মৃদু হেসে বলি, কথা বলবে না?

কোয়েল কথা বলে না।

আমি আবার বলি, কি হলো?

কোয়েল এবার আমার দিকে তাকায়। তুমি দেরি করলে কেন?

বৃষ্টি হচ্ছিলো। আমি ভাবলাম তুমি বোধ হয় আসবে না।

তাহলে তুমি এলে কেন!

আমি হেসে বলি, পৌনে দশটার দিকে বৃষ্টিটা একটু থামে, দেখে মনে হয়েছিলো তুমি আসতেও পারো।

কোয়েল আগের মতোই মুখ ভার করে রাখে। বলে, তুমি তো আর আমাকে আসতে বলোনি। আমিই চিঠি লিখে তোমাকে আসতে বলেছি। মা কাল পাবনা গেছে।

কোয়েলের কথা শেষ না হতেই ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়। রিকশাঅলা সবুজ রংয়ের পর্দা এগিয়ে দেয়। আমি যত্ন করে পর্দা ধরে বসি। তবুও বৃষ্টির ছাট আসে। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলি, কি যে বৃষ্টি শুরু হলো! তারপর কোয়েলের দিকে তাকাই। কোয়েল এখনও মুখ গোমরা করে! আমি বাঁ হাতে কোয়েলের একটা হাত ধরি, মাফ করে দাও।

কোয়েল হেসে ফেলে। দেখে আমি শ্বাস ফেলে বাঁচি। বলি, কোয়েল তুমি কখন এসেছো?

পৌনে দশটায়। এসে তোমাকে না দেখে ভাবি রেস্টুরেন্টের ভেতর বসে আছো। রিকশা রেখে ভেতরে যাই। তোমার পাত্তা নেই। দুতিনটে লোক বসে। আমাকে দেখেই তাকিয়ে থাকলো। মাগো, আমি লজ্জায় মরি। ম্যানেজার বললো, বসুন ম্যাডাম। শুনে আমার গাটা জ্বলে গেলো। ওরা আমাকে নিশ্চয় খারাপ মেয়ে ভেবেছে। নয় তো এই বৃষ্টি বাদলায় কে আসে এমন জায়গায়!

আমি কোনো কথা বলি না। কোয়েলের দিকে তাকিয়ে থাকি। কোয়েলকে আজ দারুণ সুন্দর লাগছে। এমনিতে কোয়েল যা সুন্দর, তারচে অনেক বেশি।

কোয়েল বললো, আর পাঁচ মিনিট দেখে আমি চলে যেতাম।

তাহলে আমার খুব কষ্ট হতো।

আমার বুঝি খুব ভালো লাগতো? আমি বাসায় গিয়ে সারাদিন ঠিক কাঁদতাম।

আমি কোয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসি। তারপর বলি, কোথায় যাবো?

তুমি না বলেছিলে সোনারগাঁ যাবে! সেখানেই চলো না!

এই ওয়েদারে?

কি হবে! স্কুটার নিয়ে চলে যাবো।

আজ না গেলে হয় না?

না। আমি কদিন ধরে ভাবছি সোনারগাঁ যাবো। না যাওয়া হলে আমার খুব কষ্ট হবে।

বৃষ্টি যে?

বৃষ্টি থেমে যাবে।

আসলে বৃষ্টি থামার কোনো চান্স নেই। আকাশ দারুণ মেঘলা। বৃষ্টি হয়তোবা বেড়ে যাবে আরো। আর সোনারগাঁ গ্রামের মতো জায়গা। ঢাকা থেকে দূরও বেশ। একটা সুন্দরী মেয়ে নিয়ে অতোদূর চলে যাওয়া! কতো রকমের বিপদআপদ হতে পারে। অবশ্য সোনারগাঁ মিউজিয়ামে আমার এক বন্ধু চাকরি করে। ওকে পাওয়া গেলে নো প্রোবলেম। ওর কোয়ার্টার আছে ওখানে। কিন্তু ওকে যদি না পাওয়া যায়!

এসব কথা কোয়েলকে বলা যাবে না। কোয়েল তাহলে ভাববে আমি আসলে যেতে চাইছি না। খুব রেগে যাবে।

কি করি? বৃষ্টির থামার লক্ষণ নেই। গুলিস্তান স্কুটার স্ট্যাণ্ডে আসতে আসতে আমরা দুজনেই বেশ ভিজে যাই। আমি কোয়েলের মুখের দিকে তাকাই। বৃষ্টিফৃষ্টি কোয়েল গ্রাহ্য করছে না। ওর মুখ দেখে বোঝা যায়, ও আজ যাবেই। আমি আর কি করি! স্কুটার খুঁজতে থাকি। যে স্কুটারে যাবো সেটা নিয়েই বিকেলবেলা ফিরে আসবো। ফেরার পথে যদি স্কুটার না পাওয়া যায়!

রিকশায় বসেই আমরা স্কুটার খুঁজতে থাকি। কোয়েল আমি দুজনেই। অনেকক্ষণ ঘুরে একটা ঠিক হয়। লোকটার বাড়ি সোনারগাঁই। এখন আমাদের নিয়ে যাবে, আবার বিকেলবেলা নিয়ে আসবে। ভাড়া আশি টাকা। এতগুলো টাকা শুধু স্কুটার ভাড়া! আমার একটু কষ্ট হয়। তবুও কোয়েলের জন্যে আমি সব পারি।

স্কুটারে চড়ে কোয়েল খুব খুশি। বললো, আমার যে কি ভালো লাগছে!

আমি কোনো কথা না বলে আকাশ দেখছিলাম, বৃষ্টি দেখছিলাম। সোনারগাঁ গিয়ে ইকবালকে না পেলে অসুবিধা হবে। রোদ থাকলে ঘুরেটুরে কাটানো যেতো। আজ তো তাও নেই। ঘরে বসে থাকা ছাড়া কোনো উপায় নেই। ঘরে বসে থাকলেও জমবে। কোয়েল আছে সঙ্গে। কিন্তু ইকবাল না থাকলে ঘর পাবো কোথায়!

বৃষ্টিটা তখনো হয়ে যাচ্ছিলো। সমানে। স্কুটার খোলা রাস্তায় পড়লে

বৃষ্টির ছাট আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছিলো। বৃষ্টি আর স্কুটারের মিশেল শব্দে কথা বলা যায় না। কোয়েল আর আমি দুজনেই খুব নিচু স্কেলে কথা বলি। বরাবরই। এজন্যে স্কুটারে চড়লে কখনো আমরা দুজন খুব বেশি কথা বলি না। কেবল দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকি। হাসি। কোয়েল কথায় কথায় হাসে। কখনো অকারণে। এজন্যে তো কোয়েলকে আমার এতো ভালো লাগে। কোয়েলের সঙ্গে আমার পরিচয়ই তো হাসতে হাসতে। আমরা এক ক্লাসে পড়ি। প্রথম প্রথম আমি খুব কোয়েলের দিকে তাকাতাম। কোয়েলও আমার দিকে। তারপর কোয়েল হাসতো। আমি হাসতাম না। ভয়ে। কোয়েল যদি মাইণ্ড করে। পরে কোয়েল নিজেই আমার সঙ্গে প্রথম কথা বলে। কি বলেছিলো, মনে নেই। মাস ছয়েক আগের কথা। তারপর থেকেই কোয়েলের সঙ্গে আমার। কোয়েল আমাকে কখনো বলেনি, তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু কোয়েল আমি রেগুলার একসঙ্গে ঘুরে বেড়াই, সিনেমা দেখি, চাইনিজ খাই। ক্লাসে ছেলেমেয়েরা কোয়েলকে আমাকে নিয়ে কথা বলে। আমরা মাইণ্ড করি না। কোয়েল আমার হাত ধরে, আমি কোয়েলের। কিন্তু আমি কখনো কোয়েলকে চুমু খাইনি, জড়িয়ে ধরিনি। কোয়েলও আমাকে না।

এসব যখন ভাবছি, কোয়েল আমার হাত ধরে নাড়া দিলো, কি ভাবছো?

আমি থতমত খেয়ে বলি, কিছু না।

নিশ্চয় কিছু ভাবছো! কোয়েল হাসে। আমি কিছু বলতে যাবো, কোয়েল বললো তোমাকে আজ একটা কথা বলবো।

কি কথা?

এখন না। সোনারগাঁ গিয়ে বলবো।

শুনে আমার বুকের ভেতর ভরা জলের গ্লাসটা আবার মৃদু কেঁপে ওঠে। কোয়েল আমাকে কি বলবে? কোয়েলের অনেক কিছুই তো আমি জানি। ওদের বাড়ির কথা, ওর কথা। কিন্তু একটা কথা তো জানা হয়নি, কোয়েল কাউকে ভালোবাসে কিনা!

ছমাস হলো কোয়েলের সঙ্গে আমার চেনা। কোয়েল কাউকে ভালো-বাসলে আমাকে তো বলতো। তাহলে কোয়েল কি আমাকেই! সেই কথাটা বলতেই কি কোয়েল আজ বৃষ্টি ভিজে এসেছে! জেদ করে সোনারগাঁ যাচ্ছে! নিরিবিলিতে বলবে বলে!

আ কি যে ভালো লাগে! সোনারগাঁ গিয়ে ইকবালকে পেলেই হয়।

আমি হঠাৎ করে বলি, কোয়েল তোমাকেও আমি একটা কথা বলবো।

কি কথা?

এখন না। সোনারগাঁ গিয়ে বলবো। এই কথাটি আমি বলি একেবারে কোয়েলের মতো করে। শুনে কোয়েল খিল খিল করে হেসে ওঠে। আমি

ততোক্ষণে ঠিক করে ফেলছি কোয়েলকে আজ বলবো, কোয়েল আমি তোমাকে ভালোবাসি।

স্কুটার তখন ডেমরা ব্রিজ পেরিয়ে যাচ্ছিলো।

সোনারগাঁ আসতে আসতে আমরা দুজনেই ভিজে একেবারে চুপসে গেছি। আমি একটু একটু কাঁপছিলাম। কোয়েলের মুখে হাতে শ্বেত-বিন্দুর মতন বৃষ্টির জল দাঁড়িয়ে আছে। শাড়ি সপসপ করছে। দেখে আমার মাথায় কবিদের মতোন কিছু উপমা আসে। বলি, কোয়েল তোমাকে বৃষ্টিভেজা গোলাপের মতন লাগছে।

শুনে কোয়েল হাসে। বৃষ্টি ভিজে ওর কোনো দুঃখ নেই। ব্যাপারটা ও খেলাধূলার মতো নিয়েছে। কিন্তু কোয়েল কি ভেতরে ভেতরে আমার মতো কাঁপছে!

আমাদের স্কুটার দাঁড়িয়েছে পানাম নগরের পুরনো আমলের ছোট্ট উঁচু ব্রিজের কাছে। ব্রিজ পেরিয়ে ওপার গেলেই মিউজিয়াম। ইকবালের অফিস। গড ইকবালকে পেলেই হয়। মনে মনে আমি চল্লিশবার বলি, ইকবাল তুমি থেকো, ইকবাল তুমি থেকো, ইকবাল তুমি স্কুটারঅলাকে পুরো ভাড়া দিই না। শুধু যাওয়ার ভাড়া চল্লিশ টাকা। আমি বিশ টাকা দিয়ে বলি, চারটের সময় যদি না আসো!

স্কুটারঅলা হেসে চলে যায়।

ব্রিজটার সঙ্গেই তিনটে ছাপড়া ঘর। একটা মুদি দোকান, বাকি দুটো চায়ের। চায়ের দোকানে ম্যালা লোকজন। চা খেতে খেতে, সিগারেট খেতে খেতে আমাদের দেখছিলো। বৃষ্টি ভিজে শহর থেকে এসেছি, কোন পাগল আমরা!

আমি লোকজনের দিকে একপলক তাকিয়ে কোয়েলের হাত ধরি। ব্রিজে উঠি। বৃষ্টিটা পড়ছেই। ব্রিজের গা পিছল হয়ে আছে। কোয়েল-আমি হাত ধরাধরি করে ব্রিজটা পেরিয়ে যাই।

ব্রিজ পেরিয়ে লম্বা রাস্তা, দুধারে লাইন বেঁধে সব এক সাইজের বাড়ি। দোতলা, তিনতলা। সবই ভাঙাচোরা, খোয়াওঠা, দাদরা। সব ঈসা খাঁর আমলের। জায়গাটার নাম পানামনগর। এখানে ঈসা খাঁর সৈন্যরা থাকতো। এখন উদ্বাস্তুরা থাকে। আর থাকে কিছু পায়রা।

ডানদিকের দুটো বাড়ির পরেই হোয়াইট ওয়াস করা, বেমানান সুন্দর একটা বাড়ি। পুরনো আমলেরই। রংচং করে আধুনিক করা হয়েছে। এটাই মিউজিয়াম। ইকবাল এখানেই চাকরি করে।

মিউজিয়ামে ঢুকতে আমি আর একবার মনে মনে বলি, ইকবাল তুমি থেকো।

গেটে দারোয়ান গোছের একজন লোক টুল নিয়ে বসে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, ইকবাল সাহেব আছেন?

শুনেই লোকটা দাঁড়িয়ে গেলো। জ্বি আছেন।
তার সহবত দেখে আমি বুঝে যাই ইকবাল এখানকার একজন বড়ো দরের কর্তা। এবং ইকবাল আছে শুনে আ, বুকের ওপর থেকে একটা ভারি পাথর নেমে যায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, বাঁচা গেলো।
কোয়েল বললো, তোমার বন্ধুর না এখানে কোয়াটার আছে বলেছিলে?
আছে তো! কিন্তু ও শালা থাকে ঢাকায়। বউর সঙ্গে।
বিয়ে করেছে?
শুধু বিয়ে! একটা কন্যা সন্তানেরও জনক সে।
আমার কথা বলার ধরন দেখে কোয়েল হেসে ফেলে। তারপর হাসি থামিয়ে বলে, রোজ ঢাকা থেকে এসে অফিস করে?
রোজ কি আসে!
আমি দারোয়ানকে বলি, ইকবাল সাহেবের রুমটা একটু
দারোয়ান বিগলিত হয়ে বলে, আসেন স্যার।
মিউজিয়ামের ভেতর দিয়ে পথ। অন্ধকার। বৃষ্টির জন্যে লাইট নেই। দুপাশে থরে বিথরে সাজানো ঐতিহাসিক জিনিসপত্র। অন্ধকারেও ঝিলমিল করে দুএকটা। কোয়েল হাঁটতে হাঁটতে দুএকবার থেমে যাচ্ছিলো! আমি বলি, এসো। পরে দেখা যাবে।
একটা সুন্দর রুমে ইকবাল বসেছিলো। আমাদের দেখেই লাফিয়ে ওঠে, আরে এসো এসো।
কোয়েলের দিকে তাকিয়ে বলে, আসুন।
আমি পরিচয় করিয়ে দিই, আমার বন্ধু। কোয়েল হাত তুলে সালাম দেয়।
আমি চেয়ারে বসতে বসতে বলি, হঠাৎ চলে এলাম।
ইকবাল বললো, আমাকে জানিয়ে এলে পারতে। রোজ তো আমি থাকি না।
জানি। এজন্যেই ভয় পাচ্ছিলাম।
ভয় কি! আমার কথা বললেই হতো।
ইকবাল বেয়ারা ডেকে চা আনতে বলে সিগারেট আনতে বলে। আর একজনকে বলে, তোয়ালে দাও।
চার ফাঁকে ফাঁকে কথা হয়। ইকবাল কোয়েলকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে। আরো দুজন লোক আসে। ইকবালের কলিগ। ইকবাল পরিচয় করিয়ে দেয়। তারমধ্যে একজন লোককে দেখেই আমার গা জ্বলে যায়। কিছু কিছু লোক আছে, যাদের ওপর আমি চিরকাল রেগে থাকি। চিনিনা এমন অনেকের ওপরও। কেন যে এমন হয়! সেই লোকগুলো যে খারাপ, তাও নয়। আলাপ করে দেখা যায়, তারা বেশ ভালো। তবুও এটা আমার দোষ।

কথার ফাঁকে সেই লোকটা আমায় জিজ্ঞেস করে, ইনি কি আপনার মিসেস ?

আমি লোকটার দিকে তাকাই না। কিন্তু কথা না বললে ইকবালের প্রেস্টিজ। অন্যদিকে তাকিয়ে বলি, মিসেসের মতোই।

কথাটা বলি দারুণ অবহেলায়। কেমন করে যে পারি! লজ্জায় ততোক্ষণে কোয়েলের মাথা নিচু হয়ে গেছে। আমি আড়চোখে দেখি কোয়েল ওর শাদা ভ্যানিটি ব্যাগের মুখটা খুলছে আর লাগাচ্ছে। ম্যানেজ করার জন্য আমি ইকবালকে বলি, আমরা একটু মিউজিয়ামটা ঘুরে দেখি।

যাও।

মিউজিয়ামে ঢুকে কোয়েল আমাকে বললো, এই তুমি অমন করে বললে কেন?

আমি সিগারেটে টান দিয়ে বলি, তো কি বলবো ?

বললেই পারতে আমার বন্ধু।

আমি হাসি, লোকটাকে একটা রহস্যের ভেতরে রাখলাম।

কোয়েল কোনো কথা বলে না। একটা আলমারির সামনে দাঁড়িয়ে ঈসা খাঁর আমলের ঢাল তলোয়ার দেখছিলো। আমি ওসব দেখছি না। মিউজিয়াম ফিউজিয়াম আমার ভাল্লাগে না। ঢাকায় থেকেও ঢাকার জাদুঘরে আমি কখনো যাইনি। কিন্তু এখন কোয়েল সঙ্গে আছে ওর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখতে খারাপ লাগবে না।

মিউজিয়ামের মাঝমধ্যিখানের রুমে একটা হ্যাজাক জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। সম্ভবত আমরা এসেছি বলে। ইকবাল সাহেবের গেস্ট, স্পেসাল খাতির। কোয়েল সেই আলোয় ঘুরে ঘুরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখছে। কতো রকমের যে জিনিশপত্র! বাঁশের তৈরি অনেক মামুলি জিনিশও আছে, কাপড় আছে, চুড়ি আছে, ছবি আছে, হুঁকা আছে, হাতে আঁকা ছবি আছে। কোয়েল গম্ভীর হয়ে সব দেখছিলো।

নিচের তলাটা পুরো দেখা হলে পিয়ন মতন একজন বললো, ওপরে যান স্যার।

বুঝলাম ওপরেও মিউজিয়াম।

সিঁড়ির কাছে এসে কোয়েল আমার হাত ধরে। আমরা দুজন সিঁড়ি ভাঙতে থাকি! কোয়েল অনেকক্ষণ কিছু বলছিলো না দেখে আমি ভাবি, কোয়েল কি রাগ করলো! বলি, রাগ করেছো ?

না।

তাহলে কথা বলছো না যে!

কি বলবো ?

যা ইচ্ছে।

তারপর একটু থেমে বলি, তুমি না আমাকে কি বলবে।

বলবো। মিউজিয়াম দেখে নিই।

আমি আর কিছু বলি না। চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। ওপরটা বেশ সুন্দর। বিরাট একটা হলঘর খুব ছিমছাম ভাবে সাজানো। দরোজায় একজন লোক বসে। কি নির্জন ঠাণ্ডা ঘরটা। স্বপ্নের মতো।

ঘরটায় ঢুকতেই আমার ভোররাতের স্বপ্নটার কথা মনে পড়ে। একটা নির্জন নদী তীরের স্বপ্ন দেখেছিলাম। স্বপ্নের কথাটা কোয়েলকে বলা হয়নি।

ঘরের মাঝমধ্যিখানে একটা কাচের শোকেস। তাতে ঈশা খাঁর আমলের মেয়েদের অলংকার সাজানো। বেশির ভাগই রূপোর। অদ্ভুত দেখতে এক একটা। দেখে কোয়েল বললো, ওমা এগুলো মেয়েরা পরতো?

আমি ফাজলামো করে বলি, জ্বি ম্যাডাম।

শুনে কোয়েল হেসে ফেলে।

হলঘরের পাশে সরু একটা বারান্দা। ঘুরতে ঘুরতে আমরা সেখানে চলে আসি। বারান্দায় পাথরের কটি মূর্তি রাখা। একটা মূর্তি দেখে আমার মাথার ভেতরটা টাল খেয়ে যায়। এক জোড়া মানবমানবী জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে। ঠোঁটে ঠোঁট রাখা দুজনের। পুরুষটার একটা হাত নারীমূর্তির একটা স্তনের ওপর।

কোয়েল মূর্তিটা দেখে বলে, সুন্দর না!

আমি বলি, হ্যাঁ। তারপর চট করে কোয়েলের গালে একটু চুমু খেয়ে বসি। কেমন করে যে পারি, বুঝতে পারি না।

কোয়েল চমকে আমার দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে। ওর চোখ বাচ্চা মেয়ের মতো ছলছল করছে। কোয়েল কি কেঁদে ফেলবে! আমি এখন কি করবো বুঝতে পারি না। খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বলি, চলো নিচে যাই।

নিচে এসে দেখি ইকবাল কলা বিশকিট সিঙারা সাজিয়ে রেখেছে তিনটে প্লেটে। দেখেই আমি টের পাই, হ্যাঁ খিদে পেয়েছে তো।

ইকবাল বললো, শুরু করো।

কোয়েলের দিকে তাকিয়ে বললো, নিন।

কোয়েল বললো, আপনিও নিন।

কোয়েলের গলার স্বরে আমি বুঝতে পারি কোয়েল চুমুর ব্যাপারটা সামলে নিয়েছে। যাক বাঁচা গেল বাবা।

খেতে খেতে আমি কোয়েলের কথা ভাবি। কোয়েলকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না। ওর ভেতর কোথায় যেনো খানিকটা রহস্যময়তা আছে।

বেয়ারা চা দিয়ে গেলে ইকবাল বললো, উপরে আমার কেয়াটার। খোলা আছে, তোমরা গিয়ে রেস্ট নাও।

শুনে আমি এক পলক কোয়েলের দিকে। কোয়েল আমার দিকে।

খানিক পর বেয়ারা আমাদের উপরে, ইকবালের কোয়ার্টারে পৌঁছে দেয়। শুধু একটা রুম খুলে দেয়া হয়েছে। সাজানো গোছানো, ছিমছাম। একটা সুন্দর খাট, একটা টেবিল, দুটো চেয়ার আর একটা ড্রেসিং টেবিল। পুব দিকের দুটো জানালা খোলা, তা দিয়ে মেঘলা দিনের ফ্যাকাশে একটা আলো এসে পড়েছে ঘরের ভেতর। বাইরে ঝির ঝির করে তখনো বৃষ্টি পড়ছে।

বেয়ারা চলে যেতে আমি দরোজা আটকে দিই। কোয়েল তখন উদাস হয়ে জানালা ধরে দাঁড়িয়ে। দরোজা আটকানোর শব্দে একবারও ফিরে তাকায় না।

কাছে গিয়ে আমি কোয়েলের কাঁধে হাত রাখি। কোয়েল একটু নড়ে ওঠে। কথা বলে না। আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি নিচে নিবিড় কলা গাছের বাগান অন্ধকার হয়ে আছে। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে কলাপাতার ওপর। সেই শব্দ ছাপিয়ে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে সমানে। আর কোনো শব্দ নেই কোথাও। এই রকম নিরিবিলিতে কোনো মেয়ের সঙ্গে আমি কখনো দাঁড়াইনি। কি যে ভালো লাগে!

কোয়েল একবার আমার মুখের দিকে তাকায়। তারপর আবার উদাস হয়ে যায়। কোয়েলকে একবার চুমো খেয়ে আমার সাহসটা বেড়ে গেছে। এখন কোয়েলের কাঁধে হাত রাখায় আর ওর গায়ের মিষ্টি গন্ধে আবার ইচ্ছে করে। কি হবে, কোয়েল কি রাগ করবে! রাগ করলে ওকে আমি খুশি করার জন্যে সেই কথাটা বলবো। কোয়েল তোমাকে আমি ভালোবাসি। কোয়েলেও কি আমাকে বলবে না, তোমাকেও আমি ভালোবাসি! তাহলে আর চুমু খেতে দোষ কি! ভালোবাসা থাকলে চুমু খাওয়া, আদর করা এ সবই তো নিয়ম। ভেবে কোয়েলের কাঁধে হাতটা আমি আস্তে আস্তে পিঠের দিকে নামিয়ে নিই। কোয়েল কিছু বলে না। আমি আস্তে আস্তে কোয়েলের পিঠে হাত বুলাতে থাকি। কোয়েল একটুও নড়ে না, কথাও বলে না। যেমন দাঁড়িয়ে ছিলো, দাঁড়িয়ে থাকে। আমার হাতে কোয়েলের ব্রেশিয়ারের হুক ঠেকে। একটু একটু লজ্জা হয়। কিন্তু কোয়েল কিছু বলছে না দেখে লজ্জাটা থাকে না।

খানিকপর কোয়েল আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। তাতে আমার হাতটা আবার কোয়েলের কাঁধে উঠে যায়। আমি হেসে দুটো হাতই কায়দা করে কোয়েলের দুই কাঁধে রাখি। কোয়েল কিছু বলে না। আঙুল দিয়ে আমার বুকে হিজিবিজি আঁকে, তোমাকে কিছু কথা বলবো।

আমি হেসে বলি, বলো।

রাগ করবে না তো?

রাগ করবো কেন! তোমার ওপর কি আমি রাগ করতে পারি!

শুনে কোয়েল আমার মুখের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। ওকে একটু বিষণ্ণ, একটু উদাস দেখায়। কোয়েল সব সময় হাসে। এখন হাসেনা। কোয়েল আমাকে কি বলবে !

আমি কোয়েলের কাঁধে একটু চাপ দিয়ে বলি, বলো।

কোয়েল আবার মাথা নিচু করে। আঙুলে আমার বুকে হিজিবিজি আঁকে। কদিন ধরেই আমি ভাবছি কথাটা তোমাকে বলা দরকার। নিরিবিলিতে বলবো বলেই চিঠি লিখে আজকের কথা বলেছিলাম। বৃষ্টি ভিজে এতোদূর এলাম সেই কথাটা বলতেই।

একটুকু বলে কোয়েল আবার স্বাভাবিক হয়ে যায়। হাসে। আবার বলে, তুমি রাগ করবে না তো !

কি এমন কথা বলবে কোয়েল ? এতো ভণিতা করছে কেন ? আমি ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠি।

কোয়েল বললো, চার পাঁচ দিন ধরে আমি একটুও ঘুমুতে পারি না, পিল খাই তবুও ঘুম আসে না ! লেখাপড়া ভাল্লাগে না, খেতে ভাল্লাগে না। দেখো আমার চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে।

আমি কোয়েলকে কাছে টেনে বলি, কেন কোয়েল ?

আমার সব সময় কেবল তোমার কথা মনে পড়ে।

আমারও তো সব সময় তোমার কথা মনে পড়ে। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু আমি তো তা চাই না। এসবে খুব দুঃখ পেতে হয়। দুঃখ পেতে আমি চাই না।

এই দুঃখ তো খুব সুখের।

না। তুমি বুঝবে না।

কোয়েল চুপ করে থাকে। আমি এখন কি করবো বুঝতে পারি না। কোয়েলকে কি কথাটা বলে ফেলবো। কিন্তু কোয়েল যে এখনো পুরো-পুরি সব বললো না। কোয়েলের মুখে সব না শুনে আমি কিছু বলবো না। কিন্তু কোয়েল এখন চুপ করে আছে। এভাবে কতোক্ষণ থাকা যায়, ভেবে আমি কোয়েলকে দুহাতে জড়িয়ে ধরি। কোয়েল কিছু বলে না। আমার বুকের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে থাকে। দুটো নরম হাতে আমাকেও জড়িয়ে ধরে কোয়েল। তারপর খুব নরম করে বলে, তোমার জন্য সারা জীবন ধরে আমার কষ্ট হবে।

কেন কোয়েল ?

তোমাকে আমি ভালোবাসি, কিন্তু তোমাকে আমি পেতে চাই না।

কেন ?

সব সময় তোমাকে কাছাকাছি পেলে আমার ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এসব তোমাকে কে বলেছে ?
আমি জানি।
তুমি ভুল জানো।
না আমি দেখেছি, কাছাকাছি এলে তোমাকে যতো ভালো লাগে দূর থেকে তোমার কথা ভাবতে আমার তারচে অনেক বেশি ভালো লাগে।
এসব শুনে আমি বুঝতে পারি না, আমি এখন কোয়েলকে কি বলবো! ভালোবাসি, বলবো! বলে কি লাভ! কোয়েল এ রকম ভালোবাসা চায় না। আমি চাই কোয়েলকে কাছাকাছি পেতে! কোয়েল চায় দূর থেকে আমাকে ভাবতে। দুজনের ভালোবাসা দুরকমের।
কোয়েল আমাকে জড়িয়ে ধরেই বললো, আগামী মাসে সোয়েব আসছে।
সোয়েব কে ?
বাবার বন্ধুর ছেলে। আমেরিকা থাকে।
সোয়েব এলে তোমার কি ?
ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। এলেই। বিয়ের পর আমিও আমেরিকা চলে যাবো।
এসব শুনে আমার ভেতর ভরা জলের গ্লাসটা কি আবার কেঁপে ওঠে! বুঝতে পারি না। কোয়েলকে আমি ধাককা দিয়ে সরিয়ে দেবো!
কোয়েল বললো, জানি তুমি খুব দুঃখ পাবে। আমি তোমাকেই বিয়ে করতাম, কিন্তু তাতে আমার ভালোবাসা নষ্ট হয়ে যাবে। যাকে আমি বিয়ে করবো তাকে ভালোবাসবো না। সে শুধু আমার স্বামী। তার সঙ্গে আমি ঘর করবো, এক খাটে শোবো। কিন্তু আমার সারামন জুড়ে থাকবে তুমি। আমার ভালোবাসা। আমি তোমার কথাই কেবল সারা জীবন ধরে ভাববো।
কোয়েলের গলা খুব নরম হয়ে আসে। আমি এখন কি করবো।
হঠাৎ কোয়েল আমাকে নাড়া দিয়ে বললো, তুমি রাগ করেছো ?
আমি কথা বলি না। কোয়েল বললো, রাগ করো না। আমি আমাকে ঠিক বুঝতে পারি না।
আমি কথা বলি না। কোয়েল বলে, তুমি না আমাকে কি বলবে বলেছিলে ?
বলে আর কি হবে ?
বলো না গো! আমি সারা জীবন ধরে তাহলে আজকের দিনটির কথাই ভাবতে পারবো।
আমি তখন কোয়েলকে ভোররাতের স্বপ্নটার কথা বলি। দূরে ঝিরঝিরে একটা নদী। রূপোলী ফিতের মতো। চিরল। রোদে ঝিলমিল করে নদী। নদীর নাম কি? ঘুমনদী। এপার ওপার জুড়ে ধু ধু বালিয়াড়ি তার। কোথাও কোনো শব্দ নেই, মানুষ নেই। একটা পাখিও না।

পাড়ে ছোট্ট একটা ডিঙি নাও, খানিকটা চরার ওপর টেনে তোলা। আমি আর কোয়েল হাত ধরাধরি করে সেই নাওটার দিকে হেঁটে যাই। হাওয়ায় আমার চুল ওড়ে, কোয়েলের আঁচল ওড়ে। আমরা কেউ খেয়াল করি না। বালিয়াড়ি ভেঙে হেঁটে যাই, হেঁটে যাই। নাওটা যেনো আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করে। চড়লেই ওপারে পৌঁছে দেবে।
কথাগুলো আমি এমনভাবে বলি, যেনো কোয়েলকে নয়, অন্য কারো কাছে একটা সুন্দর স্বপ্নের কথা বলছি। শুনে কোয়েল হু হু করে কেঁদে ফেলে। তারপর দুহাতে আমাকে জড়িয়ে পাগলের মতো চুমু খেতে খেতে বলে, আমার এমন হলো কেন, কেন গো! ১৯৭৮

ব্যর্থ প্রেমিক

বিকেলের টিউশানী সেরে আমি যখন বাড়ি ফিরি তখন টুপু তাদের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিদিনই। টুপুদের বাসাটা আমার যাতায়াতের পথেই। সরু গলিটার পাশে।
টুপুদের বাসায় চারটে টিনের ঘর। পথের পাশের ঘরটায় টুপুরা ভাড়া থাকে। টুপু তার একটা ছোট ভাই আর মা বাবা। চারজনের সংসার টুপুদের। টুপুর বাবা কি কাজ করে আমি জানিনা। ভদ্রলোক কখন বাড়ি থেকে বেরোন কখন ফিরে আসেন, আমি জানিনা। টুপুদের অবস্থা ভালো নয়। প্রায় আমাদের মতোই। তবে সংসারটা ছোট বলে ওরা বোধহয় আমাদেরচে খানিকটা স্বচ্ছল।
আমাদের সংসারটা বড়ো। আমরা তিন ভাই পাঁচ বোন। আমার বড়ো একবোন তার বড়ো এক ভাই। আরগুলো সব ছোট। বড়ো বোনটার বিয়ের বয়েস হয়েছে কমপক্ষে আরো সাত বছর আগে। বড়ো ভাইটিরও তাই। কিন্তু বোনটির বিয়ে হয়নি। ভাইটি বিয়ে করতে পারেনি। কারণটা আর কিছুই নয়। অভাব।
আমার ছোট দুটো বোনও বিয়ের উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। একটা এবার আই এ পাশ করলো। আর একটা ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। ছোটগুলোও সব স্কুলে। শুধু বড়ো বোনটারই পড়াশুনা হয়নি। ক্লাশ নাইন পর্যন্ত পড়ে আর এগুতে পারেনি সে। তবে একটা কাজ শিখছে। কায়ক্লেশে ওকে আমরা একটা সেলাই মেশিন কিনে দিয়েছি। তাই দিয়ে পাড়ার

মেয়েদের জামা কাপড় সেলাই করে মাসে দু তিনশো টাকা রোজগার করে সে। অবসর সময়টা মার সঙ্গে সংসারের কাজ করে কাটে তার।

বড়ো ভাই বি কম পাশ করে ম্যালাদিন বেকার ছিলো। তখন তার সম্বল ছিলো আমার মতো দু তিনটে টিউশানী। বছর দুয়েক হলো একটা প্রাইভেট ফার্মে একাউন্টস এ্যাসিট্যান্ট হিশেবে ঢুকেছে। মাইনে ছিলো চারশো টাকা। দু বছরে বেড়ে ছশো টাকা হয়েছে। এরকম ফ্যামিলির ছশো টাকার মাইনের চাকুরে ছেলের পক্ষে কি আজকালকার দিনে বিয়ে করা সম্ভব! সংসারেইবা দিবে কি বউকেইবা খাওয়াবে কি!

আমার বুড়ো বাপ একটা সরকারী অফিসের কেরানী। জন্মের পর থেকে যে হালে দেখছি লোকটাকে সে হালেই আছে। পাজামা আর পকেটঅলা ফুলহাতা শার্ট পরে হাতে তালি দেয়া ছাতা নিয়ে সকালবেলা বেরিয়ে যায়, সন্ধ্যার মুখে মুখ কালো করে বাড়ি ফিরে আসে। মাসের এক তারিখে ফেরার পর মুখটা একটু উজ্জ্বল দেখায় তার। মাইনে পেয়েছে। টাকাটা মার হাতে তুলে দিয়ে পরদিন থেকে আবার কালো মুখ। আমার মা একজন মহিলা বটে। বাবার ওই সামান্য মাইনের টাকায়, বাড়ি ভাড়া নিয়ে অতোগুলো ছেলেমেয়েকে খাইয়ে পরিয়ে বড়ো করে তোলা, কেমন করে যে পারলো সে! ঈশ্বর নিজ হাতে আমার মাটিকে তৈরি করেছিলেন। মুখে কথা নেই. নিঃশব্দে সংসারটিকে এতোদূর টেনে এনেছে সে।

এখন তো আমাদের সংসারটা কিঞ্চিত স্বচ্ছল। বড়ো ভাই রোজগার করে, বোনটা করে, তিনটে টিউশানী করে আমিও করি কিছুটা। তাতেও কুলোয় না। তাহলে আগে শুধু বাবার সামান্য মাইনের টাকায় মা কেমন করে সংসারটা চালাতো! আমাদের স্কুল কলেজেই বা পড়াতো কেমন করে!

ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমি এখন বিএ পড়ছি। ছাত্র খুব ভালো নই। তবুও পাশটা হয়তো করে ফেলবো। তারপর একটা চাকরি বাকরি। ওই একটা স্বপ্ন নিয়েই আছি। আমার মতো ছেলের এর চেয়ে বেশি আর কি স্বপ্ন থাকতে পারে।

তবুও অন্য একটা স্বপ্ন আমি কিছুদিন থেকে দেখতে শুরু করেছি। স্বপ্নটা টুপুকে নিয়ে।

টুপুরা আমাদের পাড়ায় এসেছে আট নমাস হলো। আসার কয়েক দিনের মধ্যেই আমার ছোট একটা বোনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে টুপুর। টুপু একবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছে। এখন আর পড়াশুনা করে না। মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় এসে বোনদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। আর বিকেলবেলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে।

টুপু খুব সুন্দর মেয়ে।
টুপু খুব চঞ্চল মেয়ে।
টুপুর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো আমার ছোট বোন মালা। বিকেলের মুখে মুখে টুপু আমাদের বাসায় এসেছিলো। কলেজ থেকে ফিরে খেয়েদেয়ে ঘণ্টা খানেকের ঘুম দিয়ে আমি উঠেছি। একমাত্র প্যান্টটা পরাই ছিলো। দুপুরে বাড়ি ফিরে প্যান্টটা আর খুলিনা। চারটের দিকে শার্টটা পরে টিউশানীতে বেরুই।
সেদিনও বেরুচ্ছিলাম। তখুনি মালা এসে আমাকে এক কাপ চা দিলো। চা পেয়ে আমি খুব অবাক। আমাদের সংসারে এক কাপ চা খুবই মূল্যবান। কেউ বেড়াতে টেরাতে না এলে চা হয় না আমাদের বাসায়। তবে সারাদিনে তিন কাপ চা আমার খাওয়া হয়। যে সব বাসায় টিউশানী করি তারা খাওয়ায়।
মালা আমাকে চা টা দিতেই বললাম, কে এসেছে?
মালা বললো, আমার বন্ধু টুপু।
তোর বন্ধু টুপু আবার কে? তোর সব খেদি পেঁচি বন্ধুগুলোকে তো আমি চিনি।
টুপু ওরকম খেদি পেঁচি নয়। খুব সুন্দর মেয়ে।
ডাক তো দেখি।
তারপরই টুপুর সঙ্গে আমার পরিচয়। টুপু সত্যি বেশ সুন্দর। টুপুকে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম।
কথায় কথায় টুপু সেদিন বলেছিলো, আপনাকে তো আমি রোজ দেখি।
কোথায়?
আপনিতো আমাদের বাসার সামনে দিয়েই আসা যাওয়া করেন।
কই তোমাকে তো আমি কখনো দেখিনি!
কেমন করে দেখবেন! আপনি কোনো দিকে তাকালে তো! আমাদের ঘরটা রাস্তার পাশে।
আমি হেসে বলেছিলাম, এবার থেকে তাকাবো।
শুনে টুপু খুব হেসেছিলো।
তারপর থেকে দিনে যতোবার টুপুদের বাসার সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করি, তাকাই। আমাকে দেখলেই টুপু মিষ্টি করে হাসে। কথা বলে।
টুপুকে নিয়ে তখন থেকে স্বপ্নটা দেখতে শুরু করি আমি। সন্ধের মুখে মুখে বাড়ি ফেরার সময় টুপুদের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে টুপুর সঙ্গে কথা বলি।
টুপু খুব ফুল ভালোবাসতো।
এটা প্রথম জানতে পারি, আমার বিকেলের টিউশানীর বাসায় প্রচুর

ফুলগাছ ছিলো, যেদিন আনমনে সেই বাসা থেকে একই বৃন্তে ফুটে থাকা দুটো গোলাপ আমি তুলে আনি, সেদিন। আমার হাতে ফুল দেখে লাফিয়ে উঠেছিলো টুপু। ইস কি সুন্দর ফুল। আমাকে দিন না।

শুনে আমি চালাকি করে বললাম, দিতে পারি যদি তুমি আমাকে তুমি করে বলো।

বলবো।

এখুনি বলো।

টুপু বললো, তুমি তুমি

আমি ফুল দুটো টুপুর হাতে দিই।

ফুল হাতে নিয়ে টুপু কি খুশি! আলতো করে ফুল দুটো গালের সঙ্গে লাগিয়ে রাখে। দুটো ফুলের পাশে টুপুর মুখটাও মনে হয় বড়ো একটা গোলাপের মতো। সত্যি কথা বলতে কি, ওই দৃশ্যটা দেখেই আমি টুপুর প্রেমে পড়ে যাই।

তারপর থেকে প্রায়ই টুপুর জন্য আমি ফুল নিয়ে আসতাম! যখন যে ফুল পেতাম। আমার টিউশানী বাসার বাচ্চা ছাত্রটা ফুলের প্রতি আমার লোভ দেখে নিজেও কখনো কখনো আমাকে ফুল ছিঁড়ে দিতো।

একদিন টুপু আমাকে বললো, তুমি এইভাবে রোজ রোজ ফুল দিতে থাকলে আমি বোধহয় তোমাকে একদিন ভালোবেসে ফেলবো।

আমি বুকের অনেক ভেতর থেকে বললাম, আমি সেই দিনটির অপেক্ষায় থাকবো।

এসবের কিছুদিন পরই একদিন খুব সকালবেলা টুপু আমাদের বাসায় এসে হাজির। আমি তখন একা ঘরে। সুযোগ বুঝে টুপু এসে আমার সামনে দাঁড়ালো। ওর হাতে বেলি ফুলের একটি মালা। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই মালাটা আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে টুপু বললো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলো।

সেদিন থেকে সবকিছুতে আমার উৎসাহ খুব বেড়ে গেলো। পড়াশুনোয় খুব বেশি মনোযোগী হয়ে উঠলাম আমি। ভালোভাবে পাস করতে হবে। চাকরি পেতে হবে। নয়তো টুপুকে আমি কেমন করে পাবো। এবং আর একটা টিউশানীও জুটিয়ে ফেললাম আমি। আমার আরো কিছু পয়সার দরকার। আমার কিছু ভালো জামা কাপড় দরকার। পুরনো একই পোশাকে কেমন করে আমি প্রতিদিন আমার প্রেমিকার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো!

কিন্তু আমার স্বপ্ন সফল হয়নি। টুপুকে আমি পাইনি। আমি পাস করে বেরুবার অনেক আগেই টুপুদের জীবনযাত্রা পাল্টে গিয়েছিলো।

টুপুর বাবা কি কাজ করতেন আমি জানি না। সকালবেলা বেরিয়ে তিনি ফিরতেন রাতের বেলা। কিছুদিন পর জানালা দিয়ে দেখতে পাই টুপুদের ঘরে নতুন ফার্নিচার আসছে। টুপুদের পোশাক পাল্টে গেছে। টুপু একেকদিন একেকটা শাড়ি পড়ে। জানালার ওপাশ থেকেও, টুপুর গা থেকে বেরুনো তীব্র সেন্টের গন্ধ আমি পাই। টুপু খুব দামী কসমেটিক ব্যবহার করতে শুরু করেছে। টুপুর চেহারা খুব অন্যরকম হয়ে গেছে। আমি অবাক হয়ে ভাবি, এসবের মানে কি। রাতারাতি মানুষের জীবন পাল্টায় কেমন করে।

টুপু একদিন বললো, আমরা এ বাসা ছেড়ে দিচ্ছি।

শুনে আমি চমকে উঠি। কোথায় যাবে?

টুপু গলির শেষ মাথাটা দেখিয়ে বললো, ওই যে নতুন দোতলা বাড়িটা হয়েছে ওটা নেবো।

পুরোটা?

হ্যাঁ।

ওটার তো অনেক ভাড়া হবে।

তাতে কি! বাবা এখন বিজনেস করেন।

ও বাসায় গিয়েই গাড়ি কিনবেন। টেলিফোন আনবেন।

শুনে আমি বুকের অনেক ভেতর থেকে বললাম, টুপু তুমি তারপর আমাকে মনে রাখবে তো!

টুপু কোনো কথা বলেনি।

কিন্তু ও বাসায় উঠে যাওয়ার পর সত্যি সত্যি টুপু আমাকে আর মনে রাখেনি। টুপুর বাবা নীল একটা গাড়ি কিনেছে। টুপু রাজরাণীর মতো সেই গাড়ি চড়ে যাতায়াত করে। রাস্তায় দু একবার আমার সঙ্গে দেখা হলে ফিরেও তাকায় না।

টাকা, শুধু টাকাই টুপুকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে। টাকাই আমার ভিলেন।

টুপু খুব ফুল ভালোবাসতো। ওই দোতলা বাড়িতে উঠে যাওয়ার পর আমি একদিন টুপুর জন্যে ফুল নিয়ে গিয়েছিলাম। গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম টুপু তখন গাড়ি করে বেরুচ্ছিলো। আমার দিকে ফিরেও তাকালো না। গেটের সামনে বৃষ্টির খানিকটা জল জমেছিলো। গাড়িটা এতো স্পিডে বেরুলো, বৃষ্টির জল ছিটিয়ে আমার জামা কাপড় বিনাশ করে দিলো।

দুঃখে আমার বুক ফেটে গেছে। ফুলগুলো কুটি কুটি করে ছুঁড়ে ফেলেছি টুপুদের বাড়ির সামনে। মনে মনে বলেছি, আমি হেরে গেছি। আমার ভিলেন টাকাই জিতে গেছে।

হায়রে টাকা! ১৯৭৫

ভালোবাসার দুঃখ

অফিস থেকে বেরুবো, টেলিফোনটা বেজে উঠলো। এ সময় আবার কে ডাকে! মেজাজটা খচে যায়। আমি চাই না এ সময় আমায় কেউ বিরক্ত করুক। এখন কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটা। মাত্র পাঁচ মিনিট আগে উঠে এয়ারকুলারটা অফ করেছি। ড্রয়ারের তালা লাগিয়ে চাবিটা রেখেছি পকেটে। এ দুটো কাজ নিজ হাতে করি। আমি বেরুনোর পর রুম লক করবে পিয়ন। নিচে অপেক্ষা করছে ড্রাইভার। নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরোজা খুলে ধরবে। অফিসের সবাই জানে আমি ঠিক দশটায় রুমে ঢুকবো, ঠিক পাঁচটায় বেরুবো। একটা থেকে দুটো লাঞ্চ আওয়ার, ওই একঘন্টা রুমে বসেই লাঞ্চ সারবো। তারপর রিভলবিং চেয়ারে মাথা হেলিয়ে রেস্ট। স্বয়ং বড়ো সাহেব এলেও ওই সময় আমার পারমিশান ছাড়া পিয়ন তাকে রুমে ঢুকতে দেবে না। আমার আদেশ। অফিসে আমার এই নিয়ম কানুনগুলোর কথা সবাই জানে। অসময়ে টেলিফোন এলেও অপারেটর রিফিউজ করে। এসব আমার বলা। তাহলে টেলিফোনটা কেন বাজছে! টেলিফোন তুলে অপারেটরকে ধমকাবো!

মেজাজ খারাপ করে টেলিফোন তুলি। আপনাকে না বলেছি অসময়ে আমার টেলিফোন রিসিভ করবেন না!

মেয়েটা কাচুমাচু করে। স্যার, আপনার স্ত্রী।

রুমানার কথা শুনে রাগটা কমে যায়। এসময়ে রুমানার টেলিফোন! আমি তো বাড়িই ফিরছিলাম, রুমানার কাছে। দিনশেষে রুমানার কাছে ফিরে যাওয়া, এই তো আমার নিয়তি। তিন বছরেও কি রুমানা তা বুঝতে পারেনি!

আমি অপারেটরকে বলি, দিন।

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে রুমানার গলা ভেসে আসে। হ্যালো বলছি।

অপারেটরটা কি, এতোক্ষণ ধরে বলছি।

অপারেটরকে আমার বলা ছিলো, অসময়ে টেলিফোন এলে তাই বলে আমার টেলিফোনেও!

আমার আদেশ তো মানতে হবে। চাকরি।

এ কথায় রুমানা খুব রেগে যায়। তোমার ওসব বসগিরি আমাকে দেখিয়ো না। আমার যখন ইচ্ছে টেলিফোন করবো।

আমি হেসে বলি, ঠিক আছে, অপারেটরকে আমি বলে দেবো। কিন্তু তুমি এ সময়ে টেলিফোন করলে কেন? দশ মিনিটের মধ্যেই তো আমি বাড়ি ফিরে যেতাম।

বাড়ি ফিরে কি করবে, আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

কোথায়?

মা টেলিফোন করেছিলো। শরীর খারাপ। আমি এক্ষুণি বেরিয়ে যাচ্ছি। দুদিন থাকবো।

শুনে আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। রুমানা এই রকম। দিনশেষে আমি রুমানার কাছে ফিরে যেতে চাই। রুমানার আশ্রয়ে। বউর কাছে মানুষ ফিরে যায় কি আকর্ষণে। একটু আদর, একটু সেবা আর শরীরের সব ভার ছেড়ে দেয়া, এই তো।

রুমানা এসব বোঝে না। যখন তখন মায়ের কাছে চলে যায়। দুদশ দিন থেকে আসে। বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে প্রায় দিনই দেখি রুমানা নেই। হয় মার্কেটিংয়ে, নয় কোনো বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গেছে। কোনো কোনোদিন সিনেমায়। শূন্য ঘরে আমার আর সময় কাটে না। মনটা খারাপ হয়ে থাকে।

রুমানা বললো, কি হলো?

শুনে আমি চমকে উঠি। রিসিভার কানে লাগিয়ে এতোক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। কিসব আবোল তাবোল ভাবছিলাম। নিজে নিজে লজ্জা পেয়ে যাই। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। ঠিক আছে।

রুমানা আদুরে গলায় বললো, রাগ করো না লক্ষ্মীটি।

তারপর টেলিফোন নামিয়ে রাখে।

আমি অনেকক্ষণ রুমের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকি। দাঁড়িয়ে রুমানার কথা ভাবি। আমার দুঃখ কষ্ট মানঅভিমান রুমানা কখনো বোঝে না। বিয়ের পর প্রথম প্রথম ভেবেছি আস্তে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে। আমাকে বুঝে নিতে রুমানার খানিকটা সময় লাগবে। তিনটে বছর কেটে গেলো। রুমানার কোনো চেঞ্জ নেই। আজকাল মনে হয় সারাজীবনেও রুমানার চেঞ্জ হবে না। বিয়ের প্রথমদিন যেমন ছিলো, তাজও তেমনি আছে, পনেরো বিশ বছর পরেও এমনি থাকবে। পাশাপাশি থেকেও সারাজীবনে রুমানা আমায় বুঝতে পারবে না।

আমি আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। তারপর লিফটে না চড়ে চারতলার সিঁড়ি ভেঙে আস্তেধীরে নিচে নেমে যাই। সোয়া পাঁচটা বাজে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কার কাছে যাবো।

গাড়িতে বসে আমার আবার মনে পড়ে, কার কাছে যাবো? কোথায় যাবো? বাড়ি ফিরে লাভ নেই, রুমানা এতোক্ষণে চলে গেছে। শূন্য ঘরে একা আমার ভাল্লাগবেনা। মনটা আবার খারাপ হয়ে যাবে।

কোথায় যাবো, আমি এখন কোথায় যাবো! রহমানের বাসায় কিংবা ভাইজানের ওখানে! এ সময় কি ওদের কাউকে পাওয়া যাবে! রহমান কি ঢাকায় আছে! ভাইজান তো তাঁর বিজনেস নিয়েই ব্যস্ত। রাত দশটার আগে বাড়ি ফেরে না। ভাইজানের বাসায় গেলে বাচ্চাকাচ্চার হাউকাউ। অফিসে সারাদিন কথা বলতে হয়। কখনো টেলিফোন, কখনো সামনা সামনি। অফিস থেকে বেরিয়ে বেশি লোকের মধ্যে ফিরে যেতে আমার ভাল্লাগে না। ভাইজানের বাসায় ম্যালা লোকজন। ছটা তো ছেলেমেয়েই। তার ওপর চাকরবাকর। ভাবী আবার কথা বলে বকবক করে। একবার শুরু করলে থামতে চায় না। বিরক্ত লাগে। ভাবীর কথা ভেবে ভাইজানের বাসায় যাওয়ার কথাটা ভুলে যাই।

গাড়ি চলছিলো বাসার দিকে। এখুনি ড্রাইভারকে কিছু বলা উচিত। বাড়ি ফিরবো না তা না হয় বললাম, কিন্তু কোথায় যাবো তা তো বলতে হবে! কি বলবো?

কোনো সিনেমা হলে ঢুকবো নাকি! ঢাকায় কি কোনো ভালো ইংরেজি ছবি চলে! বাংলা ছবি আমি দেখি না। অল বোগাস। কি একটা ছবিতে দেখেছিলাম নায়িকা লাঠিয়ালদের মতো বাঁশ নিয়ে মারপিট করতে নেমেছে। কি যনো নাম মেয়েটার? আগাপাশতলা সমান। দেখতে কদুর মতো!

ঐ দৃশ্যটার কথা ভেবে সিনেমা দেখার ইচ্ছেটা মরে যায়। কিন্তু আমাকে তো কোথাও যেতে হবে! কোথায় যাবো?

হঠাৎ মনে পড়ে রিখুর কথা। কতোকাল রিখুর সঙ্গে দেখা হয় না। রিখুর কথা কি আমি ভুলে গিয়েছিলাম!

ড্রাইভারকে বলি, কল্যাণপুর যাও।

ড্রাইভার মিরপুর রোডে গাড়ি চালায়।

কল্যাণপুর বাস ডিপোর ডান দিকের গলির শেষ মাথায় রিখুদের দোতলা বাড়ি। বাড়ির সামনে গাছপালায় ভরা সুন্দর বাগান। তারপর শাদা রংয়ের টেলিভিশন মডেল বাড়ি। রাস্তা থেকে দেখা যায় দোতলার পুবদিকের রুমে বিশাল জানলায় রিখুর বিষণ্ণ মুখ। পাঁচ বছর রিখু ওই জানলায় বসে আছে।

গেটের কাছে নেমে আমি আস্তেধীরে রিখুদের বাগানটা পেরিয়ে যাই। রিখু দোতলার জানালার বিষণ্ণ মুখে বসে। আমার সঙ্গে রিখুর একবার চোখাচোখি হয়ে যায়। রিখুর মুখে মৃদু হাসি ছিলো, আমি দূর থেকে দেখতে পাই। আর শুনি রিখুর ঘরে লো ভলিয়্যুমে স্টেরিও ক্যাসেটে বাজছে বিসমিল্লাহ খাঁর সানাই। সানাইটা খুব প্রিয় রিখুর।

এ বাড়ির সবকিছু বড়ো পরিচ্ছন্ন, মায়াময়। সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠতে উঠতে আমি টের পাই কি অবাধ নির্জনতা বাড়িটায় ! মনে হয় হঠাৎ করে স্বপ্নের ভেতর চলে এসেছি।
দোতলায় উঠে সরাসরি রিখুর ঘরে ঢুকে যাই। এ বাড়িতে চিরকাল আমার অবাধ যাতায়াত।
আমাকে দেখে মৃদু হাসে রিখু। তারপর বিষণ্ণ গলায় বলে, এসো।
জানালার ধারে খাটের ওপর বসেছিলো রিখু। শাদা শাড়ি ব্লাউজ পরা। কালো বার্নিশের সিংগেল খাটে নীল বেডকভার। তার ওপর ছড়ানোছিটানো কিছু পত্রপত্রিকা, দুএকটা বই। রিখুর মাথার কাছে টেপ রেকর্ডার। তাতে মৃদু সুরে বেজে যাচ্ছিলো বিসমিল্লাহ খাঁর সানাই। ঘরের মাঝমধ্যিখানে একলা পড়ে আছে একটা হুইল চেয়ার। বসে থাকতে ভালো না লাগলে হুইল চেয়ারে চড়ে রিখু। তারপর সামনের বারান্দায় চলাফেরা করে। আমাকে দেখে হাত বাড়িয়ে টেপ রেকর্ডার অফ করে রিখু। পা দুটো ছড়ানো ছিলো খাটের ওপর। কোমর অব্দি নীল সোনালী সুতোয় কাজ করা চাদরে ঢাকা। পাঁচ বছর ধরে নিম্নাঙ্গ প্যারালাইসড হয়ে আছে রিখুর। রিখুর দিকে তাকিয়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলি। ডান হাতে খাটের ওপর পড়ে থাকা বইপত্রগুলো সরিয়ে রিখু মৃদুস্বরে বললো, বসো।
আমি খাটের ওপর রিখুর পাশে বসি। তারপর উদাস চোখে রিখুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। রিখুর মুখটা অসম্ভব মিষ্টি। চোখদুটো টানা টানা। স্বাস্থ্য ঝকমক করে মুখে। মুখের দিকে তাকিয়ে বোঝার উপায় নেই পাঁচ বছর রিখু হাঁটাচলা করতে পারে না।
রিখু বললো, অনেককাল পরে এলে !
অফিসে ভীষণ কাজ।
রুমানা কেমন আছে ?
ভালো।
তুমি ?

আমি সহজে কথা বলতে পারি না। গলাটা আটকে আসে। আমি কেমন আছি রিখু, সেকথা তোমাকে কেমন করে বলবো ! আমি জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকি। দূরে কল্যাণপুরের ছোট্ট ব্রিজ। ব্রিজের ওপর থেকে জলে লাফিয়ে পড়ছে ন্যাংটো বাচ্চা ছেলেরা। কোন ফাঁকে বর্ষা এসে গেলো আমি টের পাইনি।
রিখু বললো, তুমি অতো রোগা হয়ে গেছো কেন ?
আমার কিছু ভাল্লাগে না।
রিখু হাসে। তোমার ছেলেমানুষিটা এখনো যায়নি। বউর সঙ্গে ঝগড়া করেছো ?
না।

তোমার ছেলেমেয়ে হয় না কেন?
রুমানা চায় না এতো তাড়াতাড়ি হোক।
তুমি চাইলে পারো।
আমি চাই, রুমানা চায় না।
একটা বাচ্চা তোমার দরকার। বাচ্চা হলে জীবনটা অন্য রকম লাগবে। রিখুদের চাকর ছেলেটা ট্রেতে করে চা আর বিকেলের খাবার নিয়ে আসে। রিখু নিজ হাতে খাটের ওপর একই জায়গায় বসে যত্ন করে নাশতার প্লেট এগিয়ে দেয়, খাও।
আমি শুধু চা খাবো।
অফিস থেকে ফিরলে না?
হ্যাঁ।
তাহলে শুধু চা খাবে কেন! পিত্তি পুড়ে যাবে।
রুমানা আমাকে কখনো এমন করে বলেনি। রিখু বলে, রিখু সব সময় বলে।
আমি নাশতার প্লেটটা নিই। তারপর খেতে খেতে উদাস হয়ে যাই। রিখু ছেলেবেলা থেকেই এ রকম। মায়াবী। আমরা একসঙ্গে বড়ো হয়েছিলাম। রিখুর প্রতিটি রোমকূপ আমার চেনা। আমারও সবকিছু রিখুর চেনা। আমরা দুজন দুজনকে ছাড়া কখনো কারো কথা ভাবিনি। তবুও কেমন করে যে সব উলটপালট হয়ে গেলো! রিখুর সঙ্গে বিয়েতে আমাদের ফ্যামিলিতে ঘোর আপত্তি উঠলো। শুনে রিখুদের বাসায়ও সবাই গেলো বেঁকে। আমি রিখুকে বলেছিলাম পালিয়ে বিয়ে করি। রিখু রাজী হয়নি। রিখুর ভেতর কোথায় লুকিয়েছিলো অসম্ভব একটা জেদ। সেই জেদ চাপতে গিয়ে মাসখানেক বাকরুদ্ধ হয়ে থাকলো। তারপর আস্তেধীরে নিম্নাঙ্গ প্যারালাইসড হয়ে গেলো। পুরু দুবছর রিখুর সঙ্গে দেখা করা আমার বারণ ছিলো। দুবাড়িতেই কড়া শাসন। পরে রুমানাকে বিয়ে করে আমাদের সম্পর্কটা আবার স্বাভাবিক হয়। কিন্তু ততোদিনে রিখু সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ। আগের কোনো কথা ভুলেও উচ্চারণ করে না। স্বাভাবিক মানুষের মতো দূরত্ব রেখে কথা বলে। তবুও বার বার আমাকে রিখুর কাছে ফিরে আসতে হয়। কোথাও কোন দুঃখ পেলে রুমানার কাছ থেকে অবহেলা পেলে রিখুর কাছে ফিরে আসা ছাড়া আমার কোনো উপায় থাকে না।
রিখু বললো, তোমার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো।
আমি উদাসভাবে চায়ে চুমুক দিই।
সন্ধেবেলা রিখু বললো, বাড়ি যাও। বউ ভাববে।
রুমানা মায়ের কাছে গেছে।
তবুও সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরতে হয়।

ওখানে আমার ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।
এ কথায় রিখু মৃদু হাসে। তারপর ডান হাতটা আমার মাথায় রাখে। আস্তে আস্তে বুলিয়ে দেয়। ছেলেমানুষি করো না।
রিখুর হাতে কি ছিলো কে জানে। আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ দুলে ওঠে। ছেলেমানুষের মতো রিখুর বুকে মুখ গুঁজে হু হু করে কেঁদে ফেলি। রিখু দুহাতে আমার মাথাটা জড়িয়ে রাখে। কি যে মায়ায়, ভালোবাসায়। এমনই তো কথা ছিলো। রিখু আজীবন আমার মাথা জড়িয়ে রাখবে!
রিখু আমার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো, ছেলেমানুষি করো না। নিয়তি আমাদের দুজনকে বহুদূর সরিয়ে নিয়ে গেছে। আমাদের ফেরার কোনো পথ নেই।

১৯৭৮

যে তুমি

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলো শাদা হাফপ্যান্ট, কোমরে কালো বেল্ট, শাদা হাফ শার্ট আর মাথায় হ্যাট পরা একটা ছেলে। পায়ের কাছে দুটো ঝাকায় বাঁশ কাগজের ঠোঙা সাজানো। ঠোঙার ভেতর ব্রেকফাস্ট।
আমার হাতদুটো ছিলো মাথার ওপর। দুহাতে হ্যাণ্ডেল ধরে দাঁড়িয়ে আছি। বাসের ভেতর গিজগিজে ভিড়। জায়গার তুলনায় লোক বেশি। তবুও খারাপ লাগছে না। ছেলেমেয়ে সমান। হৈ চৈ হচ্ছে, কথা হচ্ছে। চারপাঁচটা ছেলে একত্র হয়ে হাততালি দিয়ে গান গাইছে। মেয়েরা জলের মতন শব্দ করে হাসছে সেই গান শুনে।
বাসটা বেশ স্পিডে চলছিলো। জানালা দিয়ে হু হু করে আসছিলো হাওয়া। আমার বুকের কাছে তিনটে মেয়ের মাথা। মাঝখানের মেয়েটা নীল শাড়ি পরা। আমি এক পলকে মেয়েটার দিকে তাকাই। ঠিক তখুনি হাওয়ায় মিষ্টি একটা সেন্টের গন্ধ আসে। গন্ধ কি কখনো নীল হয়! আমার কেন যে মনে হয় গন্ধটা নীল শাড়ি পরা মেয়েটার গা থেকে আসছে। গন্ধের ভেতরও মিশে আছে প্রিয় নীল রং।
আমি তারপর আনমনা হয়ে যাই। আমি পরেছি মেরুন রংয়ের গেঞ্জি। কলার আর বুকের কাছটা লাল। প্যান্টটা কালো রংয়ের। পায়ে স্যাণ্ডেল,

হাতে ঘড়ি। রাতের বেলা হলে ছিলাম। দশ পয়সা স্টেকে জুয়ো খেলেছি। জুয়োতে আমি প্রায়ই জিতি। কাল জিতেছি একুশ টাকা সত্তর পয়সা। খেলা শেষ হতে রাত দুটো। তারপর শোয়া। এক রুমে ছবন্ধু। ঘুম কি আসে! তার ওপর বরাবরই আমার ঘুম আসে ভোর রাতে। নটা দশটা পর্যন্ত ঘুমুই। আজ উঠেছি সাড়ে পাঁচটায়। উঠে সেভ করা ইত্যাদি ইত্যাদি। সাড়ে ছটায় বাস। তার আগে দল বেঁধে চা খাওয়া। দিনটা শুরু হয়েছে অন্যরকম ভাবে।

এসব ভাবছি, আবার গন্ধটা পাই। চমকে উঠি। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে থেকেও আমি এতোক্ষণ একলা ছিলাম। ভেবে চারদিকে তাকাই। আমার সামনেই স্বপন দাঁড়িয়ে। স্বপন কালরাতে ঘুমোয়নি। ওর মুখটা চোষ কাগজের মতো খসখসে দেখাচ্ছে। স্বপনের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি আনমনে নিজের গালে হাত দিই, আমার মুখটাও খসখসে হয়ে আছে। দেখে স্বপন হাসে।

হঠাৎ স্বপন আমার পাশে দাঁড়ানো হাফপ্যান্ট পরা ছেলেটার দিকে তাকিয়ে কানে কানে বললো, ছেলেটা কিন্তু পাগল। ওর সঙ্গে কথাটথা বলিস না।

আমি হেসে বলি, পাগলের সঙ্গে পিকনিক।

স্বপন আমাকে জড়িয়ে ধরে গলা ছেড়ে হাসে। তখন আবার গন্ধ। নীল গন্ধ।

এবার আমি মাথা ঝুঁকিয়ে নীল শাড়ি পরা মেয়েটিকে দেখার চেষ্টা করি। প্রথমবার কেমন একটু বাঁধো বাঁধো লাগে। আমি সরাসরি কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে পারি না। তার ওপর স্বপন আমার পাশে। আমি ওদের গেস্ট হয়ে এসেছি। কোনো বাজে ব্যাপার ঘটলে ওদের প্রেস্টিজ।

আমি সরে আসি। কিন্তু ভেতরে ভেতরে উতলা হয়ে থাকি। মেয়েটাকে আমার দেখতেই হবে। মনে মনে বলি, তুমি কে? কে তুমি? তোমাকে আমি দেখব। সম্পূর্ণ করে দেখবো।

বাসের সবাই স্বপনের বন্ধু। একই ক্লাশে পড়ে। আমাকে নিয়ে স্বপন তাই খুব বেশি মেতে থাকতে পারে না। যে ছেলেগুলো হাততালি দিয়ে গান গাইছিলো, স্বপন গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। সেই ফাঁকে আমি উঁকি মেরে মেয়েটাকে দেখে নিই। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠি। হায়, এ আমি কার দিকে যাচ্ছি। তারেকের কথা মনে পড়ে। তারেক এখন নির্বাসনে আছে। চট্টগ্রামে। তারেক ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে সেভেনটি ফোরে। তারপর টানা দুবছর বেকার। নিয়মিত ইউনিভার্সিটিতে আড্ডা দিতো। রাত দুপুরে বাড়ি ফিরতো। কখনো অনেকদিন ফিরতো না। তারেকের সঙ্গে আমাকেও সূর্যসেন হলে মুকুলের রুমে থাকতে

হতো। তারেক ছিলো আমাদের মধ্যে সবচে লাজুক, গম্ভীর সুন্দর ছেলে। মোটা কাচের চশমা পরতো। চক্রাবক্রা জামাকাপড় পরতে পছন্দ করতো। কথা বলতো মেপে মেপে, সুন্দর মোটা ভয়েসে।

মেয়েটার দিকে একপলক তাকিয়েই আমি, বাসে করে পিকনিকে যাচ্ছি, সঙ্গে অনেক ছেলেমেয়ে, সব ভুলে যাই। মনে শুধু তারেক। তারেক, চট্টগ্রামে তুই কেমন আছিস?

তারেক ইচ্ছে করলে ঢাকায় চাকরি নিতে পারতো, কিংবা বিদেশে চলে যেতে পারতো। তারেক ওসব চায়নি। চেয়েছিলো এই মেয়েটাকে। না পেয়ে দূরে সরে গেছে। তারেকের সঙ্গে এখন আমাদের চিঠিপত্র সম্পর্ক।

তারেক আমাকে টিপটিপের কথা বলেছিলো। তারেক খুব চাপা স্বভাবের। টানা দুটো বছর রাতদিন আমরা একত্রে থেকেছি কিন্তু তারেক কখনো হৃদয় খুলে টিপটিপের কথা আমাকে বলেনি। কেবল এক রাতে সূর্যসেন হলের বাগানে বসে উদাস গলায়, চশমার কাচ মুছতে মুছতে বলেছিলো, যে কোমল বিষন্নতা টিপটিপকে ঘিরে রাখে, সে ওটুকুই সুন্দর। ও পায়ে নুপুর পড়ে, সেই শব্দ শুনে আমার কেবল মনে হয়, ও দুটো পা আমি চিরকাল বুকে করে রাখতে পারবো।

আমি জানি না টিপটিপ তারেককে কেন ফিরিয়ে দিয়েছে। প্রবলেমটা কি ছিলো!

তবুও এই মুহূর্তে তারেকের কথা ভেবে টিপটিপের ওপর আমি আস্তে ধীরে রেগে যাই। টিপটিপ, তুমি কি?

ভেতরে ভেতরে একটা পাগলা বুদ্ধি খেলা করে। টিপটিপের সঙ্গে আমি কখনো কথা বলিনি! কেন বলিনি? রাগে?

আজ বলবো। হুবুহু তারেকের মতো করে সব বলবো। আমি আজ তারেক হয়ে যাবো। টিপটিপ কতোবার তারেককে ফেরাবে? কতোজন তারেককে ফেরাবে?

আমরা একটা সুন্দর জায়গায় নামি। চারদিকে শালবন। মাঝখানে ছোট্ট একটা বাংলো, একটা মাঠ। আমি বাসে বসেই চারদিকটা দেখে নিই। সবাই নেমে গেছে। স্বপনও। আমি ইচ্ছে করেই বসে থাকি। একটু পরে নামবো। এটা আসলে একটা চালাকি। টিপটিপ খানিকক্ষণ আগে আমার পাশ দিয়ে নেমে গেলো। যাওয়ার সময় এক পলক আমাকে। চোখ দেখে বোঝা গেলো টিপটিপ আমাকে চেনে। বা আমি তো এই চাই।

মাঠে নেমে টিপটিপ আর একটা মেয়ে রোদে মুখ দিয়ে দাঁড়ায়! আমি দূর থেকে দেখি টিপটিপের কাঁধে আকাশ রংয়ের পুঁতির কাজ করা ব্যাগ, আর একটা ক্যামেরা।

দেখে শুনে আমি আস্তে ধীরে বাস থেকে নামি।
এখন চারদিকে সব আয়োজন শুরু হয়ে গেছে। রান্নাবান্না, ব্রেকফাস্ট ইত্যাদি ইত্যাদি। ছেলেমেয়েরা সব ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেছে। দেখে আমার খুব দুঃখ হয়। আমি কার দলে যাবো!
হঠাৎ খেয়াল হয় টিপটিপের সঙ্গের মেয়েটি আমার চেনা। আমার বন্ধু জীবনের বোন। নাম মিনি। আমি কখনো মিনির সঙ্গে কথা বলিনি। মিনির সঙ্গে আমার ভাব নেই। শুধু চেনা। মিনি জানে আমি জীবনের বন্ধু, আমি জানি মিনি জীবনের বোন।
মিনি কি টিপটিপের বন্ধু? হবে হয়তো। তাহলে মিনির সঙ্গে আজ ভাব করে নেবো। এইসব ভেবে বাস থেকে নামি।
চারদিকে ছড়িয়ে আছে উজ্জ্বল একটা দিন। মাঠের মধ্যে দাঁড়ানো বিআরটিসির বাস। সামনে বাংলো, ছড়ানো ছিটানো রঙিন ছেলেমেয়ে। ক্যামেরা নিয়ে বেশ কজন মেতে গেছে। ক্লিক ক্লিক ছবি উঠছে। স্বপ্নকে দেখি মহা ব্যস্ত। ওর ব্যস্ত থাকারই কথা। থাক। আমি একা একাই থাকবো।
কিন্তু মিনি আমাকে দেখেই ডাকে, নীলুদা
আসলে আমার নাম নীল। নীল নামে ডাকা বেশ কষ্টকর। তাই বন্ধুরা আমাকে নীলু বলে। মিনি নীলুর সঙ্গে হিন্দুয়ানা স্টাইলে দা যোগ করেছে। আর কি আশ্চর্য মিনির ডাক শুনে মনে হলো বহুকাল পর আমাকে কেউ ডাকলো। আমি কি আসলে ঘোরের ভেতর ছিলাম!
কাছাকাছি যেতেই মিনি বললো, আপনি আমাদের সঙ্গে এসেছেন দেখলাম না তো!
আমিও তো তোমাকে দেখিনি!
মিনি তখন টিপটিপের দিকে তাকায়। এসো পরিচয় করিয়ে দিই
আমি টিপটিপের দিকে তাকাতেই টিপটিপ বললো, আমি চিনি।
শুনে মিনি এবং আমি দুজনেই অবাক হই। আমি জেনে, মিনি না জেনে।
মিনি বললো, কেমন করে চেনো?
আমি বলি, তাই তো!
টিপটিপ হাসে।
ঠিক তখুনি একটা বাচ্চা ছেলে, মাথায় রসের হাঁড়ি, আমাদের পাশে এসে বললো, স্যার রস খাইবেন?
শুনে টিপটিপ লাফিয়ে ওঠে। খেজুরের রস? খাবো।
প্রথমে মিনি তারপর টিপটিপ তারপর আমি। আমি গ্লাসটা হাতে নিয়ে বসে পড়ি। বসে গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়াবো ঠিক সেই মুহূর্তে, জীবনে এই প্রথম সরাসরি একটা মেয়ের দিকে তাকাই। টিপটিপও তাকিয়েছিলো

আমার দিকে। টিপটিপের চোখ খুব সুন্দর। তারেক এই চোখের দিকে কতোবার তাকিয়েছে! কতোবার বলেছে, টিপটিপ তোমার চোখ খুব সুন্দর!

মিনি বললো, চলুন ঘুরে আসি।

তোমাদের সঙ্গে পার্টনার নেই?

না।

টিপটিপ বললো, আপনার সঙ্গে?

আপাতত নেই।

তাহলে চলুন।

ততোক্ষণে মাঠটা ফাঁকা হয়ে গেছে।

ছেলেমেয়েরা গ্রুপ করে ছড়িয়ে পড়েছে। মাঠের মাঝখানে খালি গায়ে জিনসের প্যান্ট পরা কয়েকজন নেচে নেচে পপ গান গাইছে। কয়েকটা মেয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। নিশ্চয় ওদের পার্টনাররা গান গাইছে। কিন্তু স্বপন কোথাও নেই।

আমি টিপটিপের সঙ্গে শালবনের ফাঁকফোঁকর দিয়ে, রমণীদের সিঁথির মতো চিরল পথে হারিয়ে যাই।

কিন্তু বনটি বড়ো রুগ্ন। গাছপালা সব বিবর্ণ। তলায় পড়ে থাকা পাতার ওপর কয়েকদিন আগে আগুন দেয়া হয়েছিলো। পুড়ে কেমন বিচ্ছিরি হয়ে আছে। দেখে আমি বিরক্ত হই। কিন্তু টিপটিপরা সঙ্গে আছে। কিছু বলা যায় না।

খানিক হাঁটার পর আবার একটা খোলা মাঠ। মাঠের মধ্যিখানে চারদিকে রেলিং দেয়া হলুদ রংয়ের চারতলা একটা বিল্ডিং। রুমটুম নেই। বাঁকা সুন্দর সিঁড়ি উঠে গেছে। বোঝা যায় পিকনিক করতে এসে লোকজন ওখানে চড়ে উপর থেকে বনভূমি দেখে। আমি বিল্ডিংটার দিকে তাকিয়ে বললাম, স্বর্গের বারান্দা।

মিনি বললো, চলুন উঠি।

টিপটিপ বললো, না।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখ পড়ে চারতলার মাথায় কয়লা দিয়ে লেখা অনেকগুলো নাম। লোকজন যে কোনো জায়গায় নিজস্ব চিহ্ন রেখে যেতে পছন্দ করে। আমি অনেক দেখেছি। দুএক জায়গায় নিজেও লিখে এসেছি। যেমন কান্তনগরে, কান্তজীর মন্দিরে শাদা চক মাটিতে লিখে এসেছিলাম, 'নীল, তুমি যে এসেছিলে কেউ তা জানলোই না।'

কিন্তু চারতলার দেয়ালে অনেকগুলো নামের মধ্যে তারেকের নামটা দেখে আমি চমকে উঠি। টিপটিপ কি ঐ নামটা দেখেই। এখানে কে এসেছিলো, কোন তারেক! জায়গাটাকে আমি স্বর্গের বারান্দাই বা বললাম কেন? ওখান থেকে পৃথিবী কি খুব সুন্দর দেখায়! কিংবা মানুষজনদের খুব সুখী!

আমার ভেতর কি যেনো একটা ভাঙচোর হতে থাকে। এই কি আমার নিয়তি! এ রকম নির্জন বনভূমিতে, চারতলার ওপর, আমি যার নাম দিয়েছি স্বর্গের বারান্দা, যেখানে তারেক নামটির সঙ্গে আমার দেখা হবে!

টিপটিপ বললো, চলুন।

আমি কথা না বলে হাঁটি।

বনের ভেতর জমে ছিলো ঝরা পাতা আর নির্জনতা। এসব ভেঙে ভেঙে আমরা হাঁটি। দূরে কোথাও একটা কোকিল ডাকে। কি সুন্দর ডাক। শুনে আমি মুগ্ধের মতো বলি, কোকিলটা একবারই ডেকেছিলো। কেন যে বলি! টিপটিপ চমকে আমার মুখের দিকে তাকায়। মুহূর্তে বুঝতে পারি, আমার হচ্ছে। তারেক কি এভাবে কথা বলে। আমি বোধহয় পারবো।

মিনি বললো, চলুন কোথাও বসি!

টিপটিপ বললো, আর একটু যাই তারপর। বলেই টিপটিপ আমার মুখের দিকে তাকায়। আমি টিপটিপের দিকে।

আমি পারছি। পারছি।

সামনে একটা বাঁক। পথটা ঘুরে গেছে। সেই বাঁকের কাছে আসতেই মাথায় মাটির কলস একটা বুড়োর সঙ্গে দেখা। টিপটিপ বললো, রস! খাবেন?

হ্যাঁ।

মিনি বললো, না।

কেন?

মিনি মৃদু হেসে টিপটিপের দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে আমার হয়ে যায়। মিনি খুব চালাক মেয়ে। বেশি রস খেলে বাথরুমের ব্যাপার আছে। হেসে টিপটিপকে তা বুঝিয়ে দিলো।

কিন্তু আমার তো এসব প্রবলেম নেই। আমি লোকটাকে দাঁড় করিয়ে বলি, একগ্লাস।

বুড়ো কেমন কায়দা করে গ্লাস ভরে। কিন্তু রসের চেহারা দেখে আমি হা। ভাতের মাড়ের মতো। অবাক হয়ে বলি, এ কি?

লোকটা বলে, তাড়ি।

মিনি বললো, এমা আপনি তাড়ি খাবেন?

আমি কখনো তাড়ি খাইনি। কিন্তু এই মুহূর্তে হাতের কাছে দেখে, মাত্র এক টাকা গ্লাস, খেতে ভারি সাধ যায়। তাছাড়া কিঞ্চিত মাতাল না হলে অভিনয় করবো কেমন করে!

টিপটিপ বললো, খান। খেলে কি হয়!

আমি একটানে পুরো গ্লাস। তারপর একটাকা দিয়ে আবার হাঁটা।

মিনি গুণগুণ করে গান গাইছিলো। সেই গান শুনতে শুনতে খানিকটা টের পাই, আমার মাথার ভেতরটা টালমাটাল হয়ে যাচ্ছে। তাড়ির গুণ। কোথাও বসতে হয়। শুনেছি তাড়ি খেয়ে রোদে হাঁটলেই ধরবে।

তবুও আমি একটা সিগারেট ধরাই। নেশার মধ্যে নেশা। ব্যাপারটা জমবে।

কিন্তু সিগারেট ধরাতে গিয়েই নতুন একটা ব্যাপার আবিষ্কার করি। কোথায় যেনো ঝুমঝুম করে বাজছে একজোড়া নুপুর। কোথায়। কোথায়। আসলে নুপুর বাজছিলো টিপটিপের পায়ে। তারেকের মুখে অনেককাল আগে শুনেছি টিপটিপ নুপুর পরে। ওর ভেতর কোথায় যেনো একটা রানী রানী ব্যাপার আছে।

আমি রোদে সিগারেটের ধোঁয়া ভাসিয়ে বলি, কোথায় যেনো একটা মিউজিক হচ্ছে।

মিনি বললো, টিপটিপের পায়ে!

আমি তারপর আর কোনো ভনিতা না করে বলি, ওদুটো পা আমি চিরকাল বুকে করে রাখবো।

শুনে টিপটিপ চমকে ওঠে। আমার দিকে তাকায়, তাকিয়ে থাকে।

আমি পারছি। পারছি। আমি তারেক হয়ে গেছি। টিপটিপ তুমি কতোবার তারেককে ফেরাবে!

মিনি বললো, এসব কি তাড়ির গুণ!

না, সত্যি!

তাহলে আরো আগে হলো না কেন!

প্রিপারেশান নিচ্ছিলাম।

টিপটিপ কোনো কথা বলে না। আমার দিকে তাকায়। সুযোগ পেলেই তাকায়। ও কি বুঝতে পারে অনেককাল পর আবার তারেক এসে দাঁড়িয়েছে ওর কাছে! কৃষ্ণের মতো হাঁটু গেড়ে বসে এই নির্জন বনভূমিতে রাধার কাছ থেকে রাধাকে, টিপটিপের কাছ থেকে টিপটিপকে চেয়ে নেবে।

এবারও কি টিপটিপ তারেককে ফিরিয়ে দেবে!

একটা নির্জন জায়গায় পড়েছিলো খানিকটা ছায়া। দেখে টিপটিপ বললো, চলুন বসি।

আমার কোনো কথা নেই। টিপটিপ যা বলবে তাই হবে।

আমরা পাশাপাশি বসি। আমি আর টিপটিপ। মিনি সামনে, আমাদের মুখোমুখি। মিনি অনেকক্ষণ ধরে গুনগুন করছিলো দেখে আমি বলি, মিনি গান গাও।

আমি গান পারি?

টিপটিপ বলে, পারো না বুঝি! গাও।

খানিক সাধাসাধির পর মিনি গায়। যখন প্রথমে ধরেছে কলি, আমার মল্লিকা বনে

মিনি খুব নিচু স্কেলে গায়। গলাটা দূরাগত। আর স্টাইলটা কানন দেবীর মতো। শুনে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই।

টিপটিপ বসেছিলো আমার একেবারে গা ঘেঁষে। দুটো মাটির ঢিবির মধ্যিখানে চিরল নালা। আমরা দুজন দুপাশে বসে। নালাটা আগে খেয়াল করিনি। মাথায় তাড়ির টলমলে নেশা। কি দেখতে যে কি দেখি! কিন্তু টিপটিপের দিকে তাকাতে ওর শাদা হাতের দিকে চোখ যায়। বা কি সুন্দর লোম!

সত্যি টিপটিপের হাতে চমৎকার লোম। শাদার ওপর হালকা বাদামী। এই হাত দুটো দেখে যে কেউ টিপটিপের প্রেমে পড়ে যেতে পারে। তারেক কি এ হাত দেখেই! হবে হয়তো। নইলে আমার প্রশংসায় টিপটিপ অমন করে কেঁপে উঠলো কেন!

মিনি বললো, নীলুদা তোমরা বসো আমি একটু ঘুরে আসি।

টিপটিপ বললো, কোথায়?

এই সামনে। তারপর একটু মুচকি হাসলো। টিপটিপ কি বুঝলো কে জানে, আর কোনো কথা বললো না।

মিনি চলে গেলো।

আমার মাথার ভেতরটা অনেকক্ষণ ধরে চিনচিন করছিলো। বুঝতে পারি তাড়ি বেশ কাজ করছে।

হঠাৎ সব ঝেড়েঝুরে টিপটিপের দিকে তাকাই। কিছু বলুন।

টিপটিপ হাসে। আপনি বলুন।

কি বলবো?

যা ইচ্ছে।

শুনে আমি টিপটিপের মুখের দিকে তাকিয়েই থাকি। তারেক যা বলেছিলো, আসলেই তাই। টিপটিপের চেহারায় এক ধরনের কোমল বিষণ্ণতা আছে। টিপটিপ সেটুকুই সুন্দর।

আমি বলি, টিপটিপ, যে কোমল বিষণ্ণতা আপনাকে ঘিরে রাখে, আপনি ওটুকুই সুন্দর।

তাই!

তাই।

আমার আর কি সুন্দর।

আমি আর কিছু বলতে পারি না। আসলে আমি তো টিপটিপকে দেখছি না। দেখছে তারেক।

টিপটিপ বললো এসব কথা আমি আগেই শুনেছি।

আর একবার আমার কাছ থেকে শুনুন।

আপনি নতুন কিছু বলুন।
আমার নতুন কোনো কথা নেই।
থাকা উচিৎ।
আমি তখন ভাবতে বসি। আমার কি বলার আছে!
টিপটিপ বললো, বলুন না।
কি বলবো?
যা ইচ্ছে।

আমি তখন আস্তে ধীরে স্বপ্নের ভেতর চলে যাই। আচ্ছন্নের মতো দূরাগত দুঃখি গলায় বলতে থাকি, তেরো বছর দুমাস আগে, একদিন দুপুরবেলা খুব নির্জন ছিলো। বর্ষাকাল। সেবার বর্ষায় বিক্রমপুরে প্রবল বন্যা হয়। আমি থাকতাম নানীর কাছে। একা। মা বাবা আর সব ভাইবোন নিয়ে শহরে। বর্ষাকালে আমার সময় আর কাটতো না। জানালায় বসে বাগানে বর্ষার কোমল জলে স্রোতের খেলা দেখতাম।
সেই দুপুরে, বর্ষাকাল, তবুও কোথায় যেনো বহুদূরে একটা কোকিল একটানা খানিকক্ষণ ডেকেছিলো। সেই ডাক আমাকে কি যে উতলা করেছিলো! সেই ডাকটা এখনো আমাকে ছাড়েনি। মাঝে মধ্যে স্বপ্নের ভেতর শুনি কোকিলটা ডাকছে। আজও খানিকক্ষণ আগে ডেকেছিলো। কেন যে ডাকে! এই অব্দি বলে আমি চমকে যাই। কার কাছে কি বলছি। টিপটিপ কে? মাথার ভেতরটা টলমল করে ওঠে। মনে পড়ে, আমার সব মনে পড়ে। আমি আজ তারেক হয়েছিলাম। টিপটিপের কাছে তারেক অনেককাল পর আজ আবার এসেছিলো। কিন্তু এবারও তারেক পারলো না। অন্য একজন মানুষের কথা টিপটিপকে বলে গেলো। টিপটিপ আজ থেকে কার কথা ভাববে? সেই মানুষটির না তারেকের! হায়, তারেক আবার হেরে গেলো। টিপটিপ তারেককে আর একবার ফিরিয়ে দিলো। তারেকের জন্যে আমার খুব দুঃখ হয়।

১৯৭৮

দূরে কোথায়

অকটোবরের এক বিষন্ন দুপুরে আমরা দুজন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। '৭৯ সালের কথা। সেদিন উদ্যানে ছিলো মায়াবী হাওয়া, বেড়ালের

গায়ের মতো মোলায়েম রোদ আর তীব্র নির্জনতা। গাছপালার ছায়ায় সব মিলেমিশে ছিলো স্বপ্নের চেয়েও প্রিয় পরিবেশ।

আমরা দুজন গাছপালায় ছায়া ভেঙে রোদ হাওয়া আর নির্জনতা ভেঙে হাঁটি, হাঁটতে থাকি। আমার হাতে ছিলো সিগারেট, কেন যে টানতে ভুলে যাচ্ছিলাম।

সেই মেয়ে পরেছিলো বরফ রংয়ের শাড়ি। লাল চওড়া পাড় তার। কাঁধে বাটিকের কাজ করা ব্যাগ। খানিক আগে ইউনিভার্সিটির ক্লাস শেষ করেছে। তার চোখে ছিলো গত রাতের নিদ্রাহীনতার চিহ্ন। শাদা সুন্দর কপালে ছিলো প্রাতকালীন সূর্যের মতো মনোরম টিপ। চুলে চিরুনি বুলিয়েছে কোন সকালে, দুপুরে চিরুনির ছায়া ছিলো না চুলে। কোমর অব্দি লম্বা চুল অগোছালো ছিলো। হাওয়ায় চুলের গড়াগড়ি। আনমনে বারবারই মুখের ওপর থেকে, গাল কপাল থেকে চুল সরাচ্ছিলো সে।

আড়চোখে আমি তাকে দেখি। দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। যুবতী, তুমি জানো না তুমি কতো সুন্দর।

মুখে বলা হয় না। সিগারেটে শেষ টান দিই। তখন সে কথা বলে। আমার মনে হয় জন্মের পর এই প্রথম তার মুখে ভাষা ফুটে উঠলো। আর আমি সেই সৌভাগ্যবান পুরুষ, যুবতীর ভাষা ফোটার মুহূর্ত দেখছি।

সে বললো, কদিন ধরে আমার সবকিছু কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

আমি কিছু বুঝতে পারি না। বোকার মত জিজ্ঞেস করি, কেন?

এই প্রশ্নে পৃথিবীর কোথায় যে কি একটা ভাঙচোর হয় মুহূর্তে, আমি বুঝতে পারি না। সেই মেয়ে হাঁটতে ভুলে যায়। তারপর বিষন্ন চোখ তুলে আমার দিকে। তার চোখে তাকিয়ে আমি ভুলে যাই পৃথিবীতে এখনো মানুষেরা বেঁচে আছে, আরো অনেককাল বেঁচে থাকবে। মৈথুন করবে, সন্তান জন্ম দেবে, যুদ্ধ করবে। পার্কে তখনো হাওয়া ছিলো, রোদ ছিলো। আর ছিলো নির্জনতা। ভুলে যাই, আমি সব ভুলে যাই।

তারপর মনে পড়ে, কাল থেকে আমি এই শহরে থাকবো না। এই মেয়ের সঙ্গে কতোকাল যে আমার দেখা হবে না। হয়তো বা এই জন্মের আড়ালে আমরা দুজন ঢাকা পড়ে যাবো। কখনো কারো সঙ্গে কারো আর দেখা হবে না। হায়রে মানুষজন্ম।

কিন্তু যুবতী কি সেই শোকে!

কথাটা ভেবে আমার মন ভাল হয়ে যায়। কাল রাতে আমার কথা ভেবে কি তার ঘুম হয়নি! আমার কথা ভেবেই কি তার সব এলোমেলো! চুলে চিরুনি বুলোতে ভুলে যায়। ড্রেসিং টেবিলে সাজতে বসে লম্বা আয়নায় সে কি এ কদিন কেবলই আমার মুখ দেখেছে। হায়, আমার যে কতোকাল

পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। কতোকাল যে এই শহরে থেকে যেতে ইচ্ছে করে! এই দৃশ্যের কাছে, এই এলোমেলো যুবতীর কাছে।

উপায় নেই, আমার কোনো উপায় নেই।

তখুনি, ঠিক তখুনি আকাশ ভেঙে চুরে উড়ে যায় এক তেজী উড়োজাহাজ। সেই শব্দে কি যে ছিলো, যুবতী আনমনে তার ডান হাত রাখে বুকে। তারপর বিষন্ন গলায় বলে, কদিন ধরে কি যে হচ্ছে, প্লেনের শব্দ শুনলেই বুকের ভেতরটা হু হু করে ওঠে।

এইসব মুহূর্তে কি বলতে হয় আমি জানি না। চোখের সবটুকু দৃষ্টি নিয়ে সেই মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিছু বলতে হবে, আমাকে কিছু বলতে হবে, ভুলে যাই। আমি সব ভুলে যাই।

সে বললো, চলো বসি। আমার কিছু ভাল্লাগছে না।

সামনে ছিলো এক চিলতে খোলা মাঠ। রোদ হাওয়া এবং নির্জনতায় বোকার মতো পড়ে আছে মাঠটা। তারপর ছোট্ট মতো শুকনো একটা পুকুর। পুকুরের চারদিক জুড়ে কতো যে ফুলের গাছ, পাতাবাহারের গাছ। শিশুর মতো অবোধ হাওয়া সেইসব গাছপালা নাড়িয়া বয়ে যায়। কেবলই বয়ে যায়।

আমরা দুজন চুপচাপ সেদিকে হেঁটে যাই। কোথাও কি তখন নির্জনতা ভেঙে একটা পাখি ডাকে!

ঝোপঝাড়ের ছায়ায় আমরা দুজন তারপরে বসে থাকি। উদাস, বিষন্ন। আমার তখন কেবল মনে হয়, এই সুন্দর দৃশ্যটির কাছে আমার কতোকাল ফেরা হবে না!

বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে।

সেই যুবতী তখন একটা লম্বা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে আনমনে দাঁতে কাটছে। চোখে মুখে শূন্যতার ছায়া। দেখে আমার বুক ফেটে যায়। চোখ ভরে আসে জলে। হায়, কেন যে এই যুবতীর সঙ্গে আমার আরো অনেককাল আগে দেখা হয়নি! ঈশ্বর কি নিষ্ঠুর! পৃথিবীর কি এমন ক্ষতি হতো, যদি আরো অনেককাল আগে আমাদের দেখা হতো!

পৃথিবী কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে করে। আমাদের কি অপরাধ ছিলো! তারপর ভাবি কাল যখন আমি বহুদূর চলে যাবো, তারপর থেকে এই যুবতী কি করবে! সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে ভেসে ওঠে বিষন্ন এক দৃশ্যের ছবি। আকাশের অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে মন্থর এক উড়োজাহাজ। সেই শব্দে পাগলের মতো ঘর থেকে ছুটে বেরোয় যুবতী। সাজগোজের বালাই নেই তার। পরনে রাতের বাসি শাড়ি, এলোমেলো। পায়ে স্যাণ্ডেল নেই, মুখে চোখে নিদ্রাহীনতার চিহ্ন। কখন যে চোখের কোলে গাঢ় হয়ে জমেছে কালি, সে টের পায়নি। বারান্দার রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে সে। মাথার অনেক উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে

সেই উড়োজাহাজ। উড়োজাহাজের দিকে তাকিয়ে কখন যে সে আনমনে তুলেছে তার ডানহাত! তারপর সেই উড়োজাহাজের এক যাত্রীর উদ্দেশ্যে হাতটা একটুখানি নাড়িয়ে দেয়। ভালো থেকো, সুখে থেকো প্রিয়তম। চোখ দুটো কি তার তখন জলের ছোঁয়ায় ছলছল! কেবল ওটুকুই আমি দেখতে পাই না!

সেই মেয়ে বললো, হাওয়া কি কখনো অচেনা হয়?

আমি আনমনে বলি, কি জানি!

হয়! কদিন ধরে আমি একটা অচেনা হাওয়ার গন্ধ পাই। বহুদূর থেকে আসে বহুদূর চলে যায়। আমি সেই হাওয়াটা চিনতে চাই। পারি না। তুমি চলে যাওয়ার পরও কি সেই হাওয়ার সঙ্গে আমার দেখা হবে?

জানি না। আমি কিচ্ছু জানি না।

সেই মেয়ে তারপর আমার চোখের দিকে তাকায়। তাকিয়ে থাকে। আমিও। মুহূর্তে যে কতোকাল পেরিয়ে যাই আমরা! জন্ম থেকে জন্মান্তরে। পৃথিবী দ্বিগুণ বয়স পেয়ে যায়। আমাদের খেয়াল থাকে না। তখন দূরে কোথায়, মাইক কিংবা রেডিও কিংবা উচ্চ ভল্যুমের ক্যাসেট রেকর্ডারে বেজে ওঠে সচীন দেব বর্মনের গান, শতাব্দীর ক্রন্দনের মতো, দূর কোন পরবাসে তুমি চইলা যাইবারে, বন্ধুরে কবে আইবারে

চমকে উঠি, আমরা দুজনেই চমকে উঠি। সেই মেয়ে পাগলের মতো টেনে নেয় আমার ডান হাত। তারপর হাতখানি বুকে জড়িয়ে হু হু করে কাঁদে। কাঁদতে থাকে।

তারপর পশ্চিম জার্মানী।

একদিন বন হফট বান হোপে (প্রধান স্টেশন) একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছি। নভেম্বর মাত্র শুরু হয়েছে। সঙ্গে শীত। অক্টোবরের শেষ দিকেই শীত নামতে শুরু করে জার্মানীতে। নভেম্বরের মাঝামাঝি শুরু হয় বরফ পড়া। কখনো চৌপর দিন ধরে পড়ে। কখনো দু তিন ঘন্টা নাগাড়ে পড়ে থামে। তারপর আবার পড়ে, এই রকম। আর শীত। মাত্র জার্মানীতে এসেছি, বাংলাদেশী, শীতটা, আ বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিলো। টানা সাতদিন একটা ঘরের ভেতর বসেছিলাম। শীতের ভয়ে। ঘরে হাইসুঙ (হিটার) ছিলো বলে মনে হতো—ঢাকায়ই আছি। উষ্ণতাটুকু প্রেমিকার শরীরের মতো।

শীতটা টের পেতাম ছ'তলা থেকে নামার সময়। সিঁড়িতে। মনে হতো মৃত্যুর সিঁড়ি বেয়ে গভীরে নেমে যাচ্ছি। তারপর বাইরে সিগারেট কিনতে গিয়ে অটোমেটে (এক ধরনের অটোমেটিক মেশিন। বিভিন্ন রকমের সিগারেট সাজানো ভেতরে। তিন মার্কের কয়েন ফেলে পছন্দ-মতো সিগারেট বের করা যায়। জার্মানীর জনপ্রিয় সিগারেট মারলবোরে।

আমাদের স্টারের মতো। মারলবোরে ছিলো আমার ব্রাণ্ড) পয়সা ফেলে সিগারেট বের করতে তেতাল্লিশ সেকেণ্ড, ঐ সময় মনে হতো, মৃত্যু কি এরচেও শীতল!

যদিও আমি একগাদা কাপড় পরে বেরুতাম। ভাগ্যিস ওই অবস্থায় কখনো নিজের ওজন নিইনি। তাহলে নির্ঘাত সাড়ে ছয় কিলো ওজন বেশি হতো।

তবুও শীত। মনে হতো পৃথিবীতে মানুষের ব্যবহারের জন্য এমন কোনো বস্ত্র তৈরি হয়নি, যাতে জার্মানীর শীত ঠেকানো যায়।

তো সেদিন বিকেলবেলা, সাতদিন পর, যা আছে কপালে বলে একাকী বাড়ি থেকে বেরুই। পরনে মোটা কডের প্যান্ট তার নিচে উনটেন হোজে [প্যান্টের নিচে পরার তুলো কিংবা গেঞ্জি জাতীয় কাপড়ের তৈরি, গোড়ালি অবধি লম্বা একটা জিনিশ]। তার নিচে মোটা একখানা জাঙ্গেও ছিলো। আর উপরে, তার আগে পায়ের কথাটা বলা দরকার। পায়ে উলের মোটা মোজা। ওই জাতীয় মোজা ছেলেবেলায় আমার এক নানাকে পরতে দেখেছি। শীতকালে। দেখে কতো যে হাসাহাসি করেছি। সেই জিনিশটা মাত্র তেইশ বছর বয়সে আমার পায়ে, ভাবা যায়! শালা নিজেকে নানা নানা মনে হয়। তার ওপর মোটা চামড়ার জুতো তো ছিলোই।

এবার কোমরের উপর থেকে বলা যাক। প্রথমে একখানা স্যাণ্ডো গেঞ্জি, তারপর উলের মোটা ফুলহাতা গেঞ্জি, তার ওপর হাফহাতা হাতে বোনা নীল রংয়ের একটা জাম্পার। শাদা শার্টের ওপর এই জাম্পারটি পরে বাংলাদেশের পৌষ মাসে কতো সন্ধ্যায় যে প্রেম করতে গেছি। সেই মেয়ের কাছে। নীল রং তার বড়ো প্রিয় ছিলো। এখানে চল্লিশ দশকের বাংলা প্রেমের উপন্যাসের নায়কের মতো বলা যায়, জাম্পারটি সেই মেয়ে অতি যত্নে, বিপুল প্রেমসহ অবসর সময়ে, অনেককাল ধরে আমার জন্য বুনেছিলো। কতোবার যে আমার বুক পিঠের মাপ নিয়েছিলো। আসলে মিথ্যে কথা। জাম্পারটি দিয়েছিলেন আমার এক খালা।

সেখানার ওপর আমি চাপিয়েছিলাম একটি পুলওভার। ঘি রংয়ের। গলাবন্ধ। যে কারণে মাফলারের দরকার হয়নি। কিন্তু এখানেই শেষ নহে। পুলওভারের ওপর ছিলো একটি লাল রংয়ের চেক কোট। জার্মানী যাওয়ার দিন সকালবেলা বড়ো ভাই জিনিশটা আমায় পরিয়ে দিয়েছিলেন। শুনেছি ওখানে খুব শীত।

মাথায় উলের টুপি ছিলো। হাতে ছিলো চামড়ার গ্লাভস। ভেতরে তুলো দেয়া। এ অবস্থায় বেরিয়েছি। যখন রাস্তা দিয়ে, হাতে মারলবোরে পোজ নিয়ে টানছি, হাঁটছি, দুএকজন ফ্রয়লাইন [যুবতী] আমাকে দেখে হাসছিলো। দেখে, মিথ্যা বলবো না আমার খুব ভালো লাগছিলো। গর্বে

বুক ফুলে উঠছিলো। আমাকে নিশ্চয় দারুণ লাগছে দেখতে। গোপনে দুএকবার গলা খাঁকারিও দিই।

কিন্তু ঘটনাটি ছিলো সম্পূর্ণ উল্টো। ওরা হাসছিলো একটি পাঁচ ফুট সাড়ে আট ইঞ্চি [নিজের হাইট কখনো মাপিনি! অনুমান করি এ রকমই হবে]। লম্বা প্যাকেট রাস্তা দিয়ে হাঁটছে দেখে।

এই অবস্থায় বানহোপ এলাকায় পৌঁছুই। সেখানে প্রচুর দোকানপাট, বার, পাব আর জনপ্রিয় মেকডোনালড, অপেক্ষাকৃত সস্তায় উপাদেয় খাদ্য বেচে। ম্যাকডোনালড সাহেবের সঙ্গে কোথায় যেনো বাটা জুতোর প্রতিষ্ঠাতা অ্যালবার্ট টমাস বাটার একটা গোপন মিল আছে। বাটা দায়িত্ব নিয়েছিলো সস্তায় মানুষকে জুতো পরাবেন। ম্যাকডোনালড নিয়েছিলেন সস্তায় ফুলপেট খাইয়ে দেয়ার দায়িত্ব। এরা দুজনেই গত। দায়িত্ববান লোকেরা কি বেশিকাল বেঁচে থাকে না! থাকলে পৃথিবীর অনেক উপকার হতো।

ম্যাকডোনালডে বিকেলের দিকে সাধারণত দুএকজন বাঙালী থাকে। বসে আড্ডা মারে, কফি খায়। সেই লোভে আমি ম্যাকডোনালডে ঢুকি। তারপর চারদিক তাকিয়ে বাঙালী খুঁজি। নেই, একজনও নেই। মনটা খারাপ হয়ে যায়। ফিরে যাবো!

না, কিছু না খেয়ে ফিরলে লোকে কি ভাববে। বাঙালীপনা। এককাপ কাফে [কফি] নিই। কফি জিনিশটা আমার খুব একটা পছন্দ নয়। গরম কফি খেলে আমার হার্ট বিট বেড়ে যায়। বহুকাল বাদে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গেলে যেমন হয়।

তবুও নিই। কফি নিয়ে আমার একটা চমৎকার স্মৃতি আছে। একবার শীতকালে আমরা ক বন্ধু দিনাজপুর বেড়াতে গেছি। সেখানে আমাদের অনেক বন্ধু ছিলো। যার বাড়িতে উঠেছিলাম, আলোক মিত্র, তার ছোট বোন শুভ্রা। শীতকাল ছিলো বলে সেও বেড়াতে এসেছিলো দিনাজপুরে। বন্ধুর ছোট বোন, এক সন্ধ্যায় আমাদের দিদি হয়ে যায়। কারণ এককাপ কফি। কি যে চমৎকার কফি করে খাইয়েছিলো শুভ্রা। স্বাদটা এখনো জিভে লেগে আছে। ম্যাকডোনালডের কফিতে চুমুক দিয়ে শুভ্রার কথা কি আমার মনে পড়েছিলো! তার হাতের কফির কথা! হবে। নয়তো ম্যাকডোনালডের মতো বিখ্যাত কফি কেন আমার ভালো লাগেনি! দু চুমুক খেয়ে দ্রুত তালের হার্ট বিট নিয়ে কেন বেরিয়ে যাই!

তারপর বানহোপের সিঁড়ি ভেঙে ট্রেন লাইনের কাছাকাছি একটা বেঞ্চে একাকী বসে থাকি। আনমনে সিগারেট টানি। ট্রেন আসে, ট্রেন যায়। কতো লোক ফিরে আসে, কতো লোক যে চলে যায়। আমার দেশের কথা মনে পড়ে। প্রিয়জনদের কথা, বন্ধুদের কথা। আর সেই মেয়ের কথা।
মনে পড়ে চলে আসার কদিন আগে সে আমাকে একটি ছবি দিয়েছিলো।

খোলা চুলের সুন্দর ছোট ছবি। মুখে হৃদয় ভুলানো হাসি। ছবিটা মানি-ব্যাগের অনেক ভেতরে আছে।
আমি মানিব্যাগ রাখি হিপ পকেটে। বাঁ সাইডে। ডান হাতে মানিব্যাগ বের করতে খারাপ লাগে। কেন যে মনে হয়, টাকা-পয়সা বা হাতে ডিল করার ব্যাপার। নোংরা।
তবুও সেই প্রথম ডানহাতে মানিব্যাগটা বের করি। তারপর অতিযত্নে মানিব্যাগের অনেক ভেতর থেকে সেই মেয়ের ছবি। খোলা চুলে চমৎকার হাসছে সে। ছবিটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি। তারেপর টেলিপ্যা-থিতে সাড়ে আট হাজার কিলোমিটার দূর থেকে অর সঙ্গে কথা বলি। কেমন আছো সখী ? আমি নেই, এখনো কি তুমি অতো সুন্দর হাসতে পারো ?
কেউ সাড়া দেয় না। মন খারাপ করে বলে, না, আমি ভালো নেই! তোমাকে ছেড়ে আমি কেমন করে ভালো থাকি ! কেমন করে হাসি।
বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। ছবিটা আর মানিব্যাগে না রেখে কোটের বুক পকেটে রাখি। আমার বুকের খুব কাছে কেবল তোমাকেই মানায়।
তখন দীর্ঘ প্লাটফর্মের প্রান্ত থেকে ধীরে হেঁটে আসে একজোড়া যুবক যুবতী। প্লাটফর্মে লোকের অন্ত ছিলো না। প্রতি পাঁচ মিনিটে একটা করে ট্রেন আসে। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে চলে যায়। সুতরাং লোকের অন্ত ছিলো না। কতো রকমের যে রমণী দেখি, কতো রকমের পুরুষ। তবুও ঐ যুবক যুবতীর দিকেই আমার চোখ। ওরা হেঁটে আসছে। মেয়েটি ডান হাতে আঁকড়ে ধরে আছে যুবকের বাহু। যুবকের কাঁধে ছিলো পুরনো একটা ব্যাগ। লালচে চুলের শাদা যুবক। অহংকারী জার্মান। হাতে সিগারেট ছিলো। কাছাকাছি এসে তার সিগারেটের টানে এক ধরনের বিষন্নতা ফুটে ওঠে। যুবক, তুমি কি দূরে কোথাও চলে যাচ্ছো !
মেয়েটি আফ্রিকান। দেখেই বুঝতে পারি। তার কালো কোঁকড়ানো চুল, বিটুমিন মতো গায়ের রং। মুখটি অসম্ভব মিষ্টি। 'আর চোখ দুটির কোনো তুলনা নেই। তুচ্ছ লেখালেখিতে তার চোখের বর্ণনা দেয়া কষ্টকর। যে কোমল বিষন্নতা ছিলো তার চেহারায়, বিকেলের আধো আলো ছায়ায় সেটুকুই ছিলো পৃথিবীর সর্বশেষ সৌন্দর্য। ওরা আমার কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকে। কারো মুখে কোনো কথা নেই। যুবক সিগারেট টেনে যায়। মেয়েটি অপলক তাকিয়ে থাকে তার মুখে।
যুবক কি খেয়াল করে না !
তখুনি চারদিক কাঁপিয়ে একটা ট্রেন আসে যুবক হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তারপর সিগারেটে শেষ টান দিয়ে ট্রেনে উঠতে যায়। মেয়েটি কোনো কথা বলে না। নিঃশব্দে তার মুখটি এগিয়ে নেয় যুবকের মুখের খুব কাছে। কিন্তু হায়, যুবক খেয়াল করে না। ট্রেনে উঠে যায়। আমি দেখি যুবতীর চোখ। সেখানে পৃথিবীর সব কান্না। ছলছল।

বুক ফেটে যায়। আমিও কি এমন করে প্রত্যাখান করেছি সেই মেয়েকে! কখনো কোনো মুহূর্তে কি তারও চোখ ছলছল করেছে! হায় দেখা হয় নাই, দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া!

আঠারোই নভেম্বর প্রথম বরফ পড়লো বনে। সকাল বেলা। জার্মানীতে তখন পৌনে দশটা। বাংলাদেশে পৌনে তিনটা। ছতলার ওপর আমার দুই বাঙালী বন্ধুর রুম। বেশ অনেকদিন জার্মানীতে আছে ওরা। প্রথমে বছরখানেক জার্মান ভাষা শিখেছে। দুজনেই। এখন চাকরিবাকরি করে। সকালবেলা, খুব সকালবেলা যে যার কাজে চলে গেছে। আমি একা ওদের রুমে বসে আছি। আজ প্রবাসজীবনের আঠারো দিন চলছে। আমার সঙ্গে যে বন্ধুটি বাংলাদেশ থেকে এসেছে সেও খানিক আগে বেরিয়ে গেছে। আঠারো দিনে বন শহরটি তার বেশ চেনা হয়ে গেছে। আমারও হয়েছে খানিকটা। প্রথম প্রথম আমার সেই দুই বন্ধু বেরিয়ে যাওয়ার পর, সকালবেলা, আমরা মাত্র এসেছি, সদ্য প্রবাসী দুই বন্ধুও ঘুরতে বেরুতাম। পায়ে হেঁটে, বাসে ট্রামে পুরো শহর চক্কর মেরে বেড়াতাম। বন শহরটা জার্মানীর অন্যান্য শহরগুলোর তুলনায় ছোট। অনেক পরে শুনেছি বার্লিন হামবুর্গ হাইডেলবার্গ মানহাইম (ম্যান হেইমকে জার্মানরা বলে মানহাইম। শহরটির নামের বাংলা করলে দাঁড়ায় 'মানুষের ঘরবাড়ী।' অবশ্য হাইম জিনিশটি হোস্টেলের মতো একটা ব্যাপার। জার্মানীর ছাত্রছাত্রী, বেকার-বৃদ্ধ কিংবা জারজ সন্তানদের জন্যে ম্যালা হাইম রয়েছে।) স্টুটগার্ট ফ্রাংকফুর্ট কিংবা মিউনিখ (মিউনিখকে জার্মানরা বলে মুনসেন। বায়রান প্রদেশের রাজধানী।) এর মতো বড়ো শহরের কেউ কেউ বলে বন তো একটা গ্রাম। তবুও বন পশ্চিম জার্মানীর খুবই উল্লেখযোগ্য শহর। ঐ দেশের ফাদার মাদারদের অনেকেই শুনেছি বনে থাকে। গ্রাম হলেও বনই হচ্ছে পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী। কিন্তু তবুও বন আসলে খুব ছোট শহর। পর পর চার পাঁচদিন ঘুরলে সম্পূর্ণ বন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যায়। এই শহরে এসেই সেই কাজটা আমি করে ফেলেছি। ফলে শেষদিকে আর বেশি বেরুতাম না।
কিন্তু আমার সঙ্গের বন্ধুটি, ওর যেনো কিছুতেই দেখার শেষ হচ্ছিলো না। প্রতিদিন সকাল নটার দিকে সে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার সময় আমাকে খানিক টানা হ্যাঁচড়া করে। দু একদিন আমি যাই। বেশির ভাগ দিনই যাই না। বন্ধুটি খুব রাগ করে। শালা মাগী, ঘর থেকে বেরুতে চায় না, ইত্যাদি বলে গালাগাল করে, প্রচুর শীত, পোশাক পরে বেরিয়ে যায়। আমি একা ঘরে বসে থাকি। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে খুব উদাস হয়ে মারলবোরো সিগারেট টানি। আর দেশের কথা ভাবি। ঢাকার জন্য মন কেমন করে। আমার প্রিয় শহর। ঢাকা ছেড়ে নাগাড়ে আঠারো দিন

আমি কখনো বাইরে থাকিনি। এই প্রথম। আরো কতোকাল যে আমার প্রিয় শহর ছেড়ে আমাকে বাইরে থাকতে হবে।

কদিন আগে এক দুপুরে সেই বন্ধু, ঢাকা থেকে আমার সঙ্গে এসেছে, কমলের সঙ্গে বাজার করতে গেছি। একটা ট্রলিতে (প্যারামবুলেটরের মতো এক ধরনের চাকাঅলা গাড়ি। বেশি বাজার হয়ে গেলে, সওদাপাতি ভরে ঠেলে নিয়ে আসা যায়। বাজার থেকেই দেয়। পরে আরেকদিন বাজার করতে গিয়ে ফেরত দিয়ে এলেই হয়। জার্মানীর বাজারগুলো তো সব চার তলা পাঁচ তলা বিল্ডিং। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুই পাওয়া যায়। আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে। হাট কাওফপ কাওফালি হরটন সি এণ্ড এ এগুলো হচ্ছে জার্মানীর বিখ্যাত বাজার। একই নামে প্রায় সব শহরেই আছে।) বাজার নিয়ে ঠেলে ঠেলে বাসার দিকে যাচ্ছি দুজন। কমল বললো, সত্যি বনটা কি সোন্দর শহর।

শুনে আমি বলি, হ্যাঁ বন সোন্দর। আর ঢাকা হচ্ছে সুন্দর।

কমল আমার খোঁচাটা বুঝতে পারে না। হাসে। বনের সৌন্দর্যে সে মুগ্ধ। এই মুগ্ধতা কি ওর কোনোদিন কাটবে? আজ আঠারো দিন। বন আমার কাছে পুরনো হয়ে গেছে। ওর কাছে নতুন। প্রতিদিন নতুন হয়ে যাচ্ছে। বন দেখতে ও প্রতিদিন সকালে বেরিয়ে যায়। ফেরে একটা দুটোয়। কমল অবশ্য খুব গুণী ছেলে। খুব কাজের। রান্নাবান্না ছোট বেলা থেকেই জানে সে। শহর দেখা শেষ করে, বাসায় ফিরেই আধঘন্টার মধ্যে রান্নাবান্না শেষ করে ফেলে। ওভেনে ভাত বসিয়ে আলু পেঁয়াজ কাটে আর আমাকে গালাগাল করে। শালা ঘরকুনো, অকম্মা।

আমি কি করবো! জীবনে কখনো চুলোর পারে যাইনি। হাঁড়ি থেকে ভাত বেড়ে পর্যন্ত খাইনি। বনে এসে আমার প্রথম খারাপ লেগেছিলো খেয়েদেয়ে নিজের প্লেট নিজে ধুতে হয় দেখে। তখুনি ঢাকার কথা মনে পড়েছে। আমার জন্যে পৃথিবীর সেরা শহর ঢাকা! ঢাকা, আমার প্রেম।

ঢাকার কথা ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে গিয়েছিলাম সেই সকালে। পৌনে দশটা বাজে। এই ছতলা বাড়িটায় এখন আমি ছাড়া কেউ নেই। সবাই যে যার কাজে বেরিয়ে গেছে। কমল গেছে শহর দেখতে। আমি জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছি। কদিন ধরে সকাল-বেলাটা আমার খুব অস্থিরতার মধ্যে কাটে। ডাকপিয়ন আসে সাড়ে দশটায়। নিচে গেটের সঙ্গে যার যার বাক্সে চিঠিপত্র ফেলে যায়। আমি বনে পুরনো দুই বন্ধুর কেয়ারে আছি। চিঠি এলে ওদের বক্সে ফেলে যাবে। লেটার বক্সের চাবি নিয়ে, কদিন ধরে রোজ সকাল সাড়ে দশটায় আমি নিচে নেমে যাই। চিঠি আসে না। এখানে এসেই ঢাকায় আমি সবাইকে চিঠি লিখেছি। কিন্তু জবাব আসছে না। ঢাকা থেকে চিঠি আসতে কদিন লাগে? শোয়ার আগে প্রতি রাতে ভাবি, কাল ঠিক আসবে।

আসে না। মনে পৃথিবীর যাবতীয় দুঃখকষ্ট নিয়ে আমি ছতলায় উঠে আসি। তারপর একের পর এক সিগারেট খাই। ভাল্লাগে না, আমার কিচ্ছু ভাল্লাগে না।

আজ কি চিঠি আসবে?

জানালায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে এই কথাটা ভাবি। এখন পৌনে দশটা বাজে। সাড়ে দশটা বাজতে এখনো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। পৌনে এক ঘন্টা! ভেতরের ছটফটানি নিয়েও আমি বেশ উদাস হয়ে থাকি। বাইরে তাকিয়ে দেখি একটা বাড়ির চিমনি থেকে ধোঁয়া ওঠছে। খাবার তৈরি করছে কোনো জার্মান রমণী। একটা তিনতলা বাড়ির রেলিংয়ে তারের সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে ভেজা জামা কাপড় আটকে দিচ্ছে সোনালী চুলের এক যুবতী। দূরে উঁচু গির্জার মাথায় চুপচাপ বসে আছে একটা মুরগী। কতোকাল ধরে যে বসে আছে! কতোকাল যে বসে থাকবে। মুরগীটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার কেন যে মনে হয় এই বুঝি কঁক কঁক করে ডেকে উঠবে। তারপর ডানা ঝাপটে দৌড় লাগাবে।

তখুনি ঘটলো ব্যাপারটা। সকালবেলা রোদ উঠেছিলো। কখন যে রোদটা হাওয়া হয়ে গেছে, খেয়াল করিনি। ম্লান, বিষন্ন .একটা আলো ঝুলে পড়েছে চারদিকে। হঠাৎ দেখি আকাশ থেকে শিমূল তুলো কিংবা কাশফুলের রেণুর মতো হালকা মোলায়েম বরফ পড়ছে। দেখে আমার বেশ একটা আনন্দ। জীবনে প্রথম বরফ পড়া দেখছি। বা বেশ তো!

পাঁচ মিনিটে শাদা, তীব্র শাদা হয়ে যায় চারদিক। প্রথমে হালকা হয়ে পড়তে শুরু করেছিলো। এখন পড়ছে গভীর হয়ে। খুব নিঝুম হয়ে বৃষ্টি নামলে যেমন দূরের কিছু দেখা যায় না, বাইরে এখন তেমন একটা দৃশ্য। শাদা পর্দার মতো চোখের সামনে বরফের দেয়াল, কিছু দেখা যায় না। দৃশ্যটা দেখতে দেখতে টের পাই আমার কেমন শীত করছে। শীতটা মনের। ঘরের ভেতর হাইসুঙ চলছিলো। শীত লাগার কোনো কারণ নেই। তবুও লাগছে।

এইভাবে কতোক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম মনে নেই। সাড়ে দশটা কখন বেজে গেছে টের পাইনি। চিঠির জন্যে কাল সারারাত ছটফট করেছি। আজ সকালেও। কিন্তু বরফ আমার ছটফটানি ঠাণ্ডা করে দিয়েছে।

ঠিক তখুনি এলো কমল। হাতে একটা বাংলাদেশী হলুদ খামের চিঠি। চিঠিটা বিছানায় ছুঁড়ে ফেলে কমল বললো, তোর চিঠি। তারপর ছুটে এলো জানালায়। কি যে খুশি সে! দোস্ত, বরফ পড়ছে রে। তারপর মুগ্ধ হয়ে বরফ দেখে।

চিঠির কথা শুনে আমি সব ভুলে গেছি। ছুটে গিয়ে চিঠিটা তুলি। দেখি সেই মেয়ের চিঠি। সত্যি তাহলে গেলে? হঠাৎ যখন এরকম মনে হয় তখন, বিশ্বেস করো, একদম বিশ্বেস করতে ইচ্ছে করে না।

এতো কষ্ট লাগে। প্লেনের শব্দ শুনলেই বুকটা হু হু করে ওঠে। আর তখন মনে হয়, তুমি সত্যি গেলে।

পরশু তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম। গেট দিয়ে ঢুকতেই কেন যে মনে হলো, সেই প্রিন্টের লুঙ্গিটা হাঁটুর কাছে ধরে, আরেক হাতে পেছনের চুলগুলো সরাতে সরাতে তুমি ঠিক বেরিয়ে আসবে। এলে না। তোমার এই না আসা আমাকে জানিয়ে দিলো, তুমি নেই। তুমি কোথাও নেই।

সকালবেলা একটা অচেনা স্টেশানে এসে নামি। দশটা বাজে। মাত্র গ্রীষ্মকাল শুরু হয়েছে জার্মানীতে। তার প্রথম দিক। এবছর শীতটা সহজে যেতে চাইছে না। অকটোবরের প্রথম সপ্তাহে শুরু হয়েছে। পনেরো ষোলো তারিখ থেকে শুরু হয়েছিলো বরফ পড়া। মার্চের শেষ অব্দি পড়েছে। তারপর পুরো ছটা মাস শীত। হাড়ের ভেতর পর্যন্ত কাঁপে এমন। সূর্যের মুখ দেখা যায়নি। মে মাস পড়তেই সূর্য উঠতে শুরু করলো। খুব সকালবেলাই সারা জার্মানী ঝকমক করে রোদে। দূরে পাহাড়ের মাথায় কোথাও কোথাও তখনো জমেছিলো বরফ। রোদ পড়ে শাদা বরফ থেকে ঠিকরে আসে মনোরম এক আলো। তাকালে চোখ ধেঁধে যায়। আকাশ ধোয়া নীল শাড়ির মতো পরিচ্ছন্ন। দুএক টুকরো মেঘ মন খারাপ করে সূর্যের তলা দিয়ে এদিক ওদিক ভেসে যায়। কোথায় যে যায়!

শীতকালটা ছিলো গাছপালাদের দুঃখের দিন। শীতের শুরুতেই ঝরে গেছে পাতা। তারপর পুরোটা শীতকাল, ডালপালায় বরফ নিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছে গাছেরা। এখন গ্রীষ্ম, আসলে ঋতুর হিসেবে বসন্ত। শীতের শেষে যে মনোরম সময়টা শুরু হয় পৃথিবীতে, যখন প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিভোর হয়ে মানুষ বলে, আহা বেঁচে থাকা, সেটাই তো বসন্ত কাল। না? সময়টা ছিলো সেই সময়। বসন্তকাল পেয়ে কংকাল গাছেরা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। নতুন পাতায় ভরে গেছে ডাল। আপেল নাসপাতি গাছে সবুজ পাতার আড়াল থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে ফল। পাহাড়ের ঢালুতে, মাইল মাইল আঙুর খেত ঘন সবুজ পাতায় ফলভারে নতজানু হচ্ছে। ঝোপঝাড়ে পার্কে রাতারাতি ফুটে উঠেছে হাজারো ফুল। তাকালে চোখ জুড়িয়ে যায়। এ কোন পৃথিবী। না স্বর্গ, স্বর্গের উদ্যান!

এটাই প্রিয় সময় মানুষের। জার্মানরা এসময় নিজেদেরকে পৃথিবীর সবচে সুখী জাতি ভাবে। জার্মান প্রবাসী বাঙালীদের চেহারায়ও এসময় আলাদা একটা লাবণ্য চলে আসে। দেখে মনে হয়, আ এদের মতো সুখী কে আছে পৃথিবীতে। কিন্তু আমার মন ভালো ছিলো না। কাল সন্ধে থেকেই।

কাল সন্ধেয়, ছতালার ওপর আমার রুমে ফিরে দেখি বাঙলাদেশী হলদে খামের দুটো চিঠি কি অবহেলায় পড়ে আছে। দেখেই বুকের ভেতর এক সঙ্গে ঢুকে গেছে পৃথিবীর যাবতীয় আনন্দ। বিদেশে এসে প্রিয়-জনদের চিঠি পাওয়ার মতো সুখের আর কি আছে। প্রতিটি রাত, কাল চিঠি আসবে, কাল ঠিক চিঠি আসবে আসবে করে কেটে যায় আমার। সকালবেলা ঘুম ভাঙার পর কি যে উত্তেজনা। আমি এখন যে শহরে থাকি সেখানে ডাক আসে ন'টায়। নিচে গেটের সঙ্গে আমার লেটার বক্স। বেশিরভাগ দিনই গেটের সামনে পোস্টম্যানের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। চিঠি থাকলে হাতে হাতে দিয়ে দেয় সে। বক্সে ফেলার চান্স পায় না। আর চিঠি না থাকলে, বেশির ভাগ দিনই থাকে না, লোকটা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দুঃখিত স্বরে বলে, দুঃখিত। সঙ্গে সঙ্গে আমি পৃথিবীর সবচে দুঃখি মানুষ হয়ে যাই। তারপর লিফট ব্যবহার না করে, আস্তেধীরে সিঁড়ি ভেঙে ছতলার ওপর। আমার রুমে। আমার কিছু করতে ইচ্ছে করে না, কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। দুঃখিত মনটা আস্তেধীরে রেগে যায়। দেশে বসে কি করে সব! একটা চিঠি লেখারও সময় হয় না!
তখন পাশের রুম থেকে আমার বাঙালী বন্ধু বাবুল কফি বানিয়ে আমায় ডাকে। এসো। কফি খেতে খেতে আমি আবার আনমনাহয়ে যাই। দেশের কথা মনে পড়ে। চুমু আমার প্রেম, মনে পড়ে। আর কেউ না লিখুক, চুমুতো আমায় চিঠি লিখবে। লেখে না। কতোদিন চুমুর চিঠি পাই না আমি। চুমু কি আমায় ভুলে গেছে। দুবছর পর দেশে ফিরে গেলে কি চুমু আমায় চিনতেও পারবে না। ভুলে যাওয়ার, না চেনার ভানটা এখন থেকেই শুরু করেছে।
সকাল বেলার প্রিয় কফির স্বাদ নষ্ট হয়ে যেতে থাকে। বাবুল খেয়াল করে প্রতিদিন। আর হাসে। বাবুল কখনো কাউকে চিঠি লেখে না, কখনো কারো চিঠির অপেক্ষা করে না। স্বাদ নষ্ট কফি খেতে খেতে আমার মনে হয়, বাবুলের অপেক্ষার কষ্ট নেই। বাবুল খুব সুখী মানুষ। চোখের সামনে সুখী মানুষ দেখলে নিজেকে আরো বেশি দুঃখী মনে হয়। আমি সেই দুঃখের ভেতর পড়ে থাকি।
কাল নটার আগে আমি একটা জরুরী কাজে বেরিয়েছিল্যম। মাস দেড়েক আমায় কেউ চিঠি লেখে না। প্রতিদিন চিঠির বাক্স দেখে আসি। কালই প্রথম ভেবেছি এরপর প্রতিদিন নটার আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো। যাতে পিয়নের দুঃখিত বলা না শুনতে হয়। এইভাবে চিঠি না পাওয়ার দুঃখটা আর দুঃখ থাকবে না।
অথচ কালই রুমে ফিরে দেখি দুটো চিঠি। এক সঙ্গে, নিশ্চয় বাবুলের হাতে দিয়েছিলো পিয়ন। বাবুল কষ্ট করে আমার রুমে রেখে গেছে। চিঠি খুলতে খুলতে আমি বাবুলকে যে কতোশতো ধন্যবাদ দিয়ে ফেলি।

দুটো চিঠিই লিখেছে চুমু। একটা তার জন্মদিনের আগের দিন বসে লেখা। আরেকটা জন্মদিনের সকালে। দুটো চিঠিতেই আমি নেই, চুমুর দিন কাটে না, রাত কাটে না। যখন তখন বুকের ভেতর হু হু করে, এইসব লেখা। পড়ে আমার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। মোটা জিনসের প্যান্ট জ্যাকেট পরা, পায়ে ভারি জুতো, সব শুদ্ধ বিছানায় শুয়ে পড়ি। চুমুর চিঠি দুটো রাখি পকেটে। তারপর মনে মনে কেবল বলি, চুমু চুমু চুমু।
বুকটা হু হু করে। আমার কিছু ভাল্লাগে না। ভাল্লাগে না।
কতোক্ষণ বিছানায় শুয়ে আছি কে জানে। হঠাৎ দরোজা ঠেলে রুমে ঢোকে মোমেন। মোমেনকে দেখে আমি চমকে উঠি। তারপর অবাক হয়ে মোমেনের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকি। মোমেনকে আমি চিনতে পারি না! আমি এতোক্ষণ শুধুই চুমুর কথা ভাবছিলাম! চুমুর কাছে কি এই জীবনে আমার আর ফেরা হবে!
মোমেন বললো, সন্ধে বেলা শুয়ে আছিস কেন? সামার সন্ধ্যায় কেউ কি ঘরে থাকে! চল বেরুই।
কোথায় যাবি?
জার্মানীতে যাওয়ার জায়গার অভাব। উঠ।
মোমেন ছোটবেলা থেকেই একটু গোয়ার ধরনের। কথা বলে ধমকে ধমকে। আমরা একই স্কুলে একই কলেজে পড়াশুনা করেছি। মোমেন আমার ছোটবেলার বন্ধু। তিন বছর জার্মানীতে আছে। একাকিত্বের জীবন মোমেনের মানিয়ে গেছে। মোমেন কি কারো চিঠির অপেক্ষা করে? আমার মতো। কিংবা মোমেন কি কারো কাছে ফিরে যাওয়ার অপেক্ষায় আছে! আমার মতো! আমি একদিন ঠিক চুমুর কাছে ফিরে যাবো।
রাস্তায় বেরিয়ে আমরা অনেকক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। তারপর একটা বারে গিয়ে ঢুকি। মোমেনকে চুমুর কথা বলা হয়নি। আমার অপেক্ষার কথা বলা হয়নি। আজ বিয়ার খেতে খেতে সব বলবো।
বলেছিলাম। কতোক্ষণ ধরে যে, কে জানে! বিয়ারের নেশায় এবং কথা বলার আবেগে আস্তেধীরে এক সময় আমি ডার্ক হয়ে গেছি। আমার কিছু মনে নেই।
খুব সকালে ঘুম ভেঙেছে। দেখি জিনসের জ্যাকেট প্যান্ট, পায়ে মোটা জুতো মোমেনের পাশে শুয়ে আছি। মোমেন কাৎ হয়ে ঘুমাচ্ছে। কাল রাতে মোমেন তাহলে উপায় না দেখে আমাকে ওর বাসায় নিয়ে এসেছে।
আমি নিঃশব্দে বিছানা থেকে উঠি। তারপর মোমেনকে না ডেকে রাস্তায় বেরিয়ে আসি। আমি এখন কোথায় যাবো!
ছেলেবেলা থেকে আমার একটা স্বপ্ন ছিলো। আমি একদিন দূরে কোথাও কোনো অচেনা স্টেশনে একা বসে থাকবো। কেউ আমায় চিনবে না। কেউ সঙ্গে থাকবে না।

চুমুকে কথাটা একদিন বলেছিলাম। শুনে চুমু বলেছিলো, আমি তোমার সঙ্গে থাকবো।

আমি তোমায় নিলে তো! কাউকে কিছু না বলে চলে যাবো।

যদি তুমি আমায় সত্যিকারের ভালোবাসো, তাহলে আমি তোমার হৃদয়ে থাকবো। তুমি যেখানে যাবে, তোমার হৃদয়ের সঙ্গে আমিও তো সেখানে যাবো! একা হবে কেমন করে!

কথাটা মনে পড়ে। আজ কি আমি তাহলে কোনো অচেনা স্টেশানে চলে যাবো। ছেলেবেলার স্বপ্ন পুরো করতে! হৃদয়ের কতো কাছাকাছি আছে চুমু, দেখতে!

স্টেশানে এসে আমি এস্‌বানে (একধরনের দ্রুতগামী ট্রেন। বেশির ভাগ সময়ই মাটির নিচ দিয়ে চলে।) চড়ি। মন চলো।

এসবানের জানালায় চুপচাপ বসে আছি। কতো জায়গায় যে থামে এসবান কতো জায়গা যে পেরিয়ে যায়। আমি কিছু খেয়াল করি না। এইভাবে কতোক্ষণ কে জানে।

একটা স্টেশানে এসে এসবান দাঁড়িয়েছে। দেখি দু'দিকে পাহাড়। মাথার অনেক উপরে। মাঝে ট্রেন লাইন। সরু স্টেশান। আর কিছু নেই। দেখেই আমি লাফিয়ে উঠি। তারপর দ্রুত নেমে যাই!

এসবান চলে যাওয়ার পর দেখি সেই ছোট্ট স্টেশানে আমি ছাড়া কেউ নেই। এতো নির্জন চারদিক। কীট পতঙ্গ ডাকে না, পাখি ডাকে না। মাঝে চিরল স্টেশানটা রেখে দুপাশে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে পাহাড়। পাহাড়ের মাথায় কি তখনো জমে ছিলো বরফ! এতো উঁচু, আমি দেখতে পাই না। একটা সিগারেট ধরাই। তারপর টানতে টানতে লম্বা সরু স্টেশনটা পেরিয়ে যাই। স্টেশানের শেষ মাথায় পাহাড় কেটে থাক থাক সিঁড়ি বানানো হয়েছে। সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়, এই সিঁড়িতে কখনো কোনো মানুষের পা পড়েনি। আমিই প্রথম মানুষ যে এক্ষুণি এই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে যাবে। উপরে কি আছে?

সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে আমার একবার চুমুর কথা মনে পড়ে। বুক পকেটে চুমুর দুটো চিঠি আছে। আমার হৃদয়ের কাছে। একাকী কোনো অচেনা স্টেশানে আমার যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু একা কি হওয়া যায়! মানুষ কি সত্যিসত্যি একা হতে পারে?

উপরে উঠে আমি চমকে উঠি। চারদিকে পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। পাথর বিছানো একটা পথ চলে গেছে দূরে কোথায়। পথের পাশে ছোট্ট একটা বনভূমি। হাতে আঁকা ছবির মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিছু গাছপালা। তলায় ছোট ছোট ফুলের ঝোপ। বসন্তকাল পেয়ে ফুলেরা সব ফুলের মতো ফুটে উঠেছে। পুব দিকের পাহাড় থেকে পিছলে এসে পড়েছে রোদ। ছোট্ট বনভূমি ভেসে যায় সেই রোদে। আমি দূর থেকে

দেখি ফুলে ফুলে উড়ছে প্রজাপতি। গাছপালায় ঝোপঝাড়ে ডাকছে কীট পতঙ্গ। পাহাড়ের ঢালুতে কোনো গাছপালার জঙ্গলে বসে ডাকছে একটা অচিন পাখি। শুনে আমার বিশ্বাস হয় না। মনে হয় সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই ঘটে যাচ্ছে স্বপ্নের ভেতর। নয়তো স্বর্গের খুব কাছে এতো সুন্দর জায়গা, কোনো লোক নেই কেন?

আমি আস্তেধীরে বনভূমির দিকে হাঁটতে থাকি। তখন মিহিন একটা জল পতনের শব্দ পাই। বহু উপর থেকে কলকল করে পড়ছে। যতো এগোই শব্দটা ততো স্পষ্ট হয়।

এক সময় আমি বনভূমির শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়াই। নিচে, বহু নিচে খাদ। সেখানে পুবের পাহাড় থেকে নামছে সরু জলের এক ঝর্ণা। জলের সঙ্গে কথা বলছে জল। ফলে কলকল একটা শব্দ। শব্দটার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে থাকি আমি। আমার কিছু মনে থাকে না। না দেশের কথা না চুমুর কথা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কাছে মানুষের দুঃখবোধ খুব ছোট। আমি একাকী সেই সৌন্দর্যের খুব কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। এরকমই তো কথা ছিলো। নিয়তি একদিন অচেনা একটা জায়গায় ডেকে এনে প্রকৃতির বিশাল সৌন্দর্যের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে। আমাকে সম্পূর্ণ একা করে দেবে। ১৯৮১

যদি

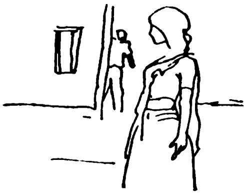

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে উঠতে শুনি ছেলেমেয়েরা সব সারেগামা করছে। ক্লাস বসে গেছে। আমি খানিকটা লেট। নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয়। গত দুমাসে একদিনও টাইমলি ক্লাসে আসতে পারিনি। আমার ঘুম ভাঙে বেলা করে। রেগুলার। অথচ গানটান শিখতে হলে ভোররাতে উঠে রেয়াজ করতে হয়। দুমাস আগে হারমোনিয়াম কিনে গানের স্কুলে ভর্তি হয়ে পুরনো অভ্যেসটা বদলাতে চেয়েছিলাম। হলো না। একদিনও সকালবেলা উঠে হারমোনিয়াম নিয়ে বসা হয় না। দুএকদিন যাও বসি, দেখি রোদ উঠে গেছে। ঘড়ির কাঁটা আমাকে ফাঁকি দিয়ে দিব্যি এডভান্স করেছে। কি করি! গান টান আমার হবে না। তার ওপর গলায় ম্যালা দোষ। রেয়াজ করতে বসলে ভাই বোনেরা সব বিরক্ত হয়ে যায়। মা বিড়বিড় করে গাল দেয়। আর হারমোনিয়াম তো আছেই, ডাবল রিড, জার্মান জুবলি, হাত ছোঁয়ালে ভারি মিঠে আওয়াজ

দেয়। কিন্তু গলা মেলাতে গেলেই প্রোবলেম। একটুও মেলে না। তবুও আশা ছাড়ি না। গায়ক হবো, হবোই। গানের স্কুলে যাই শুক্রবার, রোববার। সকাল বেলা। কিন্তু লেট হয়। ওস্তাদজী রাগ করেন। তবুও যাই। গায়ক হবো।

ক্লাসে ঢোকার আগে দরজার আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখি ওস্তাদজী চোখ বুজে মুগ্ধ গলায় গাইছেন, সব সুর শুদ্ধ যেনো ঠাট রাগ বিলাবল

বিরাট হলঘরের ভেতর আগাগোড়া লাল রংয়ের ম্যাট বিছানো। অনেককালের পুরনো। ব্যবহারে ব্যবহারে আসল রংটা মুছে গেছে। ছেলেমেয়েরা সব দল বেঁধে, দরোজার দিকে পেছন দিয়ে বসে ওস্তাদজীর সঙ্গে গাইছে। সব সুর

ওস্তাদজী চোখ বন্ধ করে আছেন দেখে আমি সুরুৎ করে ভেতরে ঢুকে যাই। পেছন দিকে বসে সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শুরু করি, সব সুর

খানিকপর ওস্তদজী চোখ মেলেন। গান থামিয়ে ডিবা থেকে এক মুঠো পান গালে পুরেন। ছেলেমেয়েরাও সব থেমে গেছে। পুব দিকের পাল্লাহীন, শিকহীন বিরাট জানালা দিয়ে কচি রোদ এসে ঘরের অর্ধেকটা জুড়ে পরেছে। মাথার ওপর কাঠের বিমের সঙ্গে চড়ুইয়ের বাসা, বাতাসে দুএকটা খড়কুটো উড়ে পড়ে ছাত্রছাত্রীদের গায়ে। অনেককালের পুরনো দালান, লোম ওঠা কুকুরের মতন দাদরা খাদরা। এসবে গান বাজনা আটকায় না।

পান চিবুতে চিবুতে সামনে বসা একটি মেয়েকে ধরেন ওস্তাদজী। হারমোনিয়ামে সুর তুলে বলেন, গাও।

মেয়েটি কোনো ভনিতা না করে গাইতে শুরু করে, সব সুর

সবাই খেয়াল করে শোনে। কিন্তু আমার তখন ভেতরে ভেতরে বারোটা বেজে গেছে। আমাকে যদি ধরে!

আমি বরাবরই পেছনের দিকে বসি। ওস্তাদজীর চোখে না পড়ার ভয়ে। আল্লা বাঁচিয়েছে, কখনো পড়িনি। কিন্তু আজ যদি

ভয়ে কুঁকড়ে যাই। তবুও চোখ নরম করে ঢোক গিলে সামনের দিকে তাকাই। ওস্তাদজীর দিকে, তারপর ছেলেমেয়েদের দিকে। একজনের ওপর চোখ আটকে যায়। কালো মতন একটি মেয়ে। লম্বা টিকলো নাক, অপূর্ব দুটো চোখ, মুখটা অশত্থ পাতার মতো, ভারি মিষ্টি দেখতে। মোনালিসার ছবির মতো। হাসলে হুবহু মোনালিসা হয়ে যাবে। মেয়েটাকে তো আগে কখনো দেখিনি! নতুন নাকি! ভাবতে থাকি।

ওস্তাদজী একে একে সবাইকে ধরছেন। আমি খেয়াল করি না। মুগ্ধ চোখে মেয়েটাকে দেখি। কালো মেয়েও এতো সুন্দর হয়! আগে কখনো দেখিনি তো! বা!

আজো বেঁচে যাই। ওস্তাদজী আমার কাছাকাছি পেঁছনোর আগেই

ক্লাস শেষ হয়ে যায়। আমি ক্লাস ছাড়ার আগে আবার মেয়েটার দিকে। ক্লাস তখন ফাঁকা হয়ে গেছে বলে মেয়েটিও একপলক আমাকে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ঠোঁট টিপে একটু হাসে। আশ্চর্য, হাসলে সত্যি সত্যি ও মোনালিসা হয়ে যায়। আমি মনে মনে বলি, ব্ল্যাকরোজ তোমার নাম দিলাম মোনালিসা।

কিন্তু আমাকে তাকাতে দেখে ও ঠোঁট টিপে হাসলো কেন? অনেকক্ষণ ধরে যে ওকে আমি দেখছিলাম ও কি জানে! কই একবারও তো আমার দিকে তাকাতে দেখিনি! তাহলে?

মেয়েরা নাকি কেউ তার দিকে তাকালে নিজে না তাকিয়েও দেখতে পায়। ওদের তিন নম্বর একটা চোখ আছে। ওটা শুধু পুরুষ মানুষের জন্য। শুনেছি। মোনালিসা হয়তো সেই চোখেই আমাকে।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মোনালিসা একবার পরিপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার মতন সময় ধরে তাকিয়ে থাকে। দেখে আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা টেনিস বলের মতন বার কয়েক ড্রপ খায়। এ রকম চোখে তো কেউ কখনো আমার দিকে তাকায়নি! কোনো মেয়ে! এর মানে কি?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে সামনে বিরাট বাগান। শীতকাল শেষ হয়ে গেছে, এখন বুঝি বসন্তকাল। বাংলাদেশের বসন্তকাল চেনা যায় না। এদেশে সারা বছরই কোকিল ডাকে। হরলাল রায়ের রচনা বইয়ে পড়েছি। তবুও বাগানে অনেক ফুল ফুটেছে দেখে আমি ভাবি বসন্তকাল এসে গেলো। এসব আমি ভাবতাম না, মোনালিসা আর দুটো মেয়ের সঙ্গে বাগানে ঘুরছে দেখে ভাবি। আমি কখনো ফুল গাছপালা খেয়াল করে দেখি না। আজ দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি।

বাগানে ম্যালা প্রজাপতি। মৃদু একটা বাতাস আছে। ফুলের মাথা দুলিয়ে গন্ধ দিচ্ছে। কবিরা তো এসব দেখেই কবিতা লেখেন। আমি ফুলটুল না দেখে মোনালিসাকে দেখতে থাকি। তখন মনে পড়ে গত বছর ঈদে আমার এক বন্ধু তার প্রেমিকাকে ঈদকার্ড পাঠিয়েছিলো, তাতে লেখা ছিলো, একদিন বাগানে এসো, ফুলেরা তোমায় দেখবে। মোনালিসাকে এখন বাগানে ঘুরতে দেখে লাইনটা আমার মনে পড়ে। ফুলেরা বুঝি মোনালিসাকেই দেখছে।

মোনালিসা দূর থেকে আমাকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছিলো। ঠোঁটে সেই হাসি। ওর সঙ্গের দুটো মেয়ের একটাকে আমি চিনি। সাহানা। নাসিম আমার বন্ধু, সাহানার সঙ্গে নাসিমের প্রেম। কথাটা মনে পড়তেই দ্রুত ফিরে আসি। মোনালিসা যদি সাহানাকে বলে ছেলেটা আমাকে ফলো করছে! সাহানা যদি নাসিমকে বলে তোমার বন্ধু আমার বন্ধুর পেছনে

লেগেছে ! নাসিম যদি আমাকে বলে, কিরে? লজ্জায় মরে যাবো। এসব ব্যাপারে আমার ভারি লজ্জা।

কিন্তু মোনালিসা সাহানাকে কিছু বলেনি। নাসিমের সঙ্গে কলেজে রোজ দেখা হয়, নাসিম আমাকে কিছু বলে না। আমি নিশ্চিন্তে আবার গানের ক্লাসে যাই। মোনালিসার সঙ্গে দেখা হয়। আমি তাকাই, মোনালিসা তাকায়। মোনালিসা হাসে, আমি হাসি না। সাহস হয় না। কেউ যদি দেখে ফেলে ! লাকি দুলু আওলাদ ওরা আমার গানের স্কুলের বন্ধু। আর একজন আছে বকুল। সবাই মেয়েদের ব্যাপারে পাকা। একবার টের পেলে আমাকে জ্বালিয়ে খাবে। আমি সাবধান থাকি।

একদিন সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছি, মোনালিসা একা দ্রুত নেমে আসছিলো। আমাকে মুখোমুখি দেখেই থমকে দাঁড়ালো। তারপর সেই চাওয়া, সেই হাসি। দেখে আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ড্রপ খেতে থাকে!

মোনালিসা নেমে যায়।

তারপর থেকে কেমন করে জানি না আমি খুব রেগুলার হয়ে গেলাম। শুক্রবার, রোববার বেশ সকাল সকাল ঘুম ভাঙে। খানিকটা রেয়াজ করার পরও ক্লাসে চলে যাই টাইমলি। দুএকদিন এতো দ্রুত চলে গেছি ক্লাসে, গিয়ে দেখি পিয়ন সবেমাত্র ক্লাস রুমের তালা খুলছে। ঝাড়ুদার রুমটুম ঝাড়ু দিচ্ছে। ওস্তাদজীরা তো কেউ আসেনি, ছাত্রছাত্রীরাও কেউ না। বেশ অবাক লাগে। এসব ঘটছে কেমন করে? পরে বুঝতে পারি, এসবের মূলে মোনালিসা। ওর কথা কদিন ধরে খুব ভাবছি। ওর চোখ ওর হাসি ছেলেবেলার মতো প্রিয় হয়ে গেছে আমার। না ভেবে থাকা যায় না।

একদিন এই রকম সকালবেলা, তখনো কাক পক্ষিটি আসেনি। একাডেমীতে, বাগানের দিকে মুখ করে আমি রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে। নিচে বাগানে মালি পাইপ দিয়ে গাছে গাছে জল দিচ্ছে। জল দেয়ার পর গাছপালা খুব চকচকে হয়ে যায়। আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। তখন সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ। তাকিয়ে দেখি মোনালিসা। দেখেই আমার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা বারকয়েক ড্রপ খেয়ে থেমে যায়। মোনালিসা কি আমাকে দেখে একটু চমকায়! বুঝতে পারি না। মোনালিসা সেই চোখে তাকায়, সেই রকম হাসে। আমি এই প্রথম ওকে দেখে একটু কেঁপে উঠি। একাকী এতো কাছাকাছি মোনালিসাকে আমি কখনো পাইনি। ওকি আমার কথা ভেবেই আজ!

না অতোদূর ভাবা যায় না।

মোনালিসা বললো, ভালো আছেন?

আমি থতমত খেয়ে মাথা নাড়ি। মোনালিসা আমার সঙ্গে কথা বলবে আশা করিনি।

আমি গলা খাঁকাড়ি দিয়ে কিছু একটা বলতে চাই, তখুনি হুড়মুড় করে একদল ছেলেমেয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে আসে। আমার কথা বলা হয় না। মোনালিসা চলে যায়।

সেদিন আমার জীবনে ছোট্ট দুটো ঘটনা ঘটে। এক আমার মনে হয়, লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চির মোনালিসাও আমার মোনালিসার মতন এই টোনেই কথা বলতো! (ভিঞ্চি কি মোনালিসার গলা শুনেছেন?) দুই, সেদিন রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্লাসে আতিক ভাই আমাদের শেখান 'তোমার আমার মিলন হবে বলে (আতিক ভাই কেন এই গানটা শিখিয়েছিলেন অথবা রবীন্দ্রনাথ কেন এই গানটা লিখেছিলেন?)

তারপর মোনালিসার সঙ্গে আমার দেখা হয়। মোনালিসা তাকায়, হাসে। কথা বলে। ঐ একটাই কথা, ভালো আছেন? মোনালিসার এই তিনটে আচরণের ভেতরই সমান বিষণ্নতা। আমি ভাবি আর্টিস্ট হলে দুনম্বর মোনালির্সা আমি আঁকতে পারতাম। কেন যে হইনি।

একদিন জগন্নাথ কলেজে মোনালিসার সঙ্গে দেখা। আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফরম ফিলাপ করে বেরিয়েছি। হঠাৎ দেখি মোনালিসা। তখন ফাষ্টইয়ার ভর্তি চলছে। মোনালিসা টাকা জমা দিয়ে বেরিয়েছে বোঝা যায়। আমাকে দেখেই হুবহু সেরকম করে তাকায়, হাসে। জিজ্ঞেস করে, ভালো আছেন? ওর সঙ্গে ফালতু একটা মেয়ে। খুব সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে সব সময়ই একটা বিশ্রী মেয়ে থাকে। ব্যাপারটা আমি আগেও দেখেছি। কিন্তু আমি এখন ওসব ভাবছি না। মোনালিসাকে দেখেই আমি চমকে উঠেছি। এরকম পরিবেশে ওকে ঠিক মানায় না। কেন যে আমার এটা মনে হয়! অবলীলায় বলে ফেলি, আপনি এখানে ভর্তি হয়েছেন কেন? কথাটার ভেতর কি ছিলো আমি জানি না। মোনালিসা গম্ভীর মুখে বললো, কেন? শুনে আমি থেমে যাই। বিরক্ত হয়ে বলি, না এমনি। তারপর কেন্টিনের দিকে চলে যাই।

সেই মোনালিসার সঙ্গে আমার প্রথম এবং শেষ কথা। কে জানতো ঐ এক মুহূর্তের ভাবনা, মোনালিসাকে এই পরিবেশে মানায় না, জীবনভর আমাকে জ্বালাবে।

পরের শুক্রবারে ক্লাসে গেছি, নাসিম আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললো, সাহানার বন্ধুকে তুই কি বলেছিস?

আমি থতমত খেয়ে বলি, এমন কিছু তো বলিনি।

ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেছে।

ততোক্ষণ আমি লজ্জায় মরে গেছি। যা কেলেংকারি একটা হয়েই গেলো। আমি কিছু একটা বলতে যাবো, নাসিম বললো, সাহানা আমাকে বললো, তুই বলেছিস আপনি কেন এখানে ভর্তি হয়েছেন?

কথাটা আমি ঠিক এভাবে বলিনি।

নাসিম হেসে বললো, তুই যেভাবেই বলিস কথাটা ওর খুব লেগেছে? ব্যাপারটা ওর ব্যক্তিগত।

নাসিমের ভয়েস একটু মোটা শোনায়। বুঝতে পারি নাসিম বন্ধুর চেয়ে প্রেমিকার বন্ধুর দিকটাই বড়ো করে দেখছে। আমার ভীষণ কষ্ট হয়। তারপর ছেলেমানুষি এক অভিমান। মোনালিসা আমার কথাটাই বুঝতে পারেনি। আমি অন্য কিছু মিন করেছিলাম। ওকে অপমান করিনি। আমার ওকথা বলার কারণ ছিল অন্য। হাজার হাজার ছেলের মধ্যে মোনালিসার মতন এক অসাধারণ মেয়েকে আমার চোখে বড়ো বেমানান লেগেছিলো। হাজার হাজার মেয়ের মধ্যে মোনালিসাকেই আমার প্রথম চোখে পড়বে। দশ হাজার ছেলের মধ্যে প্রত্যেকেরই চোখ পড়বে মোনালিসার দিকে। সবাই মোনালিসাকে হা করে দেখুক আমি তা চাইনি। সম্ভবত এই কারণে আমি ওকে বলেছিলাম, আপনি এখানে ভর্তি হয়েছেন কেন? মোনালিসা আমার মুখের দিকে তাকিয়েও কথাটার সঠিক অর্থ বুঝতে পারেনি। মেয়েরা তো কারো দিকে না তাকিয়েও দেখতে পায় কে তার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কারো চোখের দিকে তাকিয়ে, কথা শুনে বুঝতে পারে না, মানে কি! তারপর থেকে কি যে এক অভিমান পেয়ে বসে আমাকে। কলেজে একাডেমীতে মোনালিসার সঙ্গে দেখা হয়, কখনো একেবারে মুখোমুখি। আমি ওর দিকে ফিরেও তাকাই না। দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যাই। মোনালিসা কি এখনো তেমন করে আমার দিকে তাকায়, তেমন করে হাসে? তেমন করে কি বলতে চায়, ভালো আছেন?

জানি না।

এসবের কিছুকাল পর হঠাৎ করে আতিক ভাই মারা যান। সে আমার আর এক হোঁচট। আতিক ভাইয়ের মতো সিনসিয়ারলি আর কেউ রবীন্দ্র সঙ্গীত শেখাবে কি! আমার মাথার ভেতরটা ফাঁকা হয়ে যায়। তাছাড়া ততোদিনে আমি বুঝে গেছি, আমার হবে না।

গান শেখা ছেড়ে দিই।

ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে আমি অনার্সে ভর্তি হই জগন্নাথে। ততোদিনে আমি খানিকটা পাল্টে গেছি। ক্লাশ করি না, আড্ডা মেরে বেড়াই। কলেজে গেলেও ক্লাসে না গিয়ে কেন্টিনে গিয়ে বসি। ম্যালা বন্ধু-বান্ধব। চা খাই, সিগারেট খাই। তুমুল কথা বলি। আগের সেই লাজুক ভাবটা কেটে গেছে। এসব দেখেশুনে ক্লাসের ছেলেরা আমাকে ডিপার্টমেন্টের জি, এস করে। আমার অপজিশান ছিলো একটা গণ্ডারাম টাইপের ছেলে। জানি কনটেস্ট করলে আমি হেরে যাবো। ছেলেটা ভালো। স্যাররা ছাত্ররা ওকে খুব সাপোর্ট করে। কি করা যায়! ইলেকশানে দাঁড়িয়েছি, পাস করতেই হবে। আগের দিন ক্লাস থেকে বেরিয়ে কয়েকজন পাণ্ডা

নিয়ে ছেলেটাকে খুব থ্রেট করি। কাল তুই কলেজেই আসবি না, এলে লাশ পড়ে যাবে।
ছেলেটা ভয়ে আর এলো না। আমি আনকনটেস্ট যাই। জি, এসদের কিছু ফেসেলিটি থাকে। আমি পুরোপুরি ব্যবহার করি। তখনো মোনালিসার সঙ্গে আমার একআধদিন দেখা হয়। ওকে দেখলে আমি মুখ ঘুরিয়ে চলে যাই। অভিমানটা যায়নি। ছেলেবেলার মতো হৃদয়ে লেগে আছে।
কলেজের বিজ্ঞান মেলায় আমাদের রুমে আমি চেয়ার নিয়ে স্যারদের সঙ্গে বসে থাকি। ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে সব দেখে যায়। আমি কাউকে পাত্তা দিই না।
এক বিকেলে মোনালিসা আসে। একা। সুন্দর গরদের শাড়ি পরা। কপালে টিপ। দূর থেকে ওকে দেখেই আমার বুকের ভেতর বহুকাল পর হৃৎপিণ্ডটা বার কয়েক ড্রপ খায়। ওকে আজ খুব সুন্দর লাগছে।
ঘুরে ঘুরে মোনালিসা আমার টেবিলের সামনে এসে থেমে যায়। আমি তখন বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করছি। আজ বিজ্ঞান মেলা শেষ। রাতে আমরা পাঁচ বন্ধু মিলে বসবো।
মোনালিসা আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, দেখেও না দেখার ভান করি। মোনালিসা তখনো দাঁড়িয়ে। তাকাই। দেখি মোনালিসা অনেককাল আগের সেই চোখে তাকিয়ে। সেই রকম হাসি ঠোঁটের কোণে। দেখে আমার বুকের ভেতরটা মুচড়ে ওঠে।
মোনালিসা বললো, ভালো আছেন?
আমি মাথা নাড়ি। মোনালিসা চলে যায়। তখন একটা কথা আমার মনে হয়, মোনালিসা আমার সেদিনের কথাটার সঠিক মানে বুঝলে আমাদের দূরত্বটা অনেক কমে যেতো। মোনালিসার তাকানো পাল্টে যেতো, হাসি পাল্টে যেতো। নিভৃতে মোনালিসা হয়তো আমার শার্টের বোতাম লাগিয়ে দিতে দিতে বলতো, তুমি অনেক রোগা হয়ে গেছো। ১৯৭৮

আমি ও সেই যুবতী

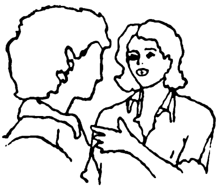

সকালবেলা ভাবী আমার রুমে ঢুকে বললেন, এই তোমাকে কে ডাকে।
আমি বিছানায় কাৎ হয়ে শুয়ে আছি। এখন কটা বাজে আমি ঠিক

জানি না। আটটা সাড়ে আটটা হবে হয়তো। আমার ঘুম ভেঙেছে খানিক আগে। উঠিনি। শুয়ে শুয়ে সিগ্রেট খেয়েছি। তারপর আবার একটু ঘুমুবার চেষ্টা। চোখ বুজে পড়ে থাকা।
ভাইয়া অফিসে চলে গেছে সাতটায়। ছুটির দিন ছাড়া কখনও সকালবেলা ভাইয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। ভাইয়ার তিন বছরের মেয়ে টুসী, ওর কান্না সকালবেলা আমার ঘুম ভাঙায়। রেগুলার। মেয়েটা সকাল-বেলা উঠেই কান্না জুড়ে দেয়। দিনের বেলাটা যেনো ও সইতে পারে না। প্রতিবাদ জানিয়ে প্রতিদিন সকালবেলাই কাঁদে। ঘুম ভেঙে কান্নার শব্দ! শালা আমার খুব বিচ্ছিরি লাগে। দুএকদিন বিরক্ত হয়ে ভাবীকে বলি, কি হলো মেয়েটাকে তুমি সামলাতে পারো না?
ভাবি মিষ্টি করে হাসে। না থামলে আমি কি করবো?
শুনে আমি অফ হয়ে যাই। বেশি কিছু বলা যায় না। ভাবী মাইণ্ড করে। ভাইয়ার কানে গেলে সেও। অগোচরে আমাকে নিয়ে দুজনে কথা বলে। আমি বেকার পড়ে আছি ভাইয়ার ঘাড়ে। আজকালকার দিনে আমার সাইজের একটা বেকার জিনিশের ভার নেহায়েত কম না! ভাইয়া যে বয়ে যাচ্ছে এই বেশি। আর আমি তো আমি, খাইদাই ঘুরে বেড়াই। সংসারের অন্যান্য কাজ বাদ দিলাম, বাজারটাও কখনো করে দেখি না। এমনকি দোকানেও কখনো যাই না। একটা কাজের ছেলে আছে। বালক ভৃত্য আর কি! নাম প্যাংলা। শালা খতারনাক একখানা জিনিশ। কাজ কর্ম করে ঠিকই কিন্তু চান্স পেলেই নগদ পয়সাটা চুরি করে। আমার ভাবী খোদার ফজলে বিদূষী মহিলা। তিনি প্যাংলার চুরিটা প্রায়ই ধরে ফেলেন। তখন আমার ঘোর বিপদ উপস্থিত হয়। প্যাংলাকে ছেড়ে ভাবী পড়েন আমাকে নিয়ে। ডিরেক্ট কিছু বলেন না আমাকে। আমার রুমের আশপাশ দিয়ে মন্থর গতিতে পায়চারী করেন কেবল। আর গলার ভয়েস রেডিও নাটকের ইনোসেন্ট নায়িকার শাশুড়ির মতো করে গজ গজ করেন, একটা দামড়া আছে বাসায় বোঝে শুধু খাওয়াটা আর শোয়াটা। জমিদার ভাই পেয়েছে চালিয়ে যাচ্ছে তার ওপর দিয়ে। আহা, লোকটা কাজ করতে করতে মুখ দিয়ে ফেনা তুলে ফেলে সে খেয়ালটাও করে না। শুধু বসে বসে খাওয়া। বাজারটা করলে কি হয়! সংসারটা তো ফাঁক হয়ে গেলো।
এসব কথা একবার যদি বলতে শুরু করেন ভাবী তাহলে সহজে আর থামেন না। রেফারেন্স হিশেবে আরো কতো প্রকারের বিষয় যে টেনে হিঁচড়ে আনেন। ভাইয়ার ছোট চাকরি, মাইনে কম। খরচ বেশি। যেমন বাসা ভাড়া রেশন বাজার ইত্যাদি মিলিয়ে ভাইয়া যে আমার মহা ট্রাবলে আছে সব প্রমাণ করে ছাড়েন। এইসব কথায় ভাইয়ার ওপর ভাবীর অগাধ প্রেম দিনের আলোর মত প্রতীয়মান হয়। তবে, প্রতিমাসে

মাইনে পেয়ে বউ বাচ্চা নিয়ে ভাইয়া যে আমার মার্কেটিংয়ে যায়, ভাবীর শাড়ি কসমেটিকস, বাচ্চার নতুন মডেলের জামা খেলনা ইত্যাদি কিনে রাতের খাবারটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে সেরে স্কুটার নিয়ে আহলাদী মুখে বাড়ি ফেরেন, সে কথাগুলো বেমালুম বাদ দিয়ে দেন। আমাকে খোঁচাটোচা মেরে নিজের ঘরে গিয়ে সদ্য কেনা টুইনওয়ানে 'জিসকি বিবি মুটি' গানটা চালিয়ে দেন। আর আমি তখন মন খারাপ করে পকেটে যা কিছু থাকে তাই নিয়ে, কাঁধে ছালার ব্যাগ ঝুলিয়ে নিঃশব্দ চরণে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। দুচার দিন, কখনো সপ্তাহখানেক আর বাড়ি ফিরি না।

আগে ভাইয়া একটু খোঁজটোজ করতো আমার। কোথায় গেলাম কি খেলাম। আজকাল করে না। জেনে গেছে যেখানেই থাকি পকেট এবং পেটের টানে ঠিকই ফিরে আসবো। আমিও শালা যখন আর উপায় থাকে না, এক আধবেলা উপোষ মেরে, বদনখানা চুন করে ঠিক ফিরে আসি। এসে কেলানো একখানা হাসি লটকে দিই ঠোঁটে। ভাবীর সঙ্গে আহলাদ করে দুএকটা কথা বলি। টুসীকে কোলে নিয়ে খুব একচোট আদর করি। মামনি ও মামনি, উ উ ইত্যাদি বলি। শুনে ভাবী আমার বিগলিত করুণা হয়ে যান। ফলে আবার আমার ঠাঁই হয় ছোট্ট রুমটায়। যেটা কিনা আসলে স্টোর রুম। সেই রুমে তিন বেলার আহার জোটে, রাতভর ঘুম। ভাবী দয়া করে ভাইয়ার কাছ থেকে দুপাঁচটা টাকাও ম্যানেজ করে দেন। আহা বেকার দেবরটি। ফলে স্টার সিগ্রেট আসে। জীবনটা কাটে ভালো।

শুয়ে শুয়ে এসব ভাবছি, ভাবী বললেন, কি হলো ?

কি ?

বললাম না, তোমাকে কে ডাকে !

ও। আমি লাফিয়ে উঠি। আমাকে বাসায় তো কেউ কখনো ডাকতে আসে না। আজ তাহলে কে এলো ?

লুঙ্গি পরা, খালি গা ছিলো আমার। চৌকির ওপর বালিশের কাছে দলা মোচড়া করা ছিলো আমার খদ্দরের পাঞ্জাবীটা। সেটা গায়ে চাপিয়ে ঘর থেকে বেরুতেই ভাবীর রুম। সেই রুমের ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় আমার চোখ পড়ে। দেখি নিজেকে ভীষণ নোংরা লাগছে। মাথার চুল লম্বা হয়ে ঘাড় ছাড়িয়ে নেমেছে। ম্যালা দিন সাবান পড়ে না বলে চুলটা উস্কোখুস্কো। চার পাঁচদিন সেভ হই না। গালে কোয়ার্টার ইঞ্চি দাড়ি বেশ কালো হয়ে গজিয়েছে। ফলে মোটামুটি ফর্সা মুখটা কালো দেখায়। কদিন ঘর থেকে বেরুইনি। শুধু খাওয়া আর ঘুম। মাঝেমধ্যে দুএকখানা বই পড়া। সুতরাং মুখচোখ বেশ ফোলা ফোলা! দেখতে টেকসাস ছবির অগোছালো নায়কদের মতো লাগে। পায়ে স্পঞ্জের দুটো স্যাণ্ডেল ফিট করে চটরপটর শব্দে নিচে নেমে আসি।

গেটের কাছে গিয়ে মণ্ডুটা কাটা ঘুরির মতো দুটো পাক খায় আমার। একি, কাকে দেখছি! এই মেয়ে কোত্থেকে, কেমন করে এলো আমার খোঁজে! থতমত খেয়ে বললাম, আরে আপনি?
যুবতি মিষ্টি হেসে বললো, এলাম।
চিনলেন কেমন করে?
বইটায় আপনার নাম ঠিকানা লেখা ছিলো।
ও। আমি মাথা নিচু করে হাসি।
সোনারগাঁয়ে একলা এই যুবতীকে আমি পেয়েছিলাম। ওর সঙ্গে একজন ছিলো। দেখতে চমৎকার ছেলেটি। কিন্তু নিশ্চয় খুব বদরাগী। নয়তো মেয়েটিকে একলা ফেলে ফুলে স্পিডে হোণ্ডা চালিয়ে অমন করে চলে এসেছিলো কেমন করে। তারপরই যুবতীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। আমি তিনচারদিন ধরে সোনারগাঁয়ে ছিলাম। সেখানকার মিউজিয়ামে আমার এক বন্ধু চাকরি করে। কোয়াটারে একলা থাকে বন্ধুটি আমার। সময়ে অসময়ে সোনারগাঁ গিয়ে বন্ধুটির সঙ্গে আমি দু চারদিন কাটিয়ে আসি। তখন ভারি মৌজে কাটে দিনগুলো। থাকা খাওয়া ফ্রি। এমন কি সকালবেলা বন্ধুটি যখন তার অফিসে যায় তখন প্রতিদিনই একটা করে দশ টাকার নোট গুজে দিয়ে যায় আমার হাতে। সেই টাকাটা পকেটে নিয়ে আমি পথে নামি। তারপর দুপুর অব্দি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াই। সিগ্রেট খাই, লিচুবনে বসে থাকি। ঐতিহাসিক দরদালানগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি। সময়টা বেশ কেটে যায়।
এমন একদিনে, দুপুরের মুখে মুখে এই যুবতীকে আমি প্রথম দেখি। সঙ্গে এক ভারি স্মার্ট যুবক ছিলো। একটি হোণ্ডা ছিলো। হোণ্ডায় চড়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেরাচ্ছিলো ওরা। বেশ মানানসই পেয়ার। দেখে যুবকের প্রতি ঈর্ষায় আমার বুক জ্বলে গিয়েছিলো। শালা ভাগ্য বটে যুবকটির। এতো সুন্দর একটি মেয়ে নিয়ে একাকী কতো দূর বেড়াতে এসেছে। আর আমি। এতোটা বয়েস হলো কোনো যুবতীকে নিয়ে এইভাবে ঘুরে বেড়ানো তো দূরের কথা, যাকগে শালা ভাগ্য।
কিন্তু ওদেরকে তারপর আমি সারাদিন ফলো করেছি। দুপুর অব্দি মিউজিয়াম ইত্যাদি ঘুরে দেখলো ওরা। তারপর দোকান থেকে বিসকিট কলা কিনে হোণ্ডা চালিয়ে চলে গেলো। লিচুবনে। হোণ্ডার পেছনে বসে মেয়েটি এক হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলো যুবকের কোমর। দেখে, ভাঙা ব্রিজটার ওপর দাঁড়িয়ে কোমরের কাছটা সিরসির করে উঠেছিলো আমার। তারপর একাকী বিকেল অব্দি সেই ব্রিজেই দাঁড়িয়ে থেকেছি। ইচ্ছে করলে ওদের ফলো করতে করতে লিচুবন অব্দি যেতে পারতাম। যাইনি। ওরা যদি বুঝে ফেলে, এই ভয়ে।৲ তাছাড়া যুবকটির চেহারা টেহারা যে ধরনের, সব বুঝে আমাকে যদি ধোলায় দেয়। আমি

আসলে এই রকমই। ভীতু বলেই কি জীবনে আমার প্রেম হলো না। কোনো মেয়ে অমন করে জড়িয়ে ধরলো না কোমর।
বিকেল হয়ে আসছে, তখন দেখি লিচুবন থেকে একাকী, হোণ্ডা ফুল স্পিডে চালিয়ে বেরিয়ে আসছে যুবক। ব্রিজের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হাওয়ার বেগে হোণ্ডা চালিয়ে উধাও হয়ে গেলো সে। হাওয়ায় যুবকের মাথায় চুল এলোমেলো। দূর থেকে এক পলকে আমি দেখতে পাই যুবকের মুখ ক্রোধে ফেটে যাচ্ছে। রাগ করে মেয়েটিকে একাকী এই রকম নির্জন জায়গায় ফেলে কেমন করে চলে যেতে পারলো যুবক! কেন, কি কারণে! ওরা কি প্রেমিক প্রেমিকা নয়? নাকি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে মেয়েটিকে সে এখানে নিয়ে এসেছিলো! মেয়েটি রাজি হয়নি বলে ফেলে চলে গেলো।
যখন এসব ভাবছি তখন দেখি মেয়েটি একাকী বিষন্ন ভঙিতে হেঁটে আসছে। কাছেপিঠে কোনো মানুষ নেই। মেয়েটিকে দেখে আমি একটু নড়েচড়ে উঠি। তারপর অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।
কাছাকাছি এসে মেয়েটি বললো, এই যে শুনুন।
আমাকে বলছেন?
হ্যাঁ।
বলুন। বলে আমি মেয়েটির দিকে তাকাই। আর মনে মনে বলি, যুবতী তুমি জানো না তুমি কি সুন্দর।
মেয়েটি বললো, ঢাকার বাস কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?
এই রাস্তায়ই মাইল আধেক হাঁটতে হবে।
আচ্ছা, বলে মেয়েটি চলতে শুরু করেও থেমে যায়। যদি কিছু মনে না করেন তো
চলুন, আমি ওদিকেই যাবো।
শুনে মেয়েটি উচ্ছল হয়ে ওঠে, আপনিও ঢাকায় যাবেন?
না, বাস স্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যাবো।
তারপর পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করি আমরা দুজন। হাওয়ায় আমাদের চুল ওড়ে। যুবতীর শরীর থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ এসে আমাকে পাগল করে দেয়। আমি বলি, ভদ্রলোক আপনাকে এভাবে ফেলে চলে গেলো কেন?
কে? ও, আপনি কেমন করে জানলেন?
আমি আগাগোড়া আপনাদের লক্ষ্য করেছি।
তাই নাকি?
হ্যাঁ।
মেয়েটা এবার খানিকটা হালকা হলো। মৃদু হেসে বললো, ও এরকমই। খুব সেন্টিমেন্টাল। না ভেবে অনেক কিছু করে ফেলে। আর আমাকে একদম বুঝতে পারে না।

শুনে আমি মনে মনে বলি, যুবতী আমি তোমাকে ঠিকঠিক বুঝে নেবো। বাস স্ট্যাণ্ডে এসে দেখি ঢাকার বাস তখনো আসেনি। বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে খুপরি মতন একটা চায়ের দোকান। যুবতীকে আমি বললাম, একটু চা খাবেন?

খাওয়া যায়।

আমরা তারপর চায়ের দোকানে ঢুকেছি। চায়ে চুমুক দিয়ে যুবতী সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়েছে। আপনি কি সোনারগাঁয়েই থাকেন?

না, ঢাকায় থাকি। এখানে বন্ধুর কাছে বেড়াতে এসেছি। কালপরশু ঢাকায় চলে যাবো। বলে আমি কাঁধের ঝোলানো ব্যাগ থেকে একটা বই বের করে অকারণে নাড়াচাড়া করি। কারণ যুবতীর দৃষ্টি আমি সইতে পারছিলাম না, এতো তীক্ষ্ণ চোখ তার, আমার সবকিছু দেখে ফেলছে।

সে বললো, কি বই?

আমি চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, প্রেমের কবিতা।

কার?

রফিক আজাদের।

তখুনি বাস এসে গেলো। যুবতী লাফিয়ে উঠে বললো, বাস এসে গেছে। যাই। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

তারপর সে যখন বাসের পাদানীতে উঠেছে কি মনে করে আমি হাতের বইটা তার দিকে বাড়িয়ে দিই। এটা পড়তে পড়তে চলে যাবেন। তাহলে একা লাগবে না।

বইটা হাতে নিয়ে মেয়েটি আবার সে রকম চোখে তাকিয়েছিলো আমার দিকে। তারপর এমন করে হাসলো, আমার মনে হলো পূর্ণিমার চাঁদ এসে এইমাত্র স্থির হলো সোনারগাঁয়ের আকাশে।

যুবতী বললো, এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো?

শুনে আমি লজ্জা পেয়ে যাই। আরে না না, চলুন ভেতরে চলুন।

তারপর আমি তার চোখের দিকে তাকাই। সে তাকায় আমার চোখে। হাসে। কি যে মিষ্টি হাসি। দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। মাথার ভেতরটা টলমল করে ওঠে।

সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠছি, যুবতী আমার পেছনে। তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিক দেখছিলো সে। আমাদের বাড়িটা কিঞ্চিত অদ্ভুতুড়ে। একটা সবুজ রংয়ের বিরাট তিনতলা বিল্ডিং। অসংখ্য ভাড়াটে তাতে। মাঝখানে খোলা উঠোন। তার একপাশে দোতলা বাংলো প্যার্টানের একটা টিনের ঘর। সেই ঘরটার দোতলায় আমরা থাকি। তিনটি রুম ঘরটায়।

প্রথমটা বেশ বড়োসড়ো, সেটা ভাই ভাবীর। তার পরেরটা মাঝারি। ড্রয়িংরুম। তার পরেরটা একেবারে ছোট, আসলে স্টোর রুম, সেটাই আমার থাকার ঘর। একটা মাত্র চৌকি পাতা ঘরটায়। আর কিছুই নেই। সকালবেলা আমার সঙ্গে অতো সুন্দর, চালচলনে বিশাল বড়োলোকী একটা মেয়েকে দেখে নিচের সব ভাড়াটেরা হা করে তাকিয়েছিলো। তিনতলা বিল্ডিংয়ের রেলিং থেকেও দুচারজন। দেখে আমার বেশ মজা লাগছিলো। নিজেকে কেউকেটা গোছের একটা কিছু মনে হচ্ছিলো। সবচে ভালো লাগছিলো যে কথাটা ভেবে, তাহলো, বাসায় আমার সাইজের দুচারটে যুবক ছিলো। তারা অতো সুন্দর এক যুবতীকে আমার সঙ্গে দেখে ঈর্ষায় জ্বলে যাচ্ছিলো। যেমন সোনারগাঁয়ে যুবতীর সঙ্গের যুবকটিকে দেখে আমার হয়েছিলো।

সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিলেন ভাবী। কোলে টুসী। আমাকে দেখে কাকু বলে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করলো টুসী। তারপর আমার পেছনে অতো সুন্দর একজনকে দেখে চোখ বড়ো করে তাকিয়ে থাকে। ভাবীও।

আমি হেসে বললাম, ভাবী ও হচ্ছে

আমার মুখে কথা আটকে যায়।

যুবতী হাত তুলে ভাবীকে সালাম দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাবী সিনেমায় দেখা নায়কের ভাবীদের মতো [সিচুয়েশানটা তো আশা করি বুঝতে পারছেন] হেসে বললেন, এসো ভাই, এসো। যুবতী ঘরে ঢোকে না। ভাবীর কোল থেকে টুসীকে টেনে নিয়ে একটু আদর করে। বাচ্চা দেখলেই বুঝি মেয়েদের মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। টুসীকে যুবতীর কোলে বেশ মানায়। টুসীর গাল টেপে যুবতী কবরীর মতো তুলতুলে গলায় বললো, মামনি তোমার নাম কি ?

টুসী জড়িয়ে জড়িয়ে বললো, টুসসী।

শুনে আমি আর ভাবী হেসে ফেলি। যুবতীও। যুবতীর হাসি দেখে জীবনে এই প্রথম একটি সকাল আমার কাছে আস্তেধীরে ভারি সুন্দর হয়ে ওঠে।

টুসীকে নিয়ে ভাবী তার ঘরে চলে গেলো যুবতী আমাদের কাঠের রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে বলে, আপনাদের বাড়িটা বেশ সুন্দর। একেবারে গ্রামের বাড়ির মতো।

আমি যুবতীর মুখোমুখি রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, এখানে খানিক দাঁড়ালে আমার কি মনে হয় জানেন ?

কি ?

মনে হয় স্টিমারে চড়ে দূরে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছি, বহু দূরে।

শুনে যুবতী খুব হাসে। ওর হাসিটি ভারি সুন্দর। রফিক আজাদের কবিতায় আছে না, 'উপরন্তু হাসিটি মধুর', ওরকম আর কি! আর ওকে

যে কি সুন্দর লাগছে আজ। সোনারগাঁয়ে পরেছিলো জিনস। আজ পরেছে নীল প্রিন্টের শাড়ি। নীল কি যুবতীর প্রিয় রং! ওর ঘরের পর্দা, বেডকভার তোয়ালে কার্পেট কিংবা ডিম লাইটের রং কি নীল! ওদের গাড়িটা!

খানিক পর আমি বললাম, চলুন ঘরে গিয়ে বসি।

যুবতী ভাইয়ার এবং আমার ঘরের মাঝখানকার ঘরটি, যেটাকে আমরা মনে করি ড্রয়িংরুম, পুরনো একসেট সোফা পাতা আছে, সেই ঘরে ঢুকে বললো, চলুন আপনার ঘরে বসি।

আমার ঘরে? আমি একটু লজ্জা পাই।

হ্যাঁ।

ঠিক আছে আসুন।

আমার ঘরটা যাতা রকমের বিচ্ছিরি। চৌকিতে তেল চিটচিটে বিছানা বালিশ। বিছানায় ছড়ানো ছিটানো কিছু বই। বেশির ভাগই কবিতার। আমি কবিতা বেশ পড়ি। আমার প্রিয় কবি রফিক আজাদ। কবিতা ও কবিদের মতো জীবনযাপন আমি খুব পছন্দ করি। ফলে অজান্তে আমার চরিত্রে এক ধরনের উদাসীনতা এসে গেছে।

ঘরে ঢুকে আমার চৌকিতে বসতে বসতে যুবতী বললো, অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম আপনার সঙ্গে দেখা করবো। আজ চলেই এলাম।

আপনি থাকেন কোথায়?

ওয়ারী।

ও।

তারপর আমি আবার নিজের ভেতর ডুবে যাই। খুব সুন্দর মেয়ে দেখলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু ভাগ্য আমার অনুকূলে নয়। আমি কখনো সুন্দর কোনো মেয়ের সঙ্গে কথা বলিনি। একাকী দুজনে কোথাও ঘুরে বেড়াইনি। কোনো মেয়েকে চুমু খাইনি। পঁচিশ বছর বয়েস হলো, কোনো মেয়ে কখনো আমাকে বলেনি, ভালোবাসি।

অথচ আমি দেখতে খুব একটা খারাপ নই। শরীর স্বাস্থ্য মোটামুটি। পাঁচ ফুট সাড়ে সাত ইঞ্চি হাইট। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামলা। নাকমুখ চোখ বেশ চলনসই। আমার চেয়ে খারাপ দেখতে কতো ছেলে চারদিকে প্রেম করে বেড়াচ্ছে। শালা আমারই হলো না। তিন বছর বাংলা পড়লাম। ইউনিভার্সিটিতে কতো মেয়ে। কেউ কখনো আমার দিকে ফিরেও তাকায়নি। সেই দুঃখেই এম এ টা আমার দেয়া হলো না। আজকাল উদাস কবিদের মতো জীবন যাপন করছি। প্রেম না করেও আমি শালা ব্যর্থ প্রেমিক। হাফসোল খাওয়া পার্টি। কিন্তু আজ থেকে তো, মনে হয় এই যুবতীর সঙ্গে আমার একটা কিছু হয়ে যাবে। কি সেটা! প্রেম নাকি অন্য কিছু! যুবতীর তো একজন আছেই। তাহলে?

এই কথাটা ভেবে আমি ভেতরে ভেতরে খুব দমে যাই। আরে আশ্চর্য

তো, সেই যুবকটির কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। যুবতী তার সঙ্গে অতোদূর বেড়াতে গিয়েছিলো। সম্পর্কটা নিশ্চয় তাহলে খুব গভীর।
কিন্তু একটা কথা ভেবে আবার খুশি হয়ে যাই আমি। যুবক সেদিন মেয়েটিকে একা ওরকম নির্জন একটা জায়গায় ফেলে চলে এসেছিলো। মেয়েটির ভালো মন্দ কিছু ভেবে দেখেনি। আমি তারপর তাকে বাসে চড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমার বিহেভে কি যুবতীর মন পাল্টে গেছে! বা চমৎকার। নিজেকে ভারি কৃতি পুরুষ মনে হয় আমার। ও রকম স্মার্ট সুদর্শন এক যুবকের প্রেমিকাকে আমি ভাগিয়ে আনতে পেরেছি, এরচে গর্বের কথা আর কি আছে।
আমার বিছানায় ছড়ানো ছিটানো বইপত্র ঘাটছিলো যুবতী। একটা বই হাতে নিয়ে বললো, এটা আমি নেবো।
তাকিয়ে দেখি শহীদ কাদরীর কবিতার বই 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা।'
দেখে মৃদু হাসি। যেটা ইচ্ছে নিয়ে যান।
তারপর আমি তার পাশে বসি।
যুবতী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনার লেখা পড়তে দেবেন না?
শুনে আমি চমকে উঠি। আমার কি লেখা?
কবিতা।
কবিতা? আমি কবিতা লেখি কে বললো আপনাকে?
যুবতী হেসে বললো, লুকুচ্ছেন কেন? আপনাকে দেখলেই বোঝা যায় আপনি কবি।
আমি আর কথা বলি না। আমি বাংলা পড়েও জীবনে এক লাইন কবিতা লিখিনি। কিন্তু একথা বললে যুবতী বিশ্বাস করবে না। আমাকে কবি ভেবেই হয়তো সে
যা শালা মেয়েমানুষের জন্যে কবি হয়ে যেতে হবে নাকি! ঠিক আছে যাবো। তারপর মনে মনে বললাম, যুবতী তোমার জন্যে আমি কবি হয়ে যাবো। আমি বেকার মানুষ, আজ থেকে একটা কাজ পেয়ে গেলাম।
যুবতী বললো, কি হলো?
কি?
পড়াবেন না আপনার কবিতা?
পড়াবো।
কবে?
আবার যেদিন দেখা হবে।
কবে দেখা হবে?
আপনি যেদিন বলবেন।

যুবতী সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকায়। তারপর আবার সেই হাসি। দেখে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

একটা ট্রেতে চা বিসকিট ইত্যাদি নিয়ে এলো প্যাংলা। আমি এখনো মুখ ধুইনি। প্রায়ই এরকম হয় আমার। সকালবেলা উঠে মুখ না ধুয়ে চা খাই। এখন সাড়ে নটার মতো বাজে। খিদে পেয়েছে। একটা বিসকিট তুলে মুখে দিই। যুবতীকে বলি, নিন। যুবতী মৃদু হেসে একটা বিসকিট নেয়। তারপর আমার দিকে চোখ তুলে তাকায়। প্রেম হওয়ার মুহূর্তে মেয়েরা কি এভাবেই তাকায়!

যুবতীর শরীর থেকে সুন্দর একটা গন্ধ আসছিলো। সেই গন্ধে আমার মাথার ভেতরটা কেমন শূন্য হয়ে যায়। চায়ে চুমুক দিয়ে কেন যে বলে ফেলি, আপনি খুব সুন্দর।

শুনে মুগ্ধ চোখে যুবতী একবার আমার মুখের দিকে তাকায়। তারপর মাথা নিচু করে হাসে। আপনি বাড়িয়ে বলছেন। আমি খুব সুন্দর নই। সত্যি সুন্দর। চাঁদের মতো। আপনার মুখের দিকে তাকালেই মনে হয় কি মনে হয়?

মনে হয় এই মাত্র পূর্ণিমার চাঁদ উঠে এলো আকাশে।

কথাটা বলে আমি ভেতরে ভেতরে বেশ অবাক হয়ে যাই। কোনো মেয়ের সঙ্গে কখনো তো এভাবে কথা বলিনি আমি! পারছি কি করে!

যুবতী বললো, আপনিও কিন্তু দেখতে বেশ। কবিদের মতো। কবিদের আমার খুব ভালো লাগে।

শুনে আমার বুকের ভেতরটা কেমন তোলপাড় করে। শালা আমার বুঝি এইবার হয়ে গেলো। সাবাস, সাবাস।

যুবতী বললো, একদিন আমাদের বাসায় আসুন। আসবেন?
যাবো।

কবে?

যাবো একদিন।

হঠাৎ করে গিয়ে আমাকে যদি না পান?

আপনি থাকেন কখন?

এখন সব সময়ই থাকবো। কলেজ তো বন্ধ।

আমার তখন সেই যুবকের কথা বলতে ইচ্ছে করে। ওদের সম্পর্কের কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে।

না থাক, যুবতী যদি মাইণ্ড করে।

এসময় আমার ভাবী এলেন। এসে যুবতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি কিন্তু খেয়ে যাবে। আমি রান্না বসিয়েছি।

শুনে যুবতী লাফিয়ে ওঠে। না ভাবী আজ নয়। আর একদিন এসে আপনার হাতের রান্না খেয়ে যাবো।

ভাবীর এহেন ব্যবহারে আমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। এমনিতে ভাবী আমাকে দেখতে পারে না বলে কখনো আমি আমার কোনো বন্ধুকে বাসায় আনিনি। যুবতী আজ হঠাৎই চলে এসেছে। কিন্তু ভাবীর ব্যবহার যে এতো ভালো! যা শালা, বুক থেকে একটা ভারী পাথর' :

খানিকপর যুবতী ওঠে। যেতে হবে।

তাতো হবেই।

বাসায় বলে আসিনি। নয়তো আরো কিছুক্ষণ থাকা যেতো।

বেশিক্ষণ থাকতে আপনার ভালো লাগতো?

নিশ্চয় লাগতো। সোনারগাঁয়ে আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই আমি জেনে গেছি আপনার কাছে আমাকে আসতেই হবে।

একথার কোনো জবাব নেই। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি।

যুবতী সে রকম মিষ্টি হেসে বললো, চলুন।

আমার পেছনে যুবতী, সিঁড়ি ভেঙে আমরা নিচে নেমে আসি।

উঠোনে এখন চমৎকার রোদ। আকাশ চকচকে, ঘন নীল। এতো সুন্দর সকাল আমি কখনো দেখিনি। যুবতী এসেছে বলেই কি আমার চোখে পৃথিবী আজ এতো সুন্দর হয়ে গেছে! এখন থেকে প্রতিটি দিনই কি আমার আজকের দিনের মতো সুন্দর ভাবে শুরু হবে! ১৯৭৭

আজকালকার ছেলেমেয়েরা

মা বাবার বেডরুমের বাইরে দাঁড়িয়ে বান্টি চেঁচিয়ে বললো, মাম্মী, মে আই কামইন?

ভেতরে থেকে মা বললেন, ইয়েস ডার্লিং।

বান্টি পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলো।

খাটে কাত হয়ে বান্টির মা ইংরেজি কাগজ পড়ছেন। তাঁর হাতের কাছে চায়ের কাপ। পরনে নাইটি। মাকে দেখে বান্টি বুঝতে পারে, মাম্মী এখনো বিছানা ছাড়েনি। বান্টি দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো। আটটা পঁচিশ। বান্টি সাধারণতঃ এসময়ে ঘুম থেকে ওঠে না। আজ উঠেছে। উঠে বাথরুম ইত্যাদি তো সেরেছেই, বাইরে বেরুবার সাজপোশাকও করে নিয়েছে। এমন কি কিচেনে ঢুকে কাজের মেয়েটাকে তাড়া লাগিয়ে বাটার টোস্ট, ডিম পোচ এবং এক কাপ চাও খাওয়া হয়ে গেছে তার।

বাপ্টির দিকে তাকিয়ে মা খুব অবাক হলেন। বাপ্টি পরেছে স্কিন টাইট ফেড জিনস, পায়ে ছেলেদের মতো কেডস। গায়ে হাতা কাটা গেঞ্জি বাপ্টির। গাঢ় নীল রঙের। গেঞ্জির ওপর বাপ্টির বুক জুড়ে মেরুন রঙে, মাইক্রোফোন হাতে চুল কার্লি করা মাইকেল জ্যাকসনের ছবি প্রিন্ট করা। বাপ্টির এক স্তনের ওপর পড়েছে মাইক্রোফোন ধরা জ্যাকসানের একটা হাত, অন্য স্তনে ইংরেজি বাঁকা হরফে লেখা মাইকেল জ্যাকসান। হাতাকাটা গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে বাপ্টির বগলের লালচে লোম বেরিয়ে আছে।

মা বললেন, আর ইউ গোয়িং সামহোয়ার?

ইয়েস মাম্মী।

কোথায়?

উই হ্যাভ প্রোগ্রামস টুডে।

কিসের?

বাপ্টি বিরক্ত হয়ে বললো, এতো কথা বলছো কেন? আই য়্যাম বিজি ফর হোল ডে।

দ্যাট ডাজেন্ট ম্যাটার ডার্লিং। তুমি রাগ করছো কেন?

তুমি জানো আই ডোন্ট লাইক আরগুমেন্টস। আমি বেরুচ্ছি।

আমি কি তোমাকে কখনো বাধা দিই? বাট আই হ্যাভ অল রাইটস টু ডু দ্যাট।

বাপ্টি এবার খুব রেগে গেলো। ডোন্ট ট্রাই টু শো ইউর রাইট মাম্মী। আই ডোন্ট বদার।

বাপ্টিকে রাগতে দেখে মা বিছানার ওপর উঠে বসলেন। তারপর হেসে বললেন, কিন্তু আজ একটা বিশেষ কারণ আছে। এজন্যেই বলছি। তুমি আজ বাইরে যেয়ো না।

বাপ্টি ভ্রূ কুঁচকে বললো, হোয়াট?

হ্যাঁ। আমরা আজ দুপুরে সোনারগাঁয়ে লাঞ্চে যাবো। তুমিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছো।

আমরা মানে কি?

তোমার পাপা আমি এবং তুমি।

আমি যাবো না।

শুনে মা একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। অল রাইট, তোমার পাপাকে বলে যাও।

হোয়ের ইজ পাপা?

আই ডোন্ট নো। বলে তিনি আবার খবরের কাগজ পড়তে শুরু করলেন। কিন্তু মার এই আচরণ বাপ্টির একদম ভালোলাগলো না। সে বিরক্ত হয়ে বললো, মাম্মী তুমি আমার সঙ্গে খুব বাজে বিহেভ করছো! আমি

যদি তোমার কাছে পারমিশান না নিতে আসতাম! যদি চলে যেতাম, তাহলে কি করতে!

মা কোনো কথা বলেন না। তাতে বাণ্টির রাগ আরো বেড়ে যায়। ধপাস করে খাটে বসে সে বললো, কথা বলছো না কেন?

মা আড়চোখে লক্ষ্য করছিলেন খাটে বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাণ্টির বয়সের তুলনায় ভারি বুক বেশ একটা দোল খেয়েছে। বাণ্টির কথার জবাব না দিয়ে সে বিষয়ে কথা বললেন তিনি। ব্রা পরোনি?

নো। আমার বয়সী আজকালকার কোনো মেয়ে ব্রা পরে না।

বাট ইয়্যু মাষ্ট

বাজে কথা বলো না।

মা এবার রাগী গলায় বললেন, আয়নায় দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নাও। তোমার ছেলে বন্ধুরা ক্রেজি হয়ে যেতে পারে।

ইউ ডোণ্ট নো এবাউট মাই ফ্রেণ্ডস। আমাদের জেনারেশানের ছেলেরা মেয়েদের ব্রেষ্ট আর হিপ নিয়ে ভাবে না।

ডোণ্ট ট্রাই টু টিচ মি বাণ্টি! পুরুষমানুষদের আমার চেনা আছে।

নো। তুমি যে সব বুড়ো ভামগুলোকে চেনো, তারা আর আমার বন্ধুরা এক নয়। তোমাদের দুএকটা পার্টিতে আমি তো এটেণ্ড করে দেখেছি, পুরুষগুলো তোমাদের দেখলে ক্রেজি হয়ে যায়, হ্যাণ্ডসাম পুরুষ দেখলে তোমরা ক্রেজি হয়ে যাও। তিন চারজনে ঘেরাও করো একেকজনকে। শরীরে কিছু নেই, কিন্তু তোমাদের বুক দেখলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। দুতিনটে করে টাইট ব্রা পরে কি একটা বাহার করো। এই বয়সেও হাজব্যাণ্ডের ছোকরা বন্ধুদের সঙ্গে বেড়ে যাও। আমাদের বয়সী ছেলেমেয়ে ফেলে ছেলের বয়সী লোকজনদের সঙ্গে ভেগে যাও। ন্যাষ্টি।

বাণ্টির কথা শুনে মা খুব ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান। তিনি ম্লান গলায় বললেন, বাণ্টি হোয়াট ডু ইউ সে!

ডোণ্টচু আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড? আমরা যা করি, সরাসরি করি। তোমাদের মতো আমাদের কোনো ভাণভণিতা নেই। লুকোছাপা নেই। তুমি লক্ষ্য করে দেখো, আমাদের জেনারেশানের ছেলেমেয়েরা সবাই স্ট্রেট ফরোয়ার্ড। সত্য কথা বলে। কখনো মিথ্যে বলে না, চালিয়াতি করে না। কেউ কাউকে পছন্দ করলে সরাসরি এপ্রোচ করে। রিফিউজড হলেও মাইণ্ড করে না। নোংরামী আমাদের নেই।

আমি কি বলছি আর তুমি

আমি ঠিকই বলছি। তবে তুমি ধরে নিও না আমি শুধু তোমাকে একাই বলছি। তোমাদের লেবেলের কথা বলছি। পুরুষ মানুষগুলো বাড়ির চাকরানীদের নিয়ে যা তা করে। তোমরা সাহেবদের খুশি করার

জন্য বাড়িতে ইচ্ছে করে ইয়াং, সুন্দরী চাকরানী রাখো। অতিরিক্ত সেলারি দাও। চাকরানীগুলোও জানে এসবের মানে।

বাপ্টির কথা শেষ হবার আগেই বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন। তিনি খেলোয়াড়দের মতো ট্রাকস্যুট পরেছেন। শরীর ঘামে ভিজে গেছে তার। শরীর ঠিক রাখার জন্য সকালবেলা জগিং করতে বেরোন তিনি।

বাবাকে দেখে বাপ্টি উঠে দাঁড়ালো। পাপা আমি আজ তোমাদের লাঞ্চে এটেন্ড করছি না।

বাবা অবাক হয়ে বললেন, হোয়াই ডার্লিং?

আই য়্যাম বিজি।

কিন্তু

আই হ্যাভ নো টাইম। বাই, বলে বাপ্টি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। বাবা মা দুজনেই ফ্যালফ্যাল করে বাপ্টির চলে যাওয়া দেখেন।

মা বললেন, মেয়েটা অসভ্য হয়ে গেছে।

বাবা কাঁধে তোয়ালে ফেলে বললেন, মানে!

এতোক্ষণ যা তা বললো আমাকে।

কি রকম?

আমাদের পার্টি ফার্টি নিয়ে, ক্রেজ নিয়ে এমন কি চাকর চাকরানীদের সম্পর্কেও।

ওদের জেনারেশানটাই তো এরকম। ডোন্ট টেক ইট আদার ওয়াইজ।

মা বিরক্ত হয়ে বললেন, মেয়েকে এতোটা লাই দেয়া ঠিক হচ্ছে না তোমার।

কি করবো, আমার তো একটাই মেয়ে।

একটা মেয়ে বলে সে যাতা করে বেড়াবে! মা বাবাকে যাতা বলবে?

ওতো মানুষই হয়ে উঠেছে এইভাবে! ওর আর দোষটা কি। ওকে যদি ছোটবেলা থেকে ওল্ড প্যাটার্নে শাসন করা হতো তাহলে এমন হতো না।

তোমাকে আজ একটা কথা না বলে পারছি না, বাপ্টির ফ্রি মিকসিংটা আমার ভালো লাগছে না। ওর শরীর দেখে মনে হয়, সি ইজ নট ভার্জিন। কবে দেখবে প্র্যাগনেন্ট হয়ে গেছে।

নো, এটা ঠিক নয়। সি ইজ কোয়াইট ম্যাচিউর্ট। আর আজকাল রাবার পিলের তো অভাব নেই।

তার মানে মেয়ে যাতা করে বেড়াবে?

এখন আর উপায় কি!

ওর বাড়ি থেকে বেরুনো বন্ধ করে দাও।

নট পসেবল।

হোয়াই নট?

তাহলে হয়তো বাড়ি ছেড়েই চলে যাবে। একটা মাত্র মেয়ে।

ওকে বিয়ে দিয়ে দাও।
সেটা সময় হলে ও নিজেই করে নেবে।
মা কপাল টিপে ধরে বললেন, ওহ তুমি কি!
বাবা বাথরুমে যেতে যেতে বিষন্ন গলায় বললেন, আলেয়া, বান্টির ব্যাপারে আগাগোড়া আমরা অনেক ভুল করে এসছি। ওকে এখন আর শোধরানো যাবে না। সর্বনাশ যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে বান্টির পতনটা আমাদের দেখতে হবে। নো আদার ওয়ে।

নিচে নেমে বান্টি চেঁচিয়ে ড্রাইভারকে ডাকলো, মতি এই মতি।
মতি ছিলো সার্ভেন্ট কোয়াটারে, তার রুমে। এতো সকালে তাকে সাধারণত গাড়ি নিয়ে বেরুতে হয় না। সাহেব বেরোন দশটার দিকে। এজন্যে মতি এখনো শার্ট প্যান্ট পরেনি। বান্টির চিৎকারে খালি গা লুঙ্গি পরা মতি দৌড়ে বেরিয়ে এলো। মালিক পক্ষের লোকজনদের মধ্যে এই মেয়েটাকেই মতি সবচে ভয় পায়।
মতিকে দেখে বান্টি বললো, শার্ট প্যান্ট পরে এসো। কুইক।
মতি যে স্পিডে ঘর থেকে বেরিয়েছিল, ঠিক সেই স্পিডে ঘরে গিয়ে ঢুকলো। তারপর মিনিট দুয়েকের মধ্যে রেডি হয়ে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে এসে বসলো।
বান্টি পেছনের ছিটে হাত পা ছড়িয়ে বসে বললো, গুলশান।
গাড়ি স্টার্ট দিয়ে মতি বললো, মিকি সাহেবদের বাসায়?
ইয়েস।
কিন্তু বান্টির মেজাজটা খুব বিগড়ে আছে। মার সঙ্গে যাতা কথা বলে এলো এতোক্ষণ। তার কোনো ফিকসড প্রোগ্রামে কেউ বাঁধা দিলে কখনো তা সহ্য করতে পারে না। সে যেই হোক। বন্ধুদের সঙ্গে বান্টির আজ প্রোগ্রাম করা আছে। তারা কবন্ধু আজ মিকির গাড়ি নিয়ে মধুপুরের ওদিকে বেড়াতে যাবে। সারাদিন থাকবে। হৈ চৈ করবে নাচবে গান গাইবে। দুপুরবেলা চারপাঁচ ক্যান করে বিয়ার খাবে। তিন চারদিন আগ থেকে ঠিক হয়ে আছে। এইরকম প্রোগ্রাম নষ্ট করে কে যায় মা বাবার সঙ্গে সোনারগাঁয়ে লাঞ্চ করতে! তাছাড়া বান্টির এখন কলেজ বন্ধ। লেখাপড়া নেই। এই সময়টা এনজয় না করলে কখন করবে!
কিন্তু মার একটা কথা ভেবে বান্টি ভেতরে ভেতরে খুব রেগে গেছে। বান্টির ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে মেশামেশিটা মা বোধহয় সন্দেহের চোখে দেখছে। নইলে বান্টির বুক নিয়ে ওভাবে বললো কেন। বন্ধুদের সঙ্গে ফ্রিলি মেশা, আড্ডাফাড্ডা, নাচা আর দুচার ক্যান বিয়ার খাওয়া ছাড়া বান্টি তো খারাপ কিছু করেনি। সে এখনো সম্পূর্ণ কুমারী। ঠোঁটে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে চুমু খায়নি। ইচ্ছে করে কোনো বন্ধু বুকে

হাত দেয়নি। ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে বান্টির সম্পর্কটা চমৎকার। খুশিতে বন্ধুরা কেউ কেউ বান্টিকে কখনো জড়িয়ে ধরেছে, টকাস করে গালে চুমু খেয়েছে। বান্টিও অনেক সময়। কিন্তু এরকম সম্পর্কের ভেতর খারাপ কি থাকতে পারে? বান্টির কাছে ছেলে বন্ধু মেয়ে বন্ধু দুইই সমান। স্রেফ বন্ধুত্ব। বান্টিকে কেউ কখনো এপ্রোচও করেনি। বান্টি এখনো কারো প্রেমে পড়েনি। বান্টির প্রেমে কেউ পড়েছে কি না, বান্টি জানে না। তাহলে মা ওসব বলে কি মিন করতে চাইলো। মা কি বান্টিকে খারাপ ভাবছে!

গাড়িতে বসে এসব ভাবতে ভাবতে মার ওপর তীব্র অভিমানে বান্টির মন ভরে গেলো। মনে মনে খুবই ছেলেমানুষি কিছু ডিসিশান নিয়ে নিলো সে।

নটার দিকে বান্টির গাড়ি এসে থামলো মিকিদের গেটে।

গাড়ি থেকে নেমে বান্টি বললো, মতি তুমি চলে যাও। পাপা মাম্মী কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে, আমি কখন ফিরবো ঠিক নেই।

তারপর গটগট করে বান্টি দোতলায়, মিকির রুমে উঠে গেলো।

ঘরে মিকি একা। বন্ধুরা এখনো কেউ এসে পৌঁছোয় নি। সাড়ে নটা থেকে দশটার মধ্যে সবার এসে পড়ার কথা। বান্টি বেশ আগে চলে এসেছে।

বান্টিকে দেখে মিকি বললো, হাই বান্টি।

বান্টি বললো, হাই। তারপর ধপ করে মিকির খাটে বসে পড়লো।

মিকি ছিলো খালি গায়ে। পরনে 'বাকজোর' খাকি রঙের ঢোলা প্যান্ট। ওই কোম্পানীরই শাদা বেল্ট। বেল্টের একটা মাথা দড়ির মতো ঝুলছে। মিকি খুব স্লিম ফিগারের। টল, ফর্শা। মুখটা ফরাশীদের মতো শার্প। মাথায় ঝাকড়া চুল মিকির।

মিকির দিকে তাকিয়ে বান্টির মনে হলো, এই প্রথম মিকিকে সে খেয়াল করে দেখলো।

মিকি বললো, তোকে খুব ডিপ্রেসড মনে হচ্ছে!

নো। আই য়্যাম ও'কে।

তারপর মিকি খুব উচ্ছল গলায় বললো, বান্টি একটা ফেনটাসটিক জিনিশ ম্যানেজ করেছি।

বান্টি নিরুত্তাপ গলায় বললো, কি?

মাইকেল জ্যাকসানের ভিডিও ক্যাসেট। থ্রিলার।

ও।

চল ওরা আসার আগে আমরা একটু দেখে নেই।

নো, আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট!

হোয়াট? আর ইউ নট ইন্টারেস্টেড এবাউট মাইকেল?

ইন্টারেস্টেড, বাট নট নাউ।

তোর হয়েছে কি ?

মিকি, আই ডোন্ট ফিল গুড। ভাল্লাগছে না।

মিকি অবাক হয়ে বান্টির দিকে তাকায়।

বান্টি টুকটুকে ফর্শা মেয়ে। মাথায় বয়কাট করা চুল, পাতলা ঠোঁট লিপস্টিক না লাগিয়েও টুকটুকে। খাড়া নাক, টানা চোখ, পুতুলের মতো ফোলাফোলা গাল। বান্টি দেখতে খুব সুইট।

মিকি বললো, চা খাবি ?

না।

তারপর বান্টি একটু চুপ করে থেকে বললো, মিকি চল বেরুই।

মানে ? কেউ তো আসেনি।

ওরা থাক, চল আমরা দুজনেই বেরিয়ে যাই। দারোয়ানকে বলে যাবি আজ প্রোগ্রাম হবে না। তুই বিজ্জি।

কিন্তু আমি তো সব রেডি করে রেখেছি। খাবারটাবার সব গাড়িতে তোলা আছে। ওরা এক্ষুণি এসে পড়বে।

একথা শুনে বান্টি লাফিয়ে উঠলো। তাহলে শার্ট পরে নে। লেটস গো।

কি বলছিস ?

হ্যাঁ। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।

রনি মাইণ্ড করবে।

ওর মাইণ্ডে তোর কি যায় আসে!

আই লাইক হার। সেও আমাকে। আমাদের বোধহয় লাভ হয়ে যাবে।

বান্টি ভ্রূ কুঁচকে বললো, তুই সিরিয়াস ?

অতোটা না।

রনি ?

বুঝতে পারছি না।

তাহলে বাদ দে। ইউ ডোন্ট লাইক মি ?

অবকোর্স।

মি টু। রনিকে বাদ দে। আমি তোকে ভালো বাসবো।

যা।

সত্যি ?

শুনে মিকি আবার হাসে। বান্টি আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

বান্টি কোনো কথা না বলে মিকির একেবারে বুকের কাছে এগিয়ে যায়। তারপর দুহাতে মিকির গলা জড়িয়ে ধরে মিকির ঠোঁটে চুমু খায়।

মিকি খুব হকচকিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু বাল্টি ওসব খেয়াল করলো না। নরম গলায় বললো, চল বেরুই। তোকে আমি সব দেবো। আই য়্যাম কোয়াইট ফ্রেস।

দুপুরের দিকে ওরা শহরের বাইরে চলে এলো। একটা নির্জন বনভূমির পাশ দিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে মিকি বললো, বাল্টি তোর খিদে পায়নি?
পেয়েছে।
চল তাহলে খেয়ে নিই।
কি খাবি?
কেরিয়ারে হ্যামবার্গার পেটিস ফেটিস আছে। সঙ্গে একটা করে বিয়ার।
চল।
গাড়ি থামিয়ে মিকি কেরিয়ার থেকে একটা খাবারের বাক্স আর দু ক্যান বিয়ার নিয়ে এলো। তারপর গাড়ির ভেতর বসে খেতে লাগলো।
একসময় বাল্টি বললো, মিকি মধুপুরের ওদিকে কোথায় যেনো তোর একটা পরিচিত বাংলো আছে?
আছে।
লেটস গো দেয়ার।
কেন?
আজ রাতটা ওখানে কাটিয়ে আসি।
হোয়াট?
হ্যাঁ।
শুনে মিকি একদম চুপ করে গেলো। খাওয়া হয়ে গেছে তার। এখন বিয়ারে থেমে থেমে চুমুক দিচ্ছিলো। এক হাতে জ্বলছে সিগ্রেট।
বাল্টি বললো, হোয়াট ডু ইউ থিংক?
ভাবছি তোর ব্যাপারটা কি!
কোনো ব্যাপার নেই। আমার ইচ্ছে করছে তোর সঙ্গে আজ সারারাত থাকবো।
হঠাৎ এরকম প্ল্যান!
তোর আপত্তি আছে?
আমার আপত্তি থাকবে কেন! তুই একটা ফ্রেস মেয়ে।
তুই ফ্রেস নোস!
সিউর। কিন্তু ব্যাপারটা আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে।
অদ্ভুত লাগার কিছু নেই। ভালো থেকেও যেহেতু বদনাম হচ্ছে, সুতরাং ভালো থেকে লাভ কি!

কিন্তু যেতে যেতে সন্ধে হয়ে যাবে?

হোক।

মিকি আবার গাড়ি স্টার্ট দেয়।

গাড়ি চলতে শুরু করলে বান্টি একেবারে মিকির গা ঘেঁসে বসে। একটা হাত রাখে মিকির কাঁধে। বান্টির একটা স্তন চেপে থাকে মিকির বুকের কাছে।

বান্টি বললো, মিকি তুই আমাকে কিস কর।

মিকি মুখ ঘুরিয়ে বান্টির ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে এবং তখুনি গাড়িটা গিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খায়। সেই ধাক্কায় ওরা দুদিকে ছিটকে সরে যায়।

ধাক্কা খেয়ে গাড়িটা হঠাৎই থেমে গেছে। ওরা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো।

১৯৮৪